লোক প্রশাসন সাময়িকী
দশম সংখ্যা
ডিসেম্বর ১৯৯৭, পৌষ ১৪০৪

লোকপ্রশাসন সাময়িকী

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা

লোকপ্রশাসন সাময়িকী

দশম সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯৭, পৌষ ১৪০৪

বিপিএটিসি গ্রন্থাগার
সাময়িকী
শাখা
তারিখ ..
সাভার, ঢাকা

সম্পাদনা পরিষদ

এ. কে. এম. নাসিরুল হক
মোঃ সিরাজুল ইসলাম
কঙ্কা জামিল

সম্পাদক
আ. ক. ম. মাহবুবুজ্জামান

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
দশম সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯৭, পৌষ ১৪০৪

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের
ত্রৈমাসিক বাংলা জার্ণাল

সম্পাদক ঃ আ. ক. ম. মাহবুবুজ্জামান

© ১৪০৪ বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

টেলিফোন	ঃ	৮৩১৭১৫-২০ (পিএবিএক্স)
টেলেক্স	ঃ	৬৩২২২৮ পিএটিসি বিজে
ফ্যাক্স	ঃ	৯৩৩২০১৬
ই-মেল	ঃ	বিপিএটিসি @ বাংলা নেট.
বিপিএটিসি	ঃ	প্রকা–৬/বাজা–১০/৯৭
বিপিএটিসি গ্রন্থাগার	ঃ	৩৫১.০০০৫
প্রচ্ছদ	ঃ	কাজী আজাদ
মূল্য	ঃ	পনের টাকা
মুদ্রণে	ঃ	ইছামতি অফসেট প্রেস ১/১ হাজীপাড়া, রামপুরা ঢাকা-১২১৯। ফোন ঃ ৪১৩৭৩৭

LOKPROSHASHON SAMOEEKY
Vol.10, December 1997, Poush 1404

Quarterly Bengali Journal of
Bangladesh Public Administration Training Centre

Editor : A. K. M. Mahbubuzzaman

© 1404 Bangladesh Public Administration Training Centre

Telephone	:	831715-20 (PABX)
Telex	:	632228 PATC BJ
Fax	:	9332016
E-Mail	:	bpatc @ bangla net.
BPATC	:	Pub-6/BJ-10/97
BPATC Library	:	351.0005
Cover Design	:	Qazi Azad
Price	:	Taka Fifteen only

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
দশম সংখ্যা
ডিসেম্বর ১৯৯৭, পৌষ ১৪০৪

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা
১.	ভারতের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা ঃ একটি পর্যালোচনা মুহাম্মদ আব্দুল কাদের	১
২.	বাংলাদেশের মহিলা ও শিশুদের উপর বন্যার আর্থ-সামাজিক প্রতিক্রিয়া আ, ক, ম, মাহবুবুজ্জামান	৩১
৩.	পথ-শিশুদের বর্তমান অবস্থা ও সমস্যা সম্পর্কিত একটি পর্যালোচনা ঃ বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত মিসেস মাজেদা হোসেন চৌধুরী ও মিসেস তাহ্‌মিনা আখতার	৬১
৪.	নির্যাস লেখার কৌশল মোঃ শফিকুল হক	৭৯
৫.	শরীর সুস্থ রাখার জন্য কয়েকটি ব্যায়াম মুহাম্মদ মসিউর রহমান	৮৩
৬.	পুস্তক পর্যালোচনা ঃ বাঙালী জীবনে রমণী (লেখক ঃ নীরদ চন্দ্র চৌধুরী) অলকা রাণী রায়	১১১
৭.	বাংলাদেশ সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি মোঃ হাসিবুর রহমান	১১৯
৮.	বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের চাহিদা ও কার্যকারিতা বিশ্লেষণ ঃ উন্নয়ন অর্থনীতি প্রসঙ্গ মোঃ সিরাজুল ইসলাম	১২৭

লোক প্রশাসন সাময়িকী
১০ম সংখ্যা, ডিসেম্বর ৯৭, পৌষ ১৪০৪

ভারতের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা ঃ একটি পর্যালোচনা

মুহাম্মদ আব্দুল কাদের *

ভূমিকা

ভারতের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রসঙ্গে আলোচনার আগে 'স্থানীয় সরকার' বলতে কি বুঝায় সে সম্বন্ধে ধারণা নেয়া প্রয়োজন। স্থানীয়ভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি সংস্থা যা স্থানীয় কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য গঠিত হয়ে থাকে, তাকে সাধারণত স্থানীয় সরকার বলা হয়। স্থানীয় সরকারের কোন সার্বভৌম শক্তি না থাকায় স্থানীয় সরকারের গঠন, কার্যপরিধি ও আর্থিক ক্ষমতা বিভিন্ন আইন, বিধি ও সার্কুলারের মাধ্যমে জাতীয় সরকার নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। তাত্ত্বিকগণ আকার, কাঠামো, সীমাবদ্ধতা কিংবা ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে স্থানীয় সরকার প্রত্যয়টি সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন। ১৯৪০ এর দশকে জি. মন্টাগো মরিস স্থানীয় সরকার এর দু'ধরনের সংজ্ঞা দিয়েছেন। প্রথমত, স্থানীয় সরকার হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত সংস্থাসমূহ যারা সরকারের এজেন্ট হিসেবে কাজ করে এবং দায়িত্বাবলীর জন্য জাতীয় সরকারের নিকট দায়ী থাকে। দ্বিতীয়ত, স্থানীয় সরকার কোন এলাকার জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা পরিচালিত সরকার। এই স্থানীয় সরকারসমূহ জাতীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে কাজ করে। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে স্থানীয় সরকার কিছু কিছু ক্ষমতা বা দায়িত্বাবলী পায়, যা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে স্বাধীনভাবে এসব প্রতিষ্ঠান কার্যকর করতে পারে। মন্টাগো মরিসের মতে যদিও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের এখতিয়ার এবং দায়িত্বাবলীর তারতম্য রয়েছে, তবুও পদ্ধতি দু'টি মোটামুটি পাশাপাশিভাবে চালু রয়েছে।

চার্লস ব্যরই বলেছেন, স্থানীয় সরকার বলতে স্থানীয় জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা পরিচালিত এমন স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে বুঝায়; যাদের দায়িত্বাবলী নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকে। দায়িত্বাবলী পালনের নিমিত্তে নিজস্ব আয়ের উৎস হিসেবে স্থানীয় সরকার কর ধার্য করতে পারে। যদিও জাতীয় সরকার জনস্বার্থে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিষ্ঠা করে, তবুও তারা জাতীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন থেকে কাজ

* উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

করে বা জাতীয় সরকারের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকে। এনসাইক্লোপেডিয়া অব সোশ্যাল সায়েন্সের নয় ও দশ নম্বর ভলিউমে উইলিয়াম এ. রফসন স্থানীয় সরকারকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বলেছেন "স্থানীয় সরকার বলতে একটি ভূখন্ডগত অসার্বভৌম সম্প্রদায়কে বুঝায়, যাদের নিজস্ব বিষয়ে নিয়ন্ত্রণকারীর মত প্রয়োজনীয় আইনগত অধিকার সংগঠন আছে।" জাতিসংঘের সংজ্ঞা অনুযায়ী "স্থানীয় সরকার হলো একটা রাষ্ট্রের রাজনৈতিক উপ-বিভাগ, যা আইন দ্বারা গঠিত হয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে সমুদয় কার্যক্রমে কার্যকর নিয়ন্ত্রণ আরোপের ক্ষমতা, বিশেষভাবে কর ধার্য করার ক্ষমতা রাখে।"

এ আলোচনায় স্থানীয় সরকারের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রতিভাত ঃ

(১) স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা হলো একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা যা বৈধ কর্তৃত্বের অধীন;

(২) স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা হলো স্থানীয় জনগণ দ্বারা নির্বাচিত একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার জন্য গঠিত একটি সংস্থা;

(৩) স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা হলো কর ধার্যকরণ ও প্রশাসন পরিচালনার জন্য ক্ষমতা প্রাপ্ত একটি সংগঠন যার নিজস্ব কার্যাবলীর ব্যবস্থাপনা করার অধিকার থাকে;

(৪) এ সরকার প্রকৃতভাবে জাতীয় সরকারের নিকট দায়বদ্ধ এবং অধীনস্থ।

ভারতের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা দীর্ঘদিনের বিকাশমান প্রক্রিয়ার ঐতিহ্য বহন করে গড়ে উঠেছে। ভারতের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু গ্রামীণ সমাজ কাঠামোর বিকাশ ঘটতে শুরু করেছে প্রায় তিন হাজার বছর আগে। অর্থাৎ ভারতের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার বিকাশ হওয়ার সূচনালগ্ন থেকেই। তবে ভারতের বিশাল আয়তনের কারণে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলের স্থানীয় সরকার ভিন্নতর প্রকৃতি নিয়ে বিকশিত হয়েছে। ভারতে বৃটিশদের আগমনের পরে ভারতের সরকার কাঠামোর কেন্দ্রে পাশ্চাত্য ধাঁচের একক সকার ব্যবস্থা বিকশিত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু ভারতে একক এবং শক্তিশালী কোন স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বিকাশ ঘটেনি।

যা হোক, এই প্রবন্ধে মূলত ভারতের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বিবর্তন অর্থাৎ প্রাচীনকালে ও মধ্যযুগে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা কিভাবে বিকশিত হয়েছে, ভারতে বৃটিশদের আগমনের পরে বৃটিশদের প্রবর্তিত পাশ্চাত্য ধাঁচের শাসন ব্যবস্থার সংস্পর্শে এসে ভাবতের সনাতনী ধাঁচের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা কতখানি প্রভাবিত হয়েছে, স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ভারতের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার কাঠামো এবং গঠন প্রক্রিয়া কেমনভাবে বিকশিত হয়েছে, তা সংক্ষেপে তুলে ধরার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে শহুরে এবং গ্রামীণ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের গঠন, কাঠামো এবং বিকাশ প্রক্রিয়া সম্বন্ধে পৃথকভাবে অথচ পাশাপাশিভাবে আলোচনা করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী

এবং আর্থিক ব্যবস্থা অর্থাৎ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়ের উৎসসমূহ এবং ব্যয়ের খাতসমূহ সম্বন্ধীয় আলোচনা করা হয়নি এ প্রবন্ধের কলেবর সীমাবদ্ধ রাখার জন্য।

এ অঞ্চলের সর্ববৃহৎ দেশ হিসেবে ভারত ১২,২৯,০০০ বর্গমাইল এলাকা নিয়ে গঠিত। উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা থেকে দক্ষিণে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ভারত একটি বৈচিত্রমন্ডিত দেশ। ভৌগোলিকভাবে ভারতকে তিনটি মৌলিক অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। যেমন (ক) উত্তর ভারতের গাঙ্গেয় অববাহিকায় বিস্তীর্ণ সমতলভূমি, যা মূলত আর্যদের আবাসভূমি হিসেবে পরিচিত। (খ) হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত উত্তর পূর্ব অঞ্চল, যা মঙ্গোলীয় ও অষ্ট্রিক জনগোষ্ঠী দ্বারা অধ্যুষিত। (গ) দক্ষিণ ভারতীয় অঞ্চল, যা বিন্ধ্য পর্বতমালা দ্বারা উত্তর ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং সমুদ্র তীরবর্তী পূর্বাঞ্চল থেকে পশ্চিমাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা নিয়ে গঠিত হয়ে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মিলনস্থল হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। তাছাড়াও মাদ্রাজ বন্দরের নিকটবর্তী দক্ষিণ অঞ্চল, যা দ্রাবিড়দের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। ১৯৯১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী ভারতের জনসংখ্যা প্রায় ৮৪০ মিলিয়ন এবং মাথাপিছু আয় ২৬০ মার্কিন ডলার। ভারতীয় সমাজ মূলত কৃষিভিত্তিক। যদিও অধিকাংশ ভারতীয় (প্রায় ৮৩%) হিন্দু, তথাপি গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায় যেমন মুসলিম, খৃষ্টান, শিখ, বৌদ্ধ ও জৈন ভারতে রয়েছে। ভারতীয় সংবিধান ১৪টি প্রধান ভাষার স্বীকৃতি দিয়েছে। এছাড়া শত শত ভাষা ও কথা ভারতীয় পল্লী অঞ্চলে কথিত হয়। প্রধান ভাষাগুলো হলো হিন্দী, ইংরেজী, ইন্দো-ইউরোপীয়, দ্রাবিড়ীয়, চীনা-তিব্বতীয় ও অষ্ট্রিক।

স্বাধীন ভারতের সংবিধান ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী থেকে কার্যকর হয়। এ সংবিধানে মোট ৩৯৫টি আর্টিকেল ও সিডিউল রয়েছে। ভারতের সংবিধান সংসদীয় সরকার পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। ভারতের প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক প্রধান মাত্র। নির্বাহী ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর হাতে ন্যস্ত এবং তিনি সরকারের প্রধান। কেন্দ্রীয় আইনসভা দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট এবং প্রধানমন্ত্রী সংসদের নিম্নকক্ষের (লোকসভা) নিকট দায়ী। এই সংবিধান ক্ষমতা বিভাজনের ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। অধিকাংশ ক্ষমতা এমন কি Residual Powersও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ন্যস্ত। রাজ্য সরকার কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন জনশৃঙ্খলা, পুলিশ, বিচার ব্যবস্থা, কৃষি, পানি সরবরাহ ও সেচ, শিক্ষা, গণস্বাস্থ্য, ভূমি, শিল্প এবং স্থানীয় সরকার পরিচালনা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে। তাদের প্রশাসন পরিচালনার জন্য অধিক কর ধার্যের ক্ষমতাও আছে এবং ভূমি ব্যবহার ও বন্টন, শিল্প ও কৃষির উন্নতির জন্য নীতি নির্ধারণের ক্ষমতাও রয়েছে।

প্রাচীন যুগ

ভারতে স্থানীয় সরকারের বিবর্তন ঃ

প্রাচীনকালে ভারতের গ্রামসমূহ যখন থেকে বিকশিত হতে শুরু করেছে, ভারতে স্বশাসিত সরকার ব্যবস্থাও তখন থেকে বিকশিত হয়েছে। ঋগ্‌বেদে ১২০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দেই স্বশাসিত গ্রামীণ সরকারের কাঠামোর অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। Sir Charles Metcalfe এই ধরনের সরকারকে Village Republic বলে আখ্যায়িত করেছেন।[১] ঐতিহাসিক খান্না বলেছেন, প্রতিটি গ্রামেই স্বশাসিত কর্তৃপক্ষের অস্তিত্ব ছিল, যা অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে গ্রামীণ কাঠামোর মধ্য থেকে সমুদয় কার্যক্রম সম্পাদন করত, যা বর্তমান সরকারী কার্যক্রম পরিচালনার মতোই ছিল। তখন গ্রামীণ কাঠামোতে যে আয় হত সেগুলি জনসাধারণের সুবিধার জন্য ব্যয় করা হতো। এই ধারণার উপর ভিত্তি করেই মহাত্মা গান্ধী স্বাধীন ভারতীয় সমাজ গঠনের চিন্তা করেছিলেন, যা স্ব-নির্ভর গ্রাম কাঠামোর মাধ্যমে বিকশিত হতে পারত বলে তিনি ধারণা করেছিলেন।

ভারতের স্থানীয় সরকার সম্বন্ধে বিভিন্ন গবেষক দেখিয়েছেন যে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের গঠন ও কাঠামোর কারণে ভারতের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলি বিভিন্নমুখী রূপ লাভ করেছে। কিছু এলাকায় সংখ্যালঘু জমিদাররা শাসন করত। তাদের অবস্থান ছিল মূলত হিন্দু জাতিভেদ ভিত্তিক পদ্ধতির অনুরূপ। পরোক্ষভাবে এসব গ্রামবাসী দূরে অবস্থানকারী জমিদারদের প্রতিনিধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো এবং প্রত্যক্ষভাবে গ্রামবাসীরা Headman দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। Headman এবং পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ভারতীয় সমাজে প্রাচীনকাল থেকেই ছিল। যদিও তাদের কাজকর্ম, ক্ষমতা এবং স্থানীয় সরকারের মধ্যে তাদের অবস্থান ভারতের অঞ্চলগত ভিন্নতার কারণে উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্ন ছিল। Headmanগণ সাধারণত হিন্দু বর্ণ ও গোত্র শাসনকারী এবং নিয়ন্ত্রণকারী পরিবারের প্রধান ও কর্তৃত্বকারী হিসেবে কাজ করতো। অনেক সময় যুবরাজগণ আনুষ্ঠানিকভাবে Headman দ্বারা মনোনীত হতেন। তারা গ্রামবাসীদের দ্বারা নির্বাচিত হওয়ার প্রয়োজন বোধ করতেন না। গ্রামের সব ধরনের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কাজ কর্মের ক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগের সেতুবন্ধন হিসেবে এই Headmanকাজ করতেন। সরকার যে ধরনের কর বা খাজনা ধার্য করে দিতো, তা আদায় করে সরকারের কাছে জমা দেয়াই ছিল হেডম্যানদের মূল কাজ। খাজনা আদায় করার এই পদ্ধতির মাধ্যমেই মূলত গ্রামীণ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা বিকশিত হয়েছিল।

পঞ্চায়েতঃ গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের মধ্য থেকে সভা এবং গ্রামীণ সমাজ গঠনের বহু সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায়, যা ৬০০ খৃষ্টপূর্ব থেকে প্রচলিত ছিল। তবে

---

১. Sir Charls Metcalfe (1952) : Report of the Select Committee of the House of Commons. Vol. III. 1952

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পঞ্চায়েতের গঠন ও কার্যক্রম বিভিন্ন রকম ছিল। পঞ্চায়েতের কোন দাপ্তরিক কাঠামো এবং বিধি বিধান ছিল না। সাধারণত পঞ্চ য়েতসমূহের গঠন হতো একটি গ্রামের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতা বিতরণের জন্য। উত্তর ভারতে মূলত চার ধরনের পঞ্চায়েত ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। এগুলো হলো ঃ

ক) **The caste Panchayet (বর্ণ-ভিত্তিক পঞ্চায়েত) ঃ** নির্দিষ্ট বর্ণের লোকজন যাতে সামাজিক আচরণ ও বিধানগুলো মেনে চলে, সেটা নিশ্চিত করার দায়িত্ব ছিল এই পঞ্চায়েতের। উচ্চ বর্ণের ধর্মীয় মূল্যবোধগুলো জাগ্রত রাখা এবং বর্ণের লোকজনের মধ্যে বিরোধ মিমাংসা করা ছিল বর্ণভিত্তিক পঞ্চায়েতের মূল কাজ।

খ) **গ্রাম পঞ্চায়েত ঃ** আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং গ্রামের ফৌজদারী এবং দেওয়ানী ধরনের বিরোধসমূহ মিমাংসা করা ছিল এই পঞ্চায়েতের মূল কাজ। রাস্তা-ঘাট নির্মাণ, পানীয় জলের জন্য কূপ খননের মতো কল্যাণমূলক কার্যক্রম এই পঞ্চায়েত সম্পাদন করত। সাধারণত উচ্চ বর্ণের নেতাদের দ্বারাই গ্রামীণ পঞ্চায়েত নিয়ন্ত্রিত হত। Headmanগণ বিভিন্ন জটিল বিষয়ে সমাধানের জন্য পঞ্চায়েত-এর সাহায্য গ্রহণ করতেন।

গ) **একক উদ্দেশ্যে গঠিত পঞ্চায়েত ঃ** সাধারণত আন্তঃগোত্র বিরোধসমূহ মীমাংসা করার জন্য এই পঞ্চায়েত গঠিত হত।

ঘ) **বিরোধ মীমাংসামূলক পঞ্চায়েত ঃ** কৃষক এবং ভৃত্য অথবা ভূস্বামী ও প্রজার বিরোধ মিটানোর জন্য এ ধরনের পঞ্চায়েত গঠিত হত। উচ্চ বর্ণের লোকদের মধ্য থেকে এই পঞ্চায়েত গঠিত হত।[২]

পঞ্চায়েতগুলির মধ্যে সুন্দর সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। তবে এই পঞ্চায়েতগুলির মাধ্যমে সমাজে বর্ণ প্রথা প্রকটতা লাভ করে। ভারতীয় সমাজে গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে বর্ণভিত্তিক পঞ্চায়েত অধিক মাত্রায় ক্রিয়াশীল এবং দীর্ঘমাত্রায় স্থায়ী হিসেবে দেখতে পাওয়া যায়।

দক্ষিণ ভারতে সাধারণত গ্রামীণ পঞ্চায়েতগুলি "গ্রাম সভা" এবং "মহত্তর সভা" নিয়ে গঠিত হতো। সাধারণত তারা বিভিন্ন গোত্র এবং বর্ণের প্রতিনিধিত্ব করত। তবে এর সদস্য হতে হলে ন্যূনতম সম্পত্তির মালিক হতে হতো। ভিক্ষুক, ভবঘুরে ও অস্পৃশ্য ব্যক্তিরা পঞ্চায়েতের সদস্য হতে পারত না। এখানে কোন নির্বাচনের ব্যবস্থা ছিল না। উত্তর ভারতের তুলনায় দক্ষিণ ভারতের স্থানীয় সরকারসমূহ অনেক বেশী কার্যকর ভূমিকা পালন করত। দক্ষিণ ভারতের পঞ্চায়েতগুলিকে প্রায়শই জলদস্যু ও লুটেরা দলগুলির বিরুদ্ধে টহল প্রদান করতে হতো। এ ব্যবস্থার অধীনে পঞ্চায়েতগণ পথ, ব্রীজ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করতেন এবং অন্যান্য সুবিধাদি প্রদানের ব্যবস্থা করতেন। তাঁরা খাজনা আদায়কারী কর্তৃপক্ষকে খাজনা ধার্য ও আদায়ের ব্যাপারে সহায়তা করতেন।

পূর্ব ভারতের বিশেষত গাঙ্গেয় অববাহিকার গ্রামীণ স্থানীয় সরকার সম্বন্ধে খুব একটা

---

২. R. C. Majumdar : The History & Culture of Indian People. Vol-II. Bombay. India. 1960

বেশী জানা যায় না। তবে এটা অনুমান করা যায় যে, উত্তর ভারতের সাথে এ অঞ্চলের যোগাযোগ থাকায় উত্তর ভারতের ব্যাপক প্রভাব এই অঞ্চলের সমাজের উপরে পড়েছিল। কিন্তু এই সমাজগুলি বিভিন্ন ধরনের মাইগ্রেন্ট জনগোষ্ঠীর প্রভাবে বেশ উৎকর্ষ পেয়েছিল।

পঞ্চায়েতের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিলো আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা। এ কাজ করতে গিয়ে পঞ্চায়েত পুলিশি এবং বিচার কার্যক্রম সম্পাদন করতো। যে সব বিরোধ বিভিন্ন পেশাদারী সংগঠন এবং ব্যবসায়ী ও দলের মধ্যে মিমাংসা হতোনা, তা মূলত গ্রাম পঞ্চায়েত মিমাংসা করতো। পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ যে মীমাংসা করে দিতো তা গ্রামবাসীদের দ্বারা শুধু গৃহীতই হতো না বরং প্রশংসিত হতো। রীতিনীতি এবং ধর্মীয় বিধি-বিধান পঞ্চায়েতকে অত্যন্ত পবিত্র স্থানে আসীন করেছিল। পঞ্চায়েতরা সাধারণত উচ্চ বর্ণের লোকজনের ঐক্যমতের ভিত্তিতে তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন এবং তা নিম্ন বর্ণের লোকদের কাছেও গ্রহণযোগ্য হতো।

মধ্যযুগের স্থানীয় সরকার

ক) গ্রামীণ স্থানীয় সরকার ঃ

শেরশাহ সূরীর শাসন আমলে (১৫২৯-৪৫) সাধারণ প্রশাসন এবং কর প্রশাসন ব্যবস্থায় যে ব্যাপক সংস্কার আনা হয়েছিল তা মূলত মধ্যযুগের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার গোড়াপত্তন করেছিল। তাঁর সময়ে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ সম্রাট আকবরের শাসনামলে (১৯৫৫-১৬০৫) আরও কার্যকর এবং সাফল্যজনকভাবে বাস্তবায়িত হয়েছিল। পল্লী এলাকায় মুঘল শাসন চার স্তর বিশিষ্ট ছিল, যা মূলত কর আদায়ের জন্য গঠিত হয়েছিল। প্রদেশগুলি গভর্ণর (সুবাদার) দ্বারা, জেলাগুলি (সরকার) শিকদার দ্বারা, পরগণাগুলি ফৌজদার দ্বারা এবং গ্রামগুলি পরিচালিত হতো গ্রামপ্রধান দ্বারা। প্রতিটি স্তরেই আইন শৃঙ্খলা রক্ষা, বিচার কার্যক্রম এবং পৌর কার্যাবলী সম্পাদনের সাথে সাথে খাজনা আদায় করা ছিল এই সময়ের শাসকবর্গের একটি অন্যতম কাজ। এভাবেই পরগণা পর্যায়ে কর্মরত ফৌজদারকে কাজী এবং মীরদাল নামক কর্মকর্তাগণ সহযোগিতা করতেন। আর চৌকিদাররা গ্রামপ্রধানকে পুলিশী কার্যক্রম সম্পাদনে যথাযথভাবে সহযোগিতা করতেন।[৩]

এ ধরনের নতুন প্রশাসনিক ব্যবস্থা পঞ্চায়েত ভিত্তিক গ্রামীণ কাঠামোর স্বশাসিত সরকার ব্যবস্থার উপরে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। আর এই প্রভাবগুলি হলো ঃ

(১) কোন কোন এলাকায় পুলিশী কার্যক্রম কেন্দ্রীয় সরকার নিজ হাতে তুলে নিয়ে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালায়।

---

৩. Masudul Hassan : History of Local Government in Pakistan. Gop. Islamabad. 1985.

(২) অনেক গ্রামে গ্রামপ্রধানদের খাজনা-আদায় এরং শান্তি রক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপক ক্ষমতা বৃদ্ধির সাথে সাথে পঞ্চায়েতের ক্ষমতা কমে যায়।

(৩) মুঘলদের প্রবর্তিত খাজনা আদায় ব্যবস্থা মূলত সমাজে খাজনা আদায়কারী জমিদার শ্রেণী সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে। তাছাড়া এ ব্যবস্থা করদাতা ও কর আদায়কারী প্রশাসনের মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সৃষ্টি করে।

খ) শহুরে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা ঃ

মুঘল শাসকবর্গ শহুরে জীবনে অভ্যস্থ ছিল এবং তারা আবশ্যিকভাবে শহর কেন্দ্রিক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গঠনের ক্ষেত্রে অধিক মাত্রায় আগ্রহী ছিল। প্রতিটি শহর সুসঙ্গায়িতভাবে ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হয়েছিল এবং প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি সুনির্দিষ্ট ভ্রাতৃগোষ্ঠী বাস করতো। প্রতিটি ওয়ার্ড অথবা মহল্লায় একজন মীর-মহল্লাহ থাকতেন যিনি জনগণের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করতেন। কোতায়াল হিসেবে নিযুক্ত অফিসার শহরের সামগ্রিক প্রশাসন ব্যবস্থা তদারক করতেন। তিনি মিউনিসিপ্যাল কার্যাবলী, ম্যাজিষ্ট্রেরিয়াল কার্যক্রম, পুলিশি কার্যক্রম এবং আর্থ ব্যবস্থাপনার তদারককারী হিসেবে কাজ করতেন। ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার দায়িত্বে নিয়োজিত কাজী এবং অবৈধ কার্যক্রম প্রতিরোধের দায়িত্বে নিয়োজিত মোহতাসিব কোতয়ালকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করতেন। সরকার শহরগুলিতে খানকার ব্যবস্থাপনা চালু করেছিলেন যেখানে বিনামূল্যে পথচারী এবং অভাবীদের খাদ্য ও আশ্রয় প্রদান করা হতো।[৪]

ব্রিটিশ আমল

সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসেবে ব্রিটিশরা নবগঠিত কলোনী ভারতের উপরে সর্বোচ্চ মাত্রায় ভূমি কর আদায় এবং সেই সাথে সাথে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার নামে দমননীতি পরিচালনা শুরু করে। বৃটিশরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে বাংলা, বিহার ও উত্তর প্রদেশের কিছু অংশ এবং অন্ধ্র প্রদেশে জমিদারী ব্যবস্থা চালু করে। মাদ্রাজ অর্থাৎ বর্তমান তামিলনাড়ুতে রায়তওয়ারী প্রথা চালু করা হয়। পাঞ্জাব ও মধ্য প্রদেশে মহলওয়ারী প্রথা চালু করা হয়। ১৯৭২ সালের প্রকাশিত গভর্ণমেন্ট অব বেঙ্গল প্রতিবেদনে স্বীকার করা হয় যে, মুঘল আমলে প্রবর্তিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলিকে ব্রিটিশ শাসনের প্রথম শতক জুড়ে পর্যায়ক্রমে দুর্বল করার প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। জমিদাররা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলিকে দুর্বল করে সেখানে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পেয়েছিল।[৫]

বৃটিশ শাসনাধীন ভারতের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার ইতিহাস বিশ্লেষকবর্গ মোট ৪টি ভাগে বিভক্ত করেছে। এ গুলি হলো ঃ

প্রথম পর্ব (১৬৮৭ থেকে ১৮৮১ সাল) ঃ

এ সময়কালে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো ঃ

---

৪. Ibid.

৫. Kamal Siddqui : Local Government in South Asia. UPL. Dhaka.

১৬৮৭ সাল ঃ মাদ্রাজে পৌর কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা।

১৭২৬ সাল ঃ মাদ্রাজের মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এর স্থলে মিউনিসিপ্যাল কোর্ট প্রতিষ্ঠা।

১৮৪২ সাল ঃ বেঙ্গল এ্যাক্ট দ্বারা বাংলার জেলা পর্যায়ের শহরগুলিতেও মিউনিসিপ্যাল প্রশাসন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ।

১৮৫০ সাল ঃ বেঙ্গল এ্যাক্ট সমগ্র দেশব্যাপী সম্প্রসারণ।

১৮৬৩ সাল ঃ স্যানিটেশন, পানি সরবরাহ, রাস্তায় বাতির ব্যবস্থা ইত্যাদি দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য মিউনিসিপ্যাল কমিটি গঠন করার জন্য প্রাদেশিক সরকারকে ক্ষমতা প্রদান।

১৮৭০ সাল ঃ লর্ড মেয়ো কর্তৃক গৃহীত রেজুলেশনের উপরে গুরুত্বারোপ করে মিউনিসিপ্যাল প্রশাসনের সাথে সর্ব ভারতীয়দের সম্পৃক্ত করার আগ্রহ সৃষ্টির প্রয়াস নেয়া হয়। ভিলেজ চৌকিদারী আইন-১৮৭০ প্রণয়নের দ্বারা চৌকিদারদের (গ্রাম পুলিশ) প্রতিপালনের জন্য খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামীণ পর্যায়ে গ্রাম পুলিশ (চৌকিদার) এর প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশের পথ সুগম করা হয়।

বৃটিশরা শহরকেন্দ্রিক জীবনের প্রতি বেশী মাত্রায় আকৃষ্ট হওয়ায় এই সময়ে শহুরে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বিকাশের অধিকতর তৎপরতা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময়ের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ মূলত মনোনীত প্রতিনিধি/কর্মকর্তাদের দ্বারা পরিচালিত হতো বলে ভারতীয়রা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে তেমন ভূমিকা রাখতে পারতো না। চৌকিদারী আইনের মূল লক্ষ্য ছিল আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি বিধান করার মাধ্যমে সর্বোচ্চ মাত্রায় ট্যাক্স আদায় নিশ্চিতকরণ।

দ্বিতীয় পর্ব (১৮৮২ থেকে ১৯১৯ সাল) ঃ

এ সময়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হতে থাকে। লর্ড রিপোন এর নেতৃত্বে ভারতীয় সরকার ১৮৮২ সালে একটি রেজুলেশন পাশ করে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে প্রথম বারের মতো বেসরকারী প্রতিনিধি নির্বাচনের প্রক্রিয়া চালু করে। বোম্বে মিউনিসিপ্যাল আইন ১৮৮৮ সালে পাশ হওয়ার পরে ভারতের সমস্ত বড় বড় শহরে মিউনিসিপ্যাল প্রতিষ্ঠানের কাঠামো গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১৯০৯ সালে বিকেন্দ্রীকরণের উপরে রয়েল কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের মাধ্যমে ভারতে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার জন্য পটভূমি তৈরিকারী নীতিসমূহ প্রয়োগের জন্য পুনরায় দাবী উত্থাপিত হতে থাকে। ১৯১৮ সালে আরেকটি রেজুলেশন পাশ করে ভারতের গ্রামগুলিতে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা পুনরুজ্জীবিত করণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করা হয়। স্থানীয় সরকারগুলি নির্বাচিত সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত হওয়া উচিৎ এবং সর্বজনীন

১৬৮৭ সাল ঃ মাদ্রাজে পৌর কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা।

১৭২৬ সাল ঃ মাদ্রাজের মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এর স্থলে মিউনিসিপ্যাল কোর্ট প্রতিষ্ঠা।

১৮৪২ সাল ঃ বেঙ্গল এ্যাক্ট দ্বারা বাংলার জেলা পর্যায়ের শহরগুলিতেও মিউনিসিপ্যাল প্রশাসন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ।

১৮৫০ সাল ঃ বেঙ্গল এ্যাক্ট সমগ্র দেশব্যাপী সম্প্রসারণ।

১৮৬৩ সাল ঃ স্যানিটেশন, পানি সরবরাহ, রাস্তায় বাতির ব্যবস্থা ইত্যাদি দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য মিউনিসিপ্যাল কমিটি গঠন করার জন্য প্রাদেশিক সরকারকে ক্ষমতা প্রদান।

১৮৭০ সাল ঃ লর্ড মেয়ো কর্তৃক গৃহীত রেজুলেশনের উপরে গুরুত্বারোপ করে মিউনিসিপ্যাল প্রশাসনের সাথে সর্ব ভারতীয়দের সম্পৃক্ত করার আগ্রহ সৃষ্টির প্রয়াস নেয়া হয়। ভিলেজ চৌকিদারী আইন-১৮৭০ প্রণয়নের দ্বারা চৌকিদারদের (গ্রাম পুলিশ) প্রতিপালনের জন্য খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামীণ পর্যায়ে গ্রাম পুলিশ (চৌকিদার) এর প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশের পথ সুগম করা হয়।

বৃটিশরা শহরকেন্দ্রিক জীবনের প্রতি বেশী মাত্রায় আকৃষ্ট হওয়ায় এই সময়ে শহুরে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বিকাশের অধিকতর তৎপরতা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময়ের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ মূলত মনোনীত প্রতিনিধি/কর্মকর্তাদের দ্বারা পরিচালিত হতো বলে ভারতীয়রা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে তেমন ভূমিকা রাখতে পারতো না। চৌকিদারী আইনের মূল লক্ষ্য ছিল আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি বিধান করার মাধ্যমে সর্বোচ্চ মাত্রায় ট্যাক্স আদায় নিশ্চিতকরণ।

দ্বিতীয় পর্ব (১৮৮২ থেকে ১৯১৯ সাল) ঃ

এ সময়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হতে থাকে। লর্ড রিপোন এর নেতৃত্বে ভারতীয় সরকার ১৮৮২ সালে একটি রেজুলেশন পাশ করে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে প্রথম বারের মতো বেসরকারী প্রতিনিধি নির্বাচনের প্রক্রিয়া চালু করে। বোম্বে মিউনিসিপ্যাল আইন ১৮৮৮ সালে পাশ হওয়ার পরে ভারতের সমস্ত বড় বড় শহরে মিউনিসিপ্যাল প্রতিষ্ঠানের কাঠামো গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১৯০৯ সালে বিকেন্দ্রীকরণের উপরে রয়েল কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের মাধ্যমে ভারতে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার জন্য পটভূমি তৈরিকারী নীতিসমূহ প্রয়োগের জন্য পুনরায় দাবী উত্থাপিত হতে থাকে। ১৯১৮ সালে আরেকটি রেজুলেশন পাশ করে ভারতের গ্রামগুলিতে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা পুনরুজ্জীবিত করণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করা হয়। স্থানীয় সরকারগুলি নির্বাচিত সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত হওয়া উচিৎ এবং সর্বজনীন

ভোটাধিকারের ভিত্তিতে স্থানীয় সরকারগুলির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়া উচিৎ বলে ভারতের শাসকগোষ্ঠী মত ব্যক্ত করেন। সেই সাথে আর্থিক স্বাধীনতা প্রদানের কথাও রেজুলেশনে উল্লেখ করা হয়।

তৃতীয় পর্ব (১৯২০ থেকে ১৯৩৭ সাল) ঃ

এ সময়ে স্থানীয় সরকারগুলিকে প্রাদেশিক সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। ১৯১৯ সালে ভারত শাসন আইন পাশ করার মাধ্যমে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় বেশকিছু পরিবর্তন সাধিত হয়। এ আইনে জনপ্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় স্থানীয় সরকারগুলি ব্যাপক স্বাধীনতা এবং আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার লাভ করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ১৯২৩ সালের শেষের দিকে এসে বাংলার সমস্ত জেলায় জেলা বোর্ড বেসরকারী চেয়ারম্যানের নিয়ন্ত্রণে আসে।

স্বাধীনতা উত্তর ভারতের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পরে ভারতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অগ্রগতি ছিল ভারতের সংবিধান প্রণয়ন, যা ১৯৫০ সালে কার্যকর হয়েছিল। এই সংবিধান প্রাদেশিক সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার এই দু'ধরনের সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন করে। কিন্তু এই সংবিধান গ্রামীণ বা শহুরে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কে নীরবতা পালন করে। ভারতের সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বর্ণনা কতে গিয়ে বলা হয়েছে, রাষ্ট্র গ্রামীণ পঞ্চায়েতগুলিকে সংগঠিতকরণের ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং পঞ্চায়েতগুলিকে এমন ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রদান করবে, যাতে তারা স্ব-শাসিত একক সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করার মতো সামর্থ্যবান হয়ে উঠতে পারে (অনুচ্ছেদ-৪০)।

তাছাড়া সংবিধানের সপ্তম তফসীলে প্রাদেশিক সরকারসমূহকে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট, জেলা বোর্ড, মাইনিং সেটেলমেন্ট অথরিটির মতো স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সমুদয় কর্মকান্ড পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, যাতে তারা স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিকশিত হতে পারে অথবা গ্রামীণ শাসন পরিচালনা করার সামর্থ্য অর্জন করতে পারে। যেহেতু রাষ্ট্রীয় মূল নীতিগুলিকে বাধ্যকরী হিসেবে প্রয়োগ করার সুযোগ কম, সেহেতু সংবিধানের এ দু'টি বাধ্যবাধকতার দ্বারা বাস্তবিক অর্থে ভারতের স্থানীয় সরকারসমূহের বিকাশ প্রক্রিয়া মূলত প্রাদেশিক সরকারসমূহের মর্জির উপরে নির্ভরশীল থেকেছে, যা মহাত্মা গান্ধীর "স্বাধীন ভারতভূমি"র ধারণার পরিপন্থী হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

১৯৫২ সালে "কম্যুনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম" (সিডিপি) নামক এপ্রোচ এর মাধ্যমে স্বাধীন ভারতের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সংস্কার করার প্রচেষ্টা চালানো হয়। ভারতের প্রদেশসমূহের আত্মনির্ভরতা এবং আর্থিক ও টেকনিক্যাল সমর্থন লাভের আশা নিয়ে সি, ডি, পি প্রজেক্টসমূহ গ্রামীণ জনসাধারণের মধ্যে নতুন জীবনযাত্রার পথ

এবং জ্ঞান প্রদর্শনের আলোকবর্তিকা হিসেবে ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি করে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে তিন ধরনের বাস্তবায়ন স্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়। এগুলি ছিল (১) একজন জেলা উন্নয়ন কর্মকর্তা (কালেক্টর), (২) একজন ব্লক উন্নয়ন কর্মকর্তা (যাকে একদল সম্প্রসারণ কর্মকর্তা সহযোগিতা করতেন), (৩) একজন গ্রাম পর্যায়ের বিভিন্ন বিষয়ক কার্যক্রম সহযোগিতাকারী কর্মী যিনি সব ধরনের উন্নয়ন বাস্তবায়ন সহযোগী ছিলেন।

কম্যুনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের (সিডিপি) মূল্যায়নকারীদের দ্বারা এই কর্মসূচির বেশ কিছু সমালোচনা করা হয়েছে।[৬] এর মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য ঃ

(১) এই কর্মসূচি মূলত আমলাদের দ্বারা পরিচালিত হত। এই আমলারা ভাল কর্মী ছিল বটে, কিন্তু তারা এই কর্মসূচির অন্তর্নিহিত বিষয়াবলী উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছিল। সরকারী কর্মচারীদের উপরে এরূপ অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারেনি।

(২) শহুরে এবং গ্রামীণ উভয় ধরনের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে মূলত কম্যুনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের অধিক্ষেত্রের বাইরে রাখা হয়েছিল। Balvantray Mehta-র নেতৃত্বে গঠিত একটি ষ্টাডি টিম ১৯৫৬ সালে এই কম্যুনিটি প্রজেক্টসমূহ এবং ন্যাশনাল এক্সটেনশন সার্ভিস-এর উপরে ব্যাপক গবেষণা কাজ চালিয়ে একটি প্রতিবেদন দাখিল করে। প্রতিবেদনটি ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত হয়। এই প্রতিবেদনে কয়েকটি বিষয়ের প্রতিফলন ঘটে। এগুলো হলো ঃ

(ক) উক্ত দুটো প্রোগ্রাম জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে উদ্যোগ অথবা উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়।

(খ) পঞ্চায়েতসমূহের উপরে একটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গঠিত হয় ঠিকই কিন্তু এই কর্মসূচি দ্বারা খুব বেশী উল্লেখযোগ্য কোন উদ্যম সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি।

(গ) এমনকি পঞ্চায়েতগুলিকে কম্যুনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের আওতায় আনা হয়নি।

এ কমিটির মতে দায়িত্ব এবং ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকরণ করা হলে উক্ত সমস্যাসমূহ অতিক্রম করা যেতে পারে। এ জন্য কমিটি নিম্নোক্ত বিষয়াবলীর উপর আলোকপাত করে ঃ

(১) তিন স্তর বিশিষ্ট পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠান (PRI) গঠন, যা পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত থাকবে। এগুলো হলো গ্রাম পর্যায়ে গ্রামীণ পঞ্চায়েত (VP), ব্লক পর্যায়ে পঞ্চায়েত সমিতি (PS)এবং জেলা পর্যায়ে জেলা পরিষদ (ZP)।

(২) কম্যুনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম দ্বারা ইত:পূর্বেই যেহেতু ব্লকগুলিকে উন্নয়নের কেন্দ্র বিন্দু হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে, সেহেতু পঞ্চায়েতী সমিতিকে এই

৬. S. C. Jair : Community Development and panchayeti Raj in India. Bombay, India, 1967

তিনটি স্তরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর অঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। পঞ্চায়েতী সমিতিকে নির্বাচনমূলক একটি ষ্ট্যাটিটিউট বডি করা হয়, যা কার্যক্রমের দিক হতে ব্যাপকতা দেখাবে। আর এর প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক এবং আর্থিক দিক থেকে কর্তৃত্ব থাকবে।

(৩) জেলা পরিষদ হবে সম্পূর্ণ সমন্বয়কারী এবং তত্ত্বাবধানকারী একটি সংস্থা, যার কোন প্রশাসনিক কর্তৃত্ব থাকবে না।

(৪) গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে পঞ্চায়েত সমিতির অধীনে ক্রিয়াশীল রাখা হবে।

(৫) পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠানসমূহের হাতে প্রকৃত অর্থে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব হস্তান্তর করতে হবে এবং সকল পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠানগুলি দ্বারা সম্পন্ন করতে হবে।

(৬) স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার প্রতিটি স্তরে পর্যায়ক্রমে ক্ষমতা ও দায়িত্বের ডিভোলিউশন এর বিকাশ ঘটাতে হবে।

১৯৫৯ সালের ২রা অক্টোবরে ভারতের অন্যতম প্রদেশ রাজস্থানে পঞ্চায়েতীরাজ প্রথা প্রথম চালু করা হয়।

Balvantray Mehta কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থা সত্তরের দশকে মোটামুটি সমগ্র ভারতের প্রাদেশিক সরকারগুলি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে স্থানীয় পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রভাবের প্রয়োজন অনুযায়ী কোন কোন প্রদেশে কিছুটা পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছে। মহারাষ্ট্র এ প্রদেশগুলির অন্যতম। এখানে জেলা পরিষদকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তামিলনাড়ুতে প্রতিটি প্রশাসনিক জেলাকে দুই/তিনটি করে উন্নয়ন জেলায় বিভক্ত করা হয়েছিল। প্রতিটি উন্নয়ন জেলাতে একটি জেলা পরিষদ গঠিত হয়েছিল। মেঘালয় এবং নাগাল্যান্ডে পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্য কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। জম্মু-কাশ্মীর, কেরালা, মনিপুর, ত্রিপুরা প্রভৃতি প্রদেশে শুধুমাত্র গ্রাম পঞ্চায়েতই গঠিত হয়েছিল। আসাম এবং হরিয়ানাতে শুধুমাত্র দু'স্তর বিশিষ্ট পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়।

যদিও ভারতীয় কংগ্রেস কেন্দ্র এবং প্রদেশে ক্ষমতাশীন ছিল, তবুও Balvantray Mehta কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়নি। কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকারসমূহের পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠানসমূহ শক্তিশালীকরণ বিষয়ক আইন প্রণয়নের জন্য উদ্যোগ নিতে পারতো, তবুও কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে এরূপ আইন প্রণয়নের জন্য তেমন কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি। পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠান গঠনের লক্ষ্যে এই কর্মসূচি আবেগ প্রবণতার কারণে বেশ সমর্থন পেয়েছিল কিন্তু

কালক্রমে পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থার সমস্যাগুলি বা অসুবিধাগুলি উদ্ভাসিত হতে থাকায় এ ব্যবস্থা বেশ কিছু সমালোচনার সম্মুখীন হতে থাকে। নারায়ন এবং মাথুর ১৯৮৭ সালে মত ব্যক্ত করেন "১৯৫৯ সালে যে পঞ্চায়েতীরাজ ব্যবস্থা ব্যাপক আশাবাদ এবং উদ্যোগের সহযোগে তার যাত্রা শুরু করেছিল, তা বছরের পর বছর ধরে তার উদ্যম পর্যায়ক্রমে হারিয়ে ফেলছে। ১৯৬৯ সালে এসে পঞ্চায়েতীরাজ ব্যবস্থাটা অপ্রাসংগিক বা অপ্রয়োজনীয় একটা ব্যবস্থা হিসেবে পরিগণিত হতে শরু করে।"

এদিকে কেন্দ্রীয় সরকার এমনকি প্রাদেশিক সরকারসমূহও একটার পর একটা কমিশন এবং কমিটি গঠন করে এই পরিস্থিতি মোকাবেলার চেষ্টা চালিয়ে গেছে। ১৯৫৭ সাল থেকে শুরু করে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত সময়ে (অথাৎ Balvantray Mehta কমিটি থেকে শুরু করে জনতা দলের প্রথমবারের মতো কেন্দ্রে ক্ষমতারোহণের সময় পর্যন্ত) পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত বিষয়ে মোট ২৫টা কমিশন এবং ৪৮টা কমিটি গঠিত হয়েছিল। মৌলিক দিক দিয়ে বিবেচনায় এদের প্রকৃত কার্যকারিতা অত্যন্ত ক্ষীণ ছিল। ১৯৭৭ সালে কেন্দ্রে জনতা দল ক্ষমতায় আসার পরে পঞ্চায়েতীরাজ ব্যবস্থাকে কার্যকর করার জন্য পুনরায় উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ লক্ষ্যে অশোক মেহেতার নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালী করার জন্য মোট ৬টা সুপারিশ প্রণয়ন করে। এগুলি হলো ঃ

১। দুই স্তর বিশিষ্ট পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠান থাকা উচিৎ ঃ (ক) জেলা পর্যায়ের পঞ্চায়েতীরাজ, (খ) মন্ডল পর্যায়ের পঞ্চায়েতীরাজ যা গ্রাম পঞ্চায়েত (VP) থেকে বড় হবে কিন্তু পঞ্চয়েতী সমিতি (PS) থেকে ছোট হবে। আর জেলা হবে বিকেন্দ্রিকরণের কেন্দ্রবিন্দু।

২। আর্থিক দিক থেকে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের লক্ষ্যে পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠান সমূহকে ট্যাক্স আদায়ের জন্য ক্ষমতা প্রদান করতে হবে।

৩। রাজনৈতিক দলগুলিকে প্রকাশ্যে পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচনে অংশ নেয়ার সুযোগ দিতে হবে।

৪। পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠানগুলি জেলা পর্যায়ের এজেন্সী দ্বারা এবং সংসদীয় কমিটি দ্বারা সামাজিকভাবে নিরীক্ষিত (Social audit) হবে।

৫। পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠানগুলি খন্ডিত কোন কারণে (Partisan Ground) সুপার-সিড করা যাবে না। যদি এরূপ ঘটে, তবে ছয় মাসের মধ্যে নতুনভাবে নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬। পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠানসমূহ "আরবান এমিনিটিস" বা শহুরে সুবিধাদি সরবরাহ করবে, যাতে গ্রাম থেকে শহরে ব্যাপকভাবে অভিগমন প্রবণতা কমানো যায়।

এই প্রতিবেদনের পরামর্শসমূহ গ্রহণ করার আগেই কেন্দ্রে এবং বেশ কয়েকটি প্রদেশে রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটে। কংগ্রেস (আই) নতুনভাবে ক্ষমতাসীন হয়ে অন্য একটি

রাজনৈতিক দলের দ্বারা গঠিত কমিটির প্রতিবেদন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তেমন কোন আগ্রহ প্রদর্শন করেনি। ইতোমধ্যে পরিকল্পনা কমিশন দারিদ্র বিমোচন এবং পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিদ্যমান প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনাসমূহ পর্যবেক্ষণের জন্য G.V.R Rao এর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে। ১৯৮৫ সালে এই কমিটি পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠানসমূহ শক্তিশালী করার সুপারিশ করে বলে যে, পরিকল্পনা গ্রহণ এবং উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য জেলা পরিষদেরই মুখ্য সংস্থা হিসেবে কাজ করা উচিৎ। এই কমিটি আরও মত ব্যক্ত করে যে, গ্রামীণ দারিদ্র বিমোচনের উদ্দেশ্যে গৃহীত কর্মসূচিসমূহ পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠানগুলির সহযোগিতায় জনসাধারণকে সেবা প্রদান করতে পারবে।

অশোক মেহেতা এবং G.V.R Raoএর নেতৃত্বে প্রশাসনিক সংস্কারের লক্ষ্যে গঠিত কমিটিসমূহের সুপারিশ প্রদানের পরবর্তী বছরগুলিতে পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রে তেমন কোন পরিবর্তন ঘটেনি। সবকিছু বিশ্লেষণে একথা বলা ভুল হবে না যে, ষাট এর দশকের পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠান এবং আজকের ভারতের গ্রামীণ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের (পঞ্চায়েতীরাজ) মধ্যে তেমন একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। তবে উল্লেখযোগ্য যে, "পঞ্চায়েত বিল" অর্থাৎ সংবিধানের ৬৪তম সংশোধনী বিল-১৯৮৯ সংসদে উপস্থাপন করে তৎকালীন ভারতীয় সরকার পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ (যাতে প্রাদেশিক সরকারগুলি কেন্দ্রের অনুমোদন ছাড়াই নিতে পারে তার বিধান প্রণয়নের পদক্ষেপ) গ্রহণ করে। কিন্তু রাজ্য সভায় বিরোধী দলের বিরোধিতার কারণে এ বিলটি পাশ হতে পারেনি।

শহুরে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ ঃ

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ১৯৫০ সালে রচিত ভারতীয় সংবিধানে শহুরে অথবা গ্রামীণ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের বিকাশের ব্যাপারে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। কেন্দ্রীয় সরকার যদিও শহুরে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বিকাশের জন্য বেশ উৎসাহ প্রদান করেছিল, কিন্তু তার কাঠামো এবং কার্যাবলীর দায় ভার মূলত প্রাদেশিক সরকারের উপরই গিয়ে পড়ে। গ্রামীণ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের মতই শহুরে প্রতিষ্ঠানসমূহকে কেন্দ্রীয় অথবা প্রাদেশিক সরকারের পরিকল্পনার আওতার বহির্ভূত রাখা হয়েছিল। কুড়ি এবং ত্রিশের দশক জুড়ে ব্যাপক পরিমাণে পৌর আইনসমূহ পাশ হয়েছিল। আর ১৮৮৮ সালে বোম্বে আইন পাশ হয়েছিল, যা পৌর সভাসমূহ বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় আইনসমূহের আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করছে। অনুরূপভাবে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তর প্রদেশ এবং পাঞ্জাব এসব প্রদেশে পুরাতন পৌর আইনসমূহ কার্যকর থেকেছে। আর আসাম (১৯৬০) উড়িষ্যা, অন্ধ্রপ্রদেশ (১৯৬৫), কেরালা (১৯৫৬), কর্ণাটক (১৯৬৪) এবং উত্তর প্রদেশ (১৯৬০) স্বাধীনতা উত্তরকালে তাদের পৌর সভাসমূহের মর্যাদার উন্নতকরণ প্রক্রিয়া সম্পাদন করেছে। দু'টি বিষয় এজন্য দায়ী ঃ

(১) প্রদেশের সীমারোখা পুনঃনির্ধারণের ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি প্রদেশে শহুরে সরকার সমূহ একাধিক আইন দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। ফলে বর্তমানে একাধিক আইন সমন্বিত করে একটি আইন প্রণয়নের আবশ্যকতা দেখা দিয়েছে।

(২) উত্তর প্রদেশ এবং মহারাষ্ট্রের মত প্রদেশগুলি তাদের পৌর আইনসমূহ কয়েক দশক আগে প্রণয়ন করেছে যদিও তা অপর্যাপ্ত এবং এগুলি হাল নাগাদকরণের প্রয়োজন আছে। অর্থাৎ স্বাধীনতা- উত্তরকালে ভারতে পৌর আইনসমূহ প্রণয়ন ও বিকাশের ক্ষেত্রে মূলত নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি এবং অবস্থা কাজ করেছে। পৌর-সভাসমূহের অনেক কাজই প্রাদেশিক সরকারসমূহ অথবা প্রাদেশিক সরকার সৃষ্ট বিশেষ কর্তৃপক্ষ দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে। পানি, বিদ্যুৎ, যানবাহন ব্যবস্থাপনা, শহুরে পরিকল্পনা ইত্যাদি কার্যক্রম পৃথক একটি সংস্থা দ্বারা সম্পাদন করার প্রবণতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। সংবিধানের ৬৪তম সংশোধনী বিলে কংগ্রেস (আই) সরকার নগরপালিকা বিল ১৯৮৯ প্রণয়নের মাধ্যমে শহুরে স্থানীয় সরকারসমূহের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে। কিন্তু পঞ্চায়েত বিলের সাথে এই বিলটিও রাজ্য সভায় গত ১৩ই অক্টোবর, ১৯৮৯ সালে বিরোধী দলের বিরোধিতার কারণে পাশ হতে পারেনি। [৭]

স্থানীয় সরকারগুলোর কাঠামো এবং গঠন

গ্রামীণ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ

বাংলাদেশের মতোই ভারতের গ্রামীণ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাতে মূলত তিনটি স্তরের বিকাশ ঘটেছে। প্রথমত; সর্বনিম্ন বা গ্রামীণ পর্যায়ে গ্রাম পঞ্চায়েত, দ্বিতীয়ত; মধ্যস্তরে অর্থাৎ ব্লক পর্যায়ে পঞ্চায়েত সমিতি, তৃতীয়ত; সর্বোচ্চ স্তরে অর্থাৎ জেলা পর্যায়ে জেলা পরিষদ। অবশ্য বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্নভাবে এসব স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ বিভিন্নভাবে বিকশিত হয়েছে। তবে মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড এবং লাক্ষ্যদ্বীপের মতো ইউনিয়ন টেরিটোরিতে কোন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বিকশিত হয়নি। শুধু অন্ধ্র, বিহার, গুজরাট, হিমাচল, কর্নাটক, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, রাজস্থান, তামিলনাড়ু, উত্তর প্রদেশ ও পশ্চিম বঙ্গে তিনস্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা ভারতে টিকে আছে। ভারতের কোন ইউনিয়ন টেরিটোরিতে তিন স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা চালু নাই। আসাম, হরিয়ানা, মনিপুর ও উড়িষ্যা-এ চারটি প্রদেশে এবং দিল্লী ও পন্ডিচেরী নামক দুটি ইউনিয়ন টেরিটোরিতে গ্রাম এবং ব্লক (অর্থাৎ মহকুমা বা তাল্লুক) পর্যায়ে দু'স্তর বিশিষ্ট পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আর জম্মু ও কাশ্মীর, কেরালা, সিকিম এবং ত্রিপুরা-এই চারটি প্রদেশে এবং আন্দামান ও নিকোবর আইল্যান্ড, অরুণাচল প্রদেশ, চন্ডিগড়, দিল্লী প্রভৃতি ইউনিয়ন টেরিটোরিতে শুধু একস্তর বিশিষ্ট পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠান চালু আছে।

---

৭. N. Sivanna : Panchayeti Raj Reforms & Rural Development, Chugh Publications, Alahabad, India-1990.

১৯৭৭ সালে Balvantray Mehta কমিটি ভারতে তিনস্তর বিশিষ্ট পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠান গঠনের সুপারিশ করে। কিন্তু যেহেতু ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী স্থানীয় সরকার সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের বিষয়টি প্রাদেশিক সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন, সেহেতু বেশ কয়েকটি প্রাদেশিক সরকার এই কমিটির সুপারিশমালা গ্রহণ করেনি। বরং এ সব প্রাদেশিক সরকারসমূহ বৃটিশ ঔপনিবেশিক সরকারের প্রবর্তিত আইনসমূহ সামান্য মাত্রায় সংশোধিত করে পূর্ববৎ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থারই বরং বিকাশ ঘটিয়ে এসব স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলির সীমানা পুনঃনির্ধারণ করে স্থানীয়ভাবে কেন্দ্রের শক্তি বৃদ্ধির প্রতি ঝোঁক দেখায়। এসব অঙ্গরাজ্যসমূহ সাম্প্রতিককালে বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতা এবং অন্যান্য রাজনৈতিক চাপ প্রভৃতি উপাদানসমূহ দ্বারা তাদের পছন্দের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছে। এটা ধারণা করা যায় যে, কিছু কিছু প্রদেশ পুনরায় চিন্তা করে দেখবে যে, আশোক মেহেতা কমিটির প্রতিবেদন (যা ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত হয়) অনুযায়ী দু'স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর কিনা?

পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠানের মেয়াদকাল অবশ্য ভারতের সবগুলি প্রদেশে এক রকম নয়। তবে উল্লিখিত প্রদেশগুলিতে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার স্তর সম্বন্ধে তেমন কোন বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় না। সাধারণভাবে পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠানসমূহের মেয়াদ হয় পাঁচ বছর, যা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মেয়াদের সাথে সামঞ্জস্যশীল। তবে মহারাষ্ট্রে এই মেয়াদ ৬ বছর, আসামে ৪ বছর, রাজস্থান ও সিকিমে ৩ বছর মেয়াদী হয়। কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারসমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠান করে নির্বাচন কমিশন। কিন্তু ভারতের স্থানীয় সরকারসমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠান করে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারসমূহ বা প্রাদেশিক সরকারসমূহ।

নীচে ভারতের স্থানীয় সরকারসমূহের বিভিন্ন স্তরে স্থানীয় সরকারসমূহের পর্যায় ক্রমিক আলোচনা করা হ'ল ঃ

গ্রাম্য পঞ্চায়েত (Village Panchayet) ঃ

ভারতের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে গ্রাম্য পঞ্চায়েত হলো তৃণমূল পর্যায়ের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান। তবে রাজ্যগুলিতে গ্রামীণ পঞ্চায়েতসমূহ বিভিন্ন রকমের এখতিয়ার নিয়ে গঠিত হয়েছে। একেকটি রাজ্যের গ্রামীণ পঞ্চায়েতের এখতিয়ার এবং কার্য-পরিধি নির্ধারণে একেকটি রাজ্য একেক রকমের পদ্ধতি অনুসরণ করেছে। উত্তর প্রদেশ, গুজরাট, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, আসাম এবং পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি প্রদেশ ক্ষুদ্রাকৃতির পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গঠন করেছে। সেসব প্রদেশে মাত্র এক হাজার লোকের জন্য একটি পঞ্চায়েত গঠন করা হয়েছে। অন্যদিকে তামিলনাডু এবং কেরালা বৃহদাকার পরিধি নিয়ে পঞ্চায়েত গঠন করেছে। এ প্রদেশ দু'টিতে ১৫,০০০

লোকের জন্য একটি পঞ্চায়েত গঠনের বিধান করা হয়েছে। এ জন্যই ভারতের প্রতিটি গ্রামে একটি করে পঞ্চায়েত গঠিত না হয়ে বরং যতগুলি গ্রাম আছে তার অর্ধেক সংখ্যক পঞ্চায়েত গঠিত হয়েছে। ১৯৮৪ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ভারতে মোট ৫,৮১,১৮৯টি পঞ্চায়েত গঠিত হয়েছিলো।

গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি মুলত সমন্বিত সংস্থা বা কর্পোরেট বডি। এগুলি গ্রামীণ স্থানীয় সরকারের একটি একক হিসেবে কাজ করার পাশাপাশি গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি কম্যুনিটি উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের এজেন্সী হিসেবেও কাজ করে। পঞ্চায়েতগণ মূলত গ্রামের সাধারণ মানুষের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। তবে বেশকিছু মনোনীত ব্যক্তিত্ব পঞ্চায়েতগুলির সদস্য হন। আর নির্বাচন প্রক্রিয়া মূলত গ্রাম সভার দ্বারা গোপন ব্যালটের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। তবে আসাম, জম্মু ও কাশ্মীর এবং উত্তর প্রদেশে হাত উচিয়ে ভোটাভুটির মাধ্যমে এখনও পঞ্চায়েতগণ নির্বাচিত হয়ে থাকেন। এইভাবে নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার লক্ষ্যে পঞ্চায়েত এলাকাকে কয়েকটি ওয়ার্ডে বিভক্ত করে প্রতিটি ওয়ার্ডের জন্য একজন করে সদস্য নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। বিহারে এখনও মনোনয়নের মাধ্যমে পঞ্চায়েত সদস্যরা নির্বাচিত হন। এখানে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানসহ মোট ৫জন সদস্য নির্বাচিত হন আর বাকী ৪ জন সদস্য মনোনীত হয়ে থাকেন।

গ্রাম-পঞ্চায়েত বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সংখ্যক সদস্য নিয়ে গঠিত হয়। মূলত ৫ থেকে ৩১ জন সদস্য নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত গঠিত হয়। তবে মহিলা, তফসীলি সম্প্রদায়, তফসীলি গোত্রসমূহের সামাজিক ও রাজনৈতিক বঞ্চনার কথা চিন্তা করে বেশীর ভাগ স্থানেই এসব বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, হরিয়ানা, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি প্রদেশের গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানগণ এলাকার সকল ভোটারের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। অন্যান্য প্রদেশের গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানগণ গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচিত সদস্যদের ভোটে পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। গ্রাম পঞ্চায়েতে নির্বাচিত সদস্যদের দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থনে অনাস্থা প্রস্তাব পাশের মাধ্যমে পঞ্চায়েত প্রধান অপসারিত করা যায়। তিনি সভা আহবান, আলোচ্যসূচি নির্ধারণ এবং উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন। তিনি পঞ্চায়েতরাজ প্রতিষ্ঠানের পরবর্তী স্তর অর্থাৎ পঞ্চায়েত সমিতির এক্স-অফিসিও সদস্য হিসেবে কাজ করেন।

পঞ্চায়েতী সমিতি ঃ

পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠানের পরবর্তী উচ্চতর ধাপ হলো পঞ্চায়েতী সমিতি। পঞ্চায়েতী সমিতি গ্রামীণ স্থানীয় সরকারসমূহের মধ্যবর্তী মৌলিক এবং সৃজনশীল স্তর হিসেবে বিবেচিত হয়। ১৯৮৪ সালে ভারতে ৪৫২৬টি পঞ্চায়েতী সমিতি ছিলো। গড়ে একটি পঞ্চায়েতী সমিতির অধীনে ৪৮টি গ্রাম পঞ্চায়েত ক্রীয়াশীল থাকে।

সাধারণত এটি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং জেলা পরিষদ থেকে বেশি ক্ষমতাশালী। Balvantray Mehta কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী এই ব্যবস্থা কার্যকর হয়। পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, পঞ্চাশের দশকে ব্লক পর্যায়ে কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট কার্যক্রম সমূহ বাস্তবায়িত হলেও ব্লক পর্যায়ে কোন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বিকাশ ঘটেনি। এ জন্যই উক্ত কমিটি ব্লক পর্যায়ে অর্থাৎ মধ্যবর্তী পর্যায়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বিকাশের জন্য জোর সুপারিশ করেছিল। কয়েকটি প্রদেশ বাদে ভারতের সবগুলি প্রদেশেই দু'স্তর অথবা তিনস্তর বিশিষ্ট গ্রামীণ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বিকাশ ঘটেছে। তবে আসাম, গুজরাট এবং কর্ণাটকে মহকুমা তাল্লুক পর্যায়ে অর্থাৎ ব্লক এবং জেলার মধ্যবর্তী পর্যায়ে স্থানীয় সরকারের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। কাঠামোগতভাবে বিভিন্ন প্রদেশের পঞ্চায়েত সমিতির মধ্যে মৌলিক কাঠামোগত সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। পঞ্চায়েতী সমিতিসমূহের সীমারেখা এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে ভিন্ন হয়। গ্রাম পঞ্চায়েতের মতো প্রতিটি পঞ্চায়েতী সমিতিই একটি কর্পোরেট বডি হিসেবে কাজ করে। পঞ্চায়েতী সমিতির সদস্যপদ মূলত দু'ভাবে অর্জিত হয়ে থাকে। (১) প্রতিনিধি সদস্যপদ, (২) কো-অপ্ট করা সদস্যবৃন্দ। প্রতিনিধি সদস্যরা আবার (ক) এক্স অফিসিও সদস্য (খ) সরাসরিভাবে নির্বাচিত সদস্য (গ) পরোক্ষভাবে নির্বাচিত সদস্য এই তিন ভাবে এসে থাকেন। আর কো-অপ্ট করা সদস্যরা মূলত মহিলা, তফসীলি সম্প্রদায়, তফসীলি উপজাতি এবং বিশেষ স্বার্থ গোষ্ঠীর সহযোগী সদস্য এবং অফিসিয়াল সদস্যদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে থাকে।

সংবিধিবদ্ধ সংস্থাসমূহের প্রতিনিধি সদস্যগণ মূলত মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ, সমবায় সমিতিসমূহের প্রতিনিধি এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানগণই হয়ে থাকেন। এসব সদস্যদের ভোট দানের ক্ষমতা থাকে। পঞ্চায়েতী সমিতির সমগ্র এলাকা অথবা তার অংশ বিশেষের প্রতিনিধিত্বকারী এমএলএ গণ বা এমপিগণই মূলত সহযোগী সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। এদের কোন ভোট দানের ক্ষমতা নাই। প্রদেশসমূহের মধ্যে এমপি এবং এম এল এ গণের এই সহযোগিতার ধরনের মধ্যে ভিন্নতা আছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের মতো প্রতিটি প্রদেশেই মহিলা, তফসীলি জাতি ও তফসীলি উপজাতিদের সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করার ব্যবস্থা আছে। কয়েকটি প্রদেশে বিশেষ স্বার্থ গোষ্ঠীকে (অর্থাৎ প্রগতিশীল কৃষক সমিতি, মার্কেটিং সোসাইটি এবং কো-অপারেটিভসমূহ) বিশেষত যারা প্রশাসনিক, পল্লী উন্নয়ন, সমাজকর্ম, পরিকল্পনা প্রণয়ন এর কাজে দক্ষ ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন; তাদেরকে কো-অপ্ট করার ব্যবস্থাও বেশ কয়েকটি প্রদেশে রাখা হয়েছে। তাদের ভোটাধিকার আছে। আর চতুর্থ রকমের সদস্যরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হয়ে আসেন। একটি পঞ্চায়েতী সমিতির অধীন সকল গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যদের দ্বারা নির্বাচনের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় আর প্রত্যক্ষ ভোট এলাকার সকল প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচনকেই বুঝায়। শুধু কর্ণাটক প্রদেশে পঞ্চায়েতী সমিতির সদস্যরা প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। আসাম, মহারাষ্ট্র এবং পশ্চিমবঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত ও এক্স-অফিসিও সদস্যদের নিয়ে পঞ্চায়েতী

সমিতি গঠিত হয়। অন্যদিকে হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, রাজস্থান প্রভৃতি প্রদেশে কিছু সদস্য এক্স অফিসিও হলেও বাকী সকল সদস্যই পরোক্ষভাবে নির্বাচিত। সর্বশেষে বলা যায় যে, অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, গুজরাট, মনিপুর, উড়িষ্যা এবং তামিলনাডু রাজ্যে পঞ্চায়েতী সমিতিসমূহ এক্স অফিসিও সদস্যদের দ্বারা গঠিত হয়। হরিয়ানা, পাঞ্জাব, উড়িষ্যা এবং পশ্চিমবঙ্গে ব্লক উন্নয়ন কর্মকর্তারা পঞ্চায়েতী সমিতিতে এক্স অফিসিও সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। তারা পঞ্চায়েতী সমিতির সভাগুলিতে যোগদান করতেন, কিন্তু তাদের ভোটাধিকার ছিল না।

রাজস্থান ব্যতীত ভারতের সবগুলি প্রদেশেই পঞ্চায়েতী সমিতির চেয়ারম্যান গ্রামীণ পঞ্চায়েতের সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে থাকেন। সকল পঞ্চায়েতী সমিতির সদস্য, সকল গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য এবং নগর পঞ্চায়েতের সদস্য প্রমুখ প্রতিনিধির সমন্বয়ে বৃহত্তর নির্বাচকমন্ডলী গঠিত হয়।

জেলা পরিষদ ঃ

পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশ হিসেবে জেলা পরিষদ নতুন ব্যবস্থা হলেও জেলা পর্যায়ের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে জেলা পরিষদ প্রাচীনতম স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের অন্যতম। জেলা পরিষদ পঞ্চায়েতীরাজ কাঠামোর সর্বোচ্চ স্তর। তবে বর্তমানে আসাম, হরিয়ানা, জম্মু ও কাশ্মীর, কেরালা, মনিপুর, উড়িষ্যা, সিকিম এবং ত্রিপুরা প্রভৃতি রাজ্যে জেলা পরিষদের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। বর্তমানে সমগ্র ভারতে ৩০০টি জেলা পরিষদ বিদ্যমান। এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে জেলা পরিষদের অর্পিত দায়িত্বের মধ্যে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। এই ভিন্নতা জেলা পরিষদের গঠন আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং কার্যক্রমের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে। ভূমিকার দিক থেকে চিন্তা করলে সমগ্র ভারতে জেলা পরিষদ তিন ধরনের হয়ে থাকে। এগুলি হলো ঃ

(ক) সম্পূর্ণভাবে তত্ত্বাবধানকারী এবং সমন্বয়কারী, যেমন রাজস্থান, তামিলনাডু, মধ্য প্রদেশ এবং বিহার প্রদেশে এই ব্যবস্থা চালু আছে।

(খ) জেলা পরিষদের এজেন্ট হিসেবে ক্রিয়াশীল পঞ্চায়েত সমিতির সম্পূর্ণ প্রশাসক হিসেবে, যেমন মহারাষ্ট্র এবং গুজরাট।

(গ) এই দুই ধরনের ব্যবস্থার সমন্বয় অর্থাৎ সমন্বয়কারী এবং তদারককারীর ভূমিকার সাথে কর্তৃত্বকারী হিসেবে ক্রিয়াশীল জেলা পরিষদ যেমন-অন্ধ্র প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ ইত্যাদি।

যদিও এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশের জেলা পরিষদের গঠন ক্ষমতা ও কর্ম পরিধির ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়, তবুও সাধারণভাবে জেলা পরিষদের সদস্যরা নিম্নলিখিতভাবে সদস্য পদ লাভ করেন ঃ

১। মধ্যবর্তী স্তরের প্রতিনিধি ঃ প্রতিটি প্রদেশেই স্থানীয় সরকারের মধ্যবর্তী স্তর অর্থাৎ পঞ্চায়েতী সমিতির চেয়ারম্যানগণ জেলা পরিষদে প্রতিনিধিত্ব করেন। এটা বলা যায় যে, প্রতিটি পঞ্চায়েতী সমিতির চেয়ারম্যানরাই তাদের এক্স অফিসিও সমর্থন দ্বারা জেলা পরিষদের প্রতিনিধিত্ব করেন। এই এক্স অফিসিও সদস্যদের ভোটদানের ক্ষমতা থাকে। যে সব প্রদেশের জেলা পরিষদে শুধু এক্স অফিসিও সদস্য থাকেন সে প্রদেশগুলি হলো-অন্ধ্রপ্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ, রাজস্থান, তামিলনাড়ু এবং উত্তর প্রদেশ।

২। সরাসরি নির্বাচিত সদস্য ঃ শুধু মহারাষ্ট্র এবং গুজরাট প্রদেশেই পঞ্চায়েতী সমিতির এজেন্ট হিসেবে তাঁরা জেলা পরিষদের সম্পূর্ণভাবে নির্বাহী কর্তৃত্ব নিয়ে কাজ করেন। এই প্রদেশ দু'টিতে জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যরা কাজ করেন। মহারাষ্ট্রে সরাসরিভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ জেলা পরিষদে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে থাকেন। এখানে ৪০ থেকে ৬০ জন কাউন্সিলারকে সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে বাছাই করা হয়। সাধরণত একজন কাউন্সিলার প্রায় ৩৫,০০০ মানুষের প্রতিনিধিত্ব করেন।

কর্ণাটক, পশ্চিমবঙ্গ এবং মধ্য প্রদেশে জেলা পরিষদের কতিপয় সদস্যকে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত করা হয়। তবে অন্যান্য সদস্যরা এক্স অফিসিও সদস্যও হতে পারেন। বিহার এবং পাঞ্জাবে কয়েকজন সদস্য এক্স অফিসিও। আর বাকিরা সংশ্লিষ্ট জেলার পঞ্চায়েতী সমিতির চেয়ারম্যানদের দ্বারা গঠিত নির্বাচক মন্ডলীর মাধ্যমে পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন।

৩। কো-অপ্ট করা সদস্যবৃন্দ ঃ অন্যান্য স্তরের পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠানসমূহের মতো জেলা পরিষদের গঠন প্রক্রিয়ায় সদস্য কো-অপ্ট করার নীতি ভারতের প্রায় সবক'টি প্রদেশে মেনে চলা হয়। তামিলনাড়ু বাদে ভারতের সবক'টি প্রদেশে মহিলা, তপসীলি সম্প্রদায় এবং তপসীলি উপজাতিদের প্রতিনিধি জেলা পরিষদের কো-অপ্ট করা সদস্য হিসেবে মনোনীত হন স্বয়ংক্রিয়ভাবে। রাজস্থান ও উত্তর প্রদেশে প্রশাসন, পল্লী উন্নয়ন এবং সামাজিক জীবনযাত্রার বিভিন্ন স্তরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের কো-অপ্ট করার রীতি প্রচলিত আছে। সকল কো-অপ্ট করা সদস্যেরই ভোটদানের অধিকার আছে।

৪। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্বকারী সদস্য ঃ মিউনিসিপ্যাল কমিটি, স্কুল বোর্ড, কো-অপারেটিভ সোসাইটিসমূহ, মার্কেটিং বোর্ড প্রভৃতি সংবিধিবদ্ধ সংস্থার প্রতিনিধিগণ পদাধিকার বলে জেলা পরিষদের সহযোগী সদস্য হিসেবে পদাধিকার বলে কাজ করেন। তবে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষমতা থাকে না।

৬। দাপ্তরিক সদস্য ঃ মহারাষ্ট্র, বিহার এবং উত্তর প্রদেশের জেলা পরিষদসমূহে দাপ্তরিক সদস্য মনোনয়নের কোন বিধান রাখা হয়নি। অপরদিকে কর্ণাটক এবং তামিলনাড়ু প্রদেশের জেলা পরিষদে দাপ্তরিক সদস্যদের জেলা পরিষদের সদস্য হিসেবে ক্রিয়াশীল থাকতে দেয়া হয়। আর এসব সদস্যরা হলেন জেলা পর্যায়ের পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন কার্যক্রম সমূহ বাস্তবায়নের জন্য ক্রিয়াশীল বিভাগসমূহের কার্যক্রম বাস্তবায়নের সাথে জড়িত বিভিন্ন বিভাগের প্রতিনিধিবৃন্দ। আসাম, উড়িষ্যা, রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ

এবং পাঞ্জাব এর জেলা পরিষদসমূহে জেলা শাসক অথবা কালেক্টর এবং জেলা উন্নয়ন কমিশনার প্রমুখ কর্মকর্তাদের শুধু জেলা পরিষদের সদস্য হিসেবে কাজ করার সুযোগ দেয়। তবে এভাবে মনোনীত অফিসিয়াল সদস্যরা মূলত উপদেশমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেন। অফিসিয়াল সদস্যরা ভোটধিকার প্রয়োগ করার অথবা কোন অফিস ব্যবহারের সুযোগ পান না।

৭। চেয়ারম্যান ঃ জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অনেক ক্ষমতার অধিকারী। যে সব প্রদেশে জেলা পরিষদ প্রশাসনিক কর্তৃত্বের অধিকারী, সে সব প্রদেশে এই ক্ষমতা বা কর্মপরিধির ব্যাপ্তি অনেক বিস্তৃত। এভাবে জেলা পরিষদসমূহ একটি জেলায় ব্যাপক ক্ষমতা ভোগের মাধ্যমে শক্তিধর অবস্থানের অধিকারী। অন্ধ্রপ্রদেশ এবং পশ্চিম বঙ্গে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সরাসরিভাবে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। অরুণাচল এবং তামিলনাড়ুতে জেলা পরিষদ চেয়ারম্যানগণ মনোনয়নের মাধ্যমে আসেন। বাকী প্রদেশগুলিতে তাঁরা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠানসমূহের সর্বোচ্চ স্তরে আসীন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি তথা নির্বাহী প্রধান হিসেবে জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান বিস্তর প্রশাসনিক ক্ষমতা ও অধিকার ভোগ এবং প্রয়োগ করে থাকেন। তিনি জেলা পরিষদের সভার সভাপতিত্ব করেন এবং এই সভার কার্য বিবরণী লিপিবদ্ধ ও বাস্তবায়ন করেন। তিনি সভা আহবান করেন এবং সভার আলোচ্যসূচিসমূহ নির্ধারণের মতো গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম সম্পন্ন করে থাকেন। তিনি জেলা পর্যায়ের পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠানগুলির সিলেকশন কমিটির সভাপতি হিসেবে কাজ করেন। আর এই কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে তিনি জেলার অন্তর্গত সমস্ত গ্রামীণ পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠানসমূহের সদস্য মনোনয়ন দান করেন। জেলা পর্যায়ে গৃহীত স্কীমসমূহ এবং সমুদয় উন্নয়ন কর্মকান্ডের তিনিই নিয়মিতভাবে তদারকী ও পরিদর্শন করেন। বিধিগতভাবে নির্ধারিত তার ক্ষমতার বাইরেও তিনি জেলায় অনানুষ্ঠানিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হিসেবে বিদ্যমান থাকেন। তিনি সংগত কারণেই রাজনৈতিক দলগুলিতেও মর্যাদাশীল আসন এবং পদমর্যাদা পেয়ে থাকেন। তিনি পরবর্তীতে জাতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ রাজ্য সভা এমনকি লোক সভায় সদস্য অর্থাৎ MLA অথবা MNA হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার জন্য যোগ্য প্রার্থী হিসেবেও সমাজের কাছে সমাদৃত হয়ে থাকেন। প্রকৃত অর্থে সমুদয় কর্তৃত্ব এবং সামগ্রিক কর্মকান্ডের প্রতিভূ অর্থাৎ কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সমুদয় কর্মকান্ড সম্পন্ন করে থাকেন। জেলা পরিষদের সকল সদস্য একত্রিভাবে তার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করলেই জেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করা যায়। বেশীর ভাগ প্রদেশেই এভাবে কঠোর প্রক্রিয়ায় জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনা যায়। পাঞ্জাবে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের নির্বাচনের দিন থেকে এক বছরের মধ্যে চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে আর অনাস্থা আনা যাবেনা মর্মে আইন পাশ করা হয়েছে। আর অনাস্থা প্রস্তাব

যখন আনা হবে তখন সেই প্রস্তাবটি আবশ্যিকভাবে দুই-তৃতীয়াংশ নির্বাচিত/কো-অপ্ট করা সদস্যের ভোটে পাশ হতে হবে।

পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠানসমূহের কমিটি ব্যবস্থা

ভারতের পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠানসমূহের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো এগুলির কমিটি ব্যবস্থাপনা। পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠানসমূহ নিয়ন্ত্রকারী আইনগুলিতে পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার সর্বস্তরে কমিটি গঠনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। পঞ্চায়েতী প্রতিষ্ঠানসমূহ আকৃতিতে ছোট হওয়ার ফলে এসব প্রতিষ্ঠানে বিস্তারিতভাবে আলাপ আলোচনা করে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় এবং প্রতিটি সদস্য বা কাউন্সিলারই সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারেন। ভারতের সবক'টি প্রদেশেই কমিটি ব্যবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে এর প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। তবে সংখ্যা, আকৃতি এবং উদ্দেশ্যের দিক থেকে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির মধ্যে ঐক্যের অভাব আছে। কয়েকটি প্রদেশে এরূপ কমিটির সংখ্যা এক থেকে আটটি পর্যন্ত হয়। অন্যান্য প্রদেশগুলিতে সুনির্দিষ্টভাবে কমিটি ব্যবস্থার কোন সংস্থান রাখা হয়নি, তবে পঞ্চায়েতসমূহ তাদের প্রয়োজন মতো কমিটি গঠন করতে পারে।

গ্রাম পঞ্চায়েতের মতো পঞ্চায়েত সমিতিগুলিও সুনির্দিষ্ট কিছু কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে ষ্ট্যান্ডিং কমিটির মাধ্যমে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে। মধ্যবর্তী পর্যায়ে সার্বিক কর্মকান্ড সম্পাদনের লক্ষ্যে তিন থেকে আটটা পর্যন্ত কমিটি গঠনের মাধ্যমে প্রদেশগুলির পঞ্চায়েত সমিতি তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে। আসাম, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, রাজস্থান এবং কর্ণাটক প্রদেশে শুধু তিনটি কমিটি গঠনের মাধ্যমে কাজ সম্পাদিত হয়। অথচ বিহারে আটটি কমিটি গঠনা করা হয়। গুজরাটে মাত্র দু'টি কমিটি (উৎপাদন কমিটি এবং নির্বাহী কমিটি) গঠন করা হয়। তবে এছাড়াও প্রয়োজন অনুযায়ী অনধিক পাঁচটি পর্যন্ত কমিটি গঠন করা যায়। ভারতে সবক'টি প্রদেশেই জেলা পরিষদের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে কমিটি গঠনের ব্যবস্থা নেয়া হয়। এসব কমিটির অফিসের কার্যক্রমের মেয়াদ এবং চেয়ারম্যানদের নিয়োগদানের প্রক্রিয়ায় এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে যথেষ্ট ভিন্নতা থাকে।

এটা সত্য যে, পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠানসমূহের কমিটি ব্যবস্থায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু এসব কমিটির পারফরমেন্স সম্বন্ধে বিভিন্নজন বিভিন্ন মত পোষণ করেন। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, কমিটি ব্যবস্থায় কয়েকজন ব্যক্তির শুধু সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় একচেটিয়াত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায় যে, কমিটির সিদ্ধান্ত প্রায়শঃই রাজনৈতিক প্রভাব এবং স্বার্থান্ধতার দ্বারা প্রভাবিত হয়। আবার কমিটির সদস্যবৃন্দ তাদের স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করতে বাধাগ্রস্ত হন এবং স্বাধীন চিন্তার বিকাশ ঘটাতে পারেন না ভারতের স্থানীয় সরকারসমূহে মূলত কমিটি ব্যবস্থার মাধ্যমে কাজ করার ঐতিহ্য না থাকার কারণে।

শহুরে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ

ভারতে মোট ৫ ধরনের শহুরে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ক্রিয়াশীল।

নিম্নে এসব শহুরে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো ঃ

(ক) মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ঃ

ভারতের বৃহদাকার শহরগুলির বড় ধরনের সমস্যা সমাধান ও সেবা প্রদান কার্যক্রম সুষ্ঠ ও সুন্দরভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন গঠিত হয়। মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলগুলি থেকে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনসমূহ অনেক বেশী ক্ষমতা ও স্বায়ত্ব শাসন ভোগ করে থাকে। মিউনিসিপ্যাল কর্পোরশনসমূহ মূলত দু'ধরনের কাজ করে।

(১) বাধ্যকরী কার্যক্রমসমূহ

(২) ঐচ্ছিক কার্যক্রমসমূহ

ভারতে বিদ্যমান মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনসমূহের আকৃতি, জনসংখ্যা, খাজনা আদায় প্রভৃতি দিক দিয়ে একটির সাথে অন্যটির পার্থক্য থাকলেও এগুলোর নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য সমূহ পরিলক্ষিত হয় ঃ

(১) প্রাদেশিক আইন সভা কর্তৃক প্রণীত আইনের অধীনে একটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়।

(২) মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের গঠন মূলত নির্বাহী কর্তৃত্ব থেকে পৃথকীকরণের মাধ্যমে বিকশিত হয়।

(৩) কর্পোরেশনের আনুষ্ঠানিকভাবে প্রধান হিসেবে একজন মেয়র সর্বদা কাজ করেন। নবায়নযোগ্য এক বছর মেয়াদকালের জন্য তিনি ক্ষমতাসীন থাকেন।

(৪) প্রাদেশিক সরকারগুলি কর্পোরেশনের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ও তদারকী করে। এই প্রতিষ্ঠানের অবসান ঘটিয়ে তার প্রশাসনিক কর্তৃত্ব হাতে নেয়ার ক্ষমতাও প্রাদেশিক সরকার সংরক্ষণ করে।

মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মধ্যে মেয়র হলেন মধ্যমনি। তাকে সহযোগিতা করার জন্য কমিশনারবৃন্দ কাজ করেন। তাছাড়া কাউন্সিল ও কাউন্সিল কমিটি গঠিত হয় প্রতিটি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এর কার্যক্রম সুষ্ঠ ও সুন্দরভাবে পরিচালিতকরণের লক্ষ্যে। এই কাউন্সিলের সদস্যগণ সার্বজনীন ভোটাধিকার ভিত্তিতে ৩ থেকে ৫ বছরের (প্রদেশে প্রদেশে সময়ের বা মেয়াদের ভিন্নতা থাকে) জন্য নির্বাচিত হয়। এই কাউন্সিল মূলত মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের আইন সভা হিসেবে কাজ করে। এই কাউন্সিল গুলির আকৃতিগত ভিন্নতা রয়েছে প্রদেশ থেকে প্রদেশে। কোন কোন প্রদেশে এই সদস্য সংখ্যা ২২ জন। যেমন পশ্চিম বঙ্গের চন্দননগর কর্পোরেশন। আবার মুম্বাই কর্পোরেশনের মত বৃহৎ কর্পোরেশনের কাউন্সিল ১৩১ সদস্য বিশিষ্ট হয়।

মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের কাউন্সিল সদস্যরা কাউন্সিলার হিসেবে পরিচিত। কোন কোন প্রদেশে এই কাউন্সিলারদের দ্বারা অল্ডারম্যানগণ নির্বাচিত হন। এই অল্ডারম্যানগণ নির্বাচিত কাউন্সিলারদের মত সুযোগ সুবিধা ভোগ করে থাকেন।

কর্পোরেশনের মেয়রগণ এই কাউন্সিলের আইনগতভাবে প্রধান ব্যক্তি, অল্ডারম্যান এবং কাউন্সিলারদের মধ্য থেকে তাদের দ্বারাই এক বছরের জন্য নির্বাচিত হয়। এই মেয়রগণের কোন প্রশাসনিক কর্তৃত্ব থাকেনা। প্রশাসনিক কর্তৃত্ব মূলত মিউনিসিপ্যাল কমিশনার (যারা সরকারী কর্মচারী) দের হাতে থাকে। মুখ্য প্রশাসক হিসেবে কমিশনার সমগ্র কর্পোরেশনের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার তদারক করেন এবং কাউন্সিলের সচিবালয়ের প্রশাসনিক নিয়ন্তা হিসেবে কাজ করেন। তবে কোন কোন কর্পোরেশনের মেয়র কর্পোরেশনের সমস্ত ধরনের রেকর্ড পত্র দেখতে পারেন এবং কর্পোরেশনের যে কোন ধরনের তথ্য প্রদানের জন্য বলতে পারেন। নির্দিষ্টকৃত সংখ্যক কাউন্সিলাররা সভা আহবানের জন্য রিকুইজিশন প্রদান করলে মেয়র বিশেষ সভা আহ্বান করতে পারেন।

মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম দেখাশুনার জন্য বিভিন্ন রকমের কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটিগুলি বিধিবদ্ধ অথবা অবিধিবদ্ধ হতে পারে। এই কমিটি গুলির মধ্যে ষ্ট্যান্ডিং কমিটি হলো সব থেকে শক্তিশালী কমিটি। ষ্ট্যান্ডিং কমিটি মূলত ষ্টিয়ারিং কমিটি হিসেবে কাজ করে। এই কমিটি পারসোনেল ব্যবস্থাপনা, সামগ্রিক প্রশাসন এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনার তদারক করে। অল্ডারম্যান এবং কাউন্সিলরগণের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব অনুযায়ী তাদের মধ্য থেকে ষ্টান্ডিং কমিটির সদস্যরা নির্বাচিত হয়ে থাকেন। ষ্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যানও এই কাউন্সিলরদের মধ্য থেকে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। এদিক থেকে বিবেচনা করে এই ষ্ট্যান্ডিং কমিটিকে কর্পোরেশনের প্রশাসনিক কমিটি বলা যায়। বিধিগতভাবে প্রাপ্ত ক্ষমতানুযায়ী এই কমিটি কাজ করে থাকে। এই কমিটি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের কমিশনার এবং মিউনিসিপ্যাল প্রশাসনের মধ্যে সেতু বন্ধন হিসেবে কাজ করে। মিউনিসিপ্যাল কমিশনার তার কার্যক্রমের জন্য এই ষ্ট্যান্ডিং কমিটির নিকট দায় বদ্ধ থাকেন। প্রাদেশিক সরকার দ্বারা নির্দিষ্ট মেয়াদের (৩ বছর থেকে ৫ বছর) জন্য নিয়োজিত হয়ে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের কমিশনার মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করেন। সাধারণত মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের কমিশনার সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হয়ে তিনি কর্পোরেশনের বাজেট প্রণয়ন ও নিয়ন্ত্রণ করেন। আর জরুরী অবস্থার সময় তিনি যে কোন ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারেন। তবে নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্যকরণের দর্শনের উপর ভিত্তি করে কশিনারের নিয়োগ প্রদান করা হয়।

মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের কমিশনারের কাজকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারেঃ (১) বিধিবদ্ধ কার্যাবলী (২) ষ্ট্যান্ডিং কমিটি ও কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত কার্যাবলী।

কর্পোরেশনের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে তিনি কাউন্সিলের এবং কমিটির সভায় জোরালোভাবে মত ব্যক্ত করতে পারেন। কিন্তু তার কোন ভোটদানের ক্ষমতা নেই। তিনি কর্পোরেশনের সকল কর্মচারীর নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা হিসেবে কর্মচারীদের নিয়োগ, পদন্নোতি এবং শৃঙ্খলামূলক বিষয়াবলী নিয়ন্ত্রণ করেন এবং এতদ্বিষয়ে ষ্ট্যান্ডিং কমিটিও কাউন্সিল কমিটির সাথে ক্ষমতার শরীক হিসেবে কাজ করেন। আর কর্পোরেশনের বাজেট তৈরী করার দায়িত্ব কমিশনারের উপরে ন্যস্ত থাকে। তবে বাজেট পাশ করার ক্ষেত্রে মৌলিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং এক খাত থেকে অন্য খাতে অর্থ স্থানান্তরের ক্ষেত্রে কাউন্সিল কমিটি এবং ষ্ট্যান্ডিং কমিটির মাধ্যমে মতামত নিতে হয়। এই কাউন্সিল কমিশনারের একচ্ছত্র ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে নিয়ন্ত্রণ আরোপ অথবা পরামর্শ প্রদান করে থাকে।

(খ) মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল ঃ

ভারতের প্রায় এক হাজার আটশত মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল আছে। প্রদেশগুলির প্রণীত আইন অনুযায়ী এই কাউন্সিলসমূহ পরিচালিত হয়। ভারতের মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল গঠনের ও বিকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট আইন সমূহ মূলত এই শতকের ২০ এবং ৩০ এর দশকে প্রণীত হয়েছিল। তবে ৫০ এর দশকে এসে ভারতের বেশীর ভাগ প্রদেশেই যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী এবং প্রদেশসমূহের সীমানা চিহ্নিতকরণের সমস্যা দূর করার লক্ষ্যে নতুন আইন প্রণয়ন করেছে।

মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল মূলত মাঝারী ধরনের শহরগুলিতে (যেখানে শহুরে উপাদান সমূহের প্রয়োজনীয়তা ব্যাপকভাবে অনুভূত হয় অথচ মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন গঠনের প্রয়োজনীয়তা নাই) গঠিত হয়। কোন শহরের লোকসংখ্যার ভিত্তিতে যদিও মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল গঠিত হয়, তবুও এই সংখ্যার কোন নির্দিষ্ট মাত্রা নাই। উড়িষ্যা, বিহার প্রভৃতি প্রদেশের মাত্র ৫,০০০ লোক বসতি সম্পন্ন শহরেও মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল গঠিত হয়। আবার গুজরাটের মতো প্রদেশে ত্রিশ হাজার লোক বসতি সম্পন্ন শহরের জন্য মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল গঠিত হয়। লোক সংখ্যার অনুপাত ছাড়াও কোন কোন প্রদেশে আয়ের বিষয়টিও মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল গঠনের ক্ষেত্রে শর্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল জনগণের প্রতিষ্ঠান হিসেবে মিউনিসিপ্যাল আইনের অধীনে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করে। এসব আইন 'বাই ল' হিসেবে বিবেচিত হয়। সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের কাউন্সিলরগণ ৩ থেকে ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। আর মিউনিসিপ্যাল আইন দ্বারা মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়। এখানে তফসিলী সম্প্রদায়ের জন্য এবং মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ করে রাখা হয়।

কাউন্সিলরগণ তাদের মধ্য থেকে একজনকে চেয়ারম্যান বা প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করেন। এই প্রেসিডেন্টই মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের সভা আহ্বান করেন। আড়ম্বরপূর্ণ মেয়রের অফিস থাকা সত্ত্বেও মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের প্রেসিডেন্টের হাতেই নির্বাহী

ক্ষমতা প্রদান করা হয়ে থাকে। তিনি মিউনিসিপ্যালটির সাধারণ প্রশাসন এবং আর্থ-বিষয়ক ব্যবস্থাপনা তদারক করেন। কোন কোন প্রদেশে তিনি নির্বাহী অফিসারের কার্যক্রমের বিরুদ্ধে আপীল শ্রবণকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে কাজ করেন এবং তার হাতে থাকা জরুরী ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগ করেন। তিনি সমুদয় রেকর্ড পত্র দেখার ক্ষমতা রাখেন এবং মিউনিসিপ্যাল প্রশাসনে যে কোন তথ্য প্রদানের জন্য যে কোন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বলতে পারেন।

বেশিরভাগ প্রদেশের কাউন্সিলই নির্বাহী কর্মকর্তাদের নিয়োগদান করে থাকেন। উড়িষ্যা, তামিলনাডু এবং কর্ণাটক প্রদেশে তিনি প্রাদেশিক সরকার দ্বারা নিয়োগপ্রাপ্ত হন। তিন-চতুর্থাংশ সংখ্যা গরিষ্ঠতার মাধ্যমে মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত রেজুলেশন দ্বারা তিনি অপসারিত হতে পারেন। তিনি বাস্তবিক অর্থে সব দিক থেকে চেয়ারম্যানের অধীন থেকে কাজ করেন। মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের মধ্যে পুরোপুরিভাবে কমিটি ব্যবস্থা ক্রিয়াশীল থাকে। তাছাড়াও আইন যে কোন প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে এই সব কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিধান রেখেছে।

(গ) নোটিফাইড এরিয়া কমিটি ঃ

যে সব এলকায় মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল গঠন করার মত প্রয়োজনীয় শর্তাবলী পূরনের অবস্থা বিদ্যমান নাই, অথচ এলাকাটি গুরুত্বপূর্ণ সেসব এলাকায় নোটিফাইড এরিয়া কমিটি নামে বিশেষ ধরনের কমিটি গঠন করা হয়। নোটিফাইড এরিয়া কমিটি সাধারণত একটি উন্নয়নমুখী শহরের বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে গঠিত হয়। প্রাদেশিক সরকার সাধারণত সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই কমিটি গঠনের বিষয়টি ঘোষণা করেন। মিউনিসিপ্যাল আইনের কাঠামোর মধ্যেই এই কমিটির কর্মকান্ড পরিচালিত হয়। এই কমিটির হাতে মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের সমুদয় ক্ষমতা প্রদান করা হয়। এই কমিটি সরকার কর্তৃক মনোনীত একটি সংস্থা। এখানে নির্বাচিত সদস্যের কোন বিধান রাখা হয়নি। এই কমিটির চেয়ারম্যান এবং সদস্যরা প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক সরাসরিভাবে মনোনীত হয়ে থাকেন।

(ঘ) টাউন এরিয়া কমিটি ঃ

প্রায় চারশ'টি টাউন এরিয়া কমিটি সমগ্র ভারতে ক্রিয়াশীল। প্রাদেশিক সরকার দ্বারা পাশকৃত পৃথক আইন বলে টাউন এরিয়া কমিটিসমূহ পরিচালিত হয়ে থাকে। তবে জেলা কালেক্টরের হাতে এই কমিটিসমূহের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যাপক ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। এই কমিটির সদস্যবৃন্দ আংশিকভাবে নির্বাচিত হন এবং আংশিক সদস্যরা সরকার কর্তৃক মনোনীত হয়ে থাকেন। এই কমিটি কয়েকটি নির্দিষ্ট কাজ করে থাকে। টাউন এরিয়া কমিটির পরিবর্তে নগর বা শহর পঞ্চায়েত গঠন করার জন্য কয়েকটি প্রদেশে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

(ঙ) ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড ঃ

১৯৯১-সালের আদমশুমারীর তথ্যানুযায়ী ভারতে মোট ৬৩টি ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড ক্রিয়াশীল ছিল। এ প্রতিষ্ঠান মূলত ক্যান্টনমেন্ট এলাকার কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত থাকে।

ভারতের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহের গঠন এবং কাঠামোর সাথে সম্পৃক্ত কিছু সমস্যা ঃ

ভারতের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সামগ্রিক কর্মকান্ড ও প্রভাবের উপরে বিশেষত এর আর্থ-সামাজিক প্রভাবের উপরে ব্যাপকভাবে গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। এসব গবেষণার ভিত্তিতে দেখা গেছে ঃ

(১) ভারতের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে যারা নির্বাচিত হয়ে আসেন তাদের মধ্যে খুব কমই দরিদ্রতম শ্রেণী থেকে আসেন। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা বেশীর ভাগই আসেন সমাজের মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত শ্রেণী থেকে।

(২) আইন প্রণয়ন বা নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের জন্য যতো প্রচারণা চালানোই হোক না কেন, ভারতের স্থানীয় সরকারসমূহের ক্ষমতা কাঠামোতে খুব কম সংখ্যক মহিলারই প্রতিনিধিত্ব প্রতিফলিত হয়েছে।

(৩) অনুরূপভাবে ভারতের তফসীলী সম্প্রদায়ভুক্ত এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজনের প্রতিনিধিত্ব স্থানীয় সরকারসমূহে প্রতিফলিত করার জন্য প্রচেষ্টা চালানো হলেও খুব কম ক্ষেত্রেই সংখ্যালঘু এবং তফসীলি সম্প্রদায়ভুক্ত লোকজনের প্রতিনিধিত্ব স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় প্রতিফলিত হয়েছে।

(৪) বেশীর ভাগ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নেতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার স্তর মাধ্যমিক পর্যায়ের ঊর্ধ্বে যায় না। বরং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রতিনিধি মাধ্যমিক এবং নিম্নমাধ্যমিক পর্যায়ে এমন কি শুধু ন্যূনতম অক্ষরজ্ঞান নিয়ে নির্বাচিত হয়ে থাকেন।

(৫) এই ধরনের প্রতিকুল পরিস্থিতির কারণে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পদের সমাবেশ করণের ক্ষেত্রেই শুধু সমস্যার সৃষ্টি হয় না এবং যে সব কর্মসূচী এসব স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান করে তার গুণগত মান বজায় রেখে প্রকল্পগুলি যথার্থভাবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

(৬) ভারতের শহুরে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বৃটিশদের অনুকরণে আজও নির্বাহী কর্মকর্তাদের নিয়োগদানের যে ব্যবস্থা চালু আছে তার ফলে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রকৃত প্রতিনিধিত্বের পরিবর্তে সরকারী কর্মচারীদের প্রতিপত্তি বেশীমাত্রায় ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। যেমন মুম্বাইয়ের মিউনিসিপ্যাল কমিশনারের এবং রাজনৈতিক নির্বাহী হিসেবে কাউন্সিলের মেয়রের মনোনয়ন প্রদান করা হয়। বর্তমানে এই সমস্যাটির প্রকটতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে এজন্যই যে মিউনিসিপ্যাল কমিশনারদের নিয়োগদানের ফলে তাদের

সাথে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রায়ই মতদ্বৈধতা দেখা দেয় এবং এই মতদ্বৈধতার কারণে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহের উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেই শুধু প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয় না বরং তা স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিকাশের ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে।

ভারত ও বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার তুলনা

যদিও ভারতের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা বিশ্বের অন্যান্য উন্নত গণতান্ত্রিক দেশের মতো অতটা সুবিকশিত নয়, তবুও বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সাথে তুলনামূলক আলোচনায় বলা যায় যে, ভারতের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা এদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার তুলনায় অনেকটা উন্নত সুসংহত এবং ধারাবাহিকতার সোপান বেয়ে অনেক বেশী অগ্রগামী। নিচে সংক্ষেপে ভারত এবং বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা করার প্রয়াস নেয়া হলো।

(ক) বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা অত্যন্ত দ্রুত পরিবর্তনশীল। প্রায় প্রতিটি দশকেই এখানে বিদ্যমান স্থানীয় সরকার কাঠামোর উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে উন্নয়নের নামে সংস্কারের নামে, অথচ ভারতের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা ঐতিহ্যকে লালন করে বিকশিত হয়েছে। ভারতের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় কোন পরিবর্তন যে হয়নি তা নয়। তবে ভারতের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার কাঠামোতে যে সব পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা স্থানীয় সরকার কাঠামোকে লালন করে তার উত্তরোত্তর বিকাশমানতার মাধ্যমে সাধিত হয়েছে।

(খ) ভারত আজকে বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে নিজেকে বিকশিত করার সাথে সাথে গণতান্ত্রিক প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ গঠনের বা লালনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ও জোরালো ভূমিকা রেখেছে। অথচ বাংলাদেশে গণতন্ত্রের বিকাশ যেখানে প্রায়শঃই হুমকীর সম্মুখীন থেকেছে সেখানে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের বিকাশ কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় হতে না পারাটাই স্বাভাবিক।

(গ) বাংলাদেশ যে ভূখন্ড নিয়ে গঠিত তা বার বার সামরিক শাসনের অধীন থেকেছে। ফলে বিশ্বের আরও যে সব দেশ সামরিক শাসনের অধীনে ছিল, সে সব দেশের মতো বাংলাদেশেও নতুন নতুন ধরনের স্থানীয় সরকার কাঠামো গঠনের প্রয়াস নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলি যেন পরীক্ষার বিষয়ে পরিণত হয়েছে। অপরদিকে ভারতের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ একটা সুনির্দিষ্ট ধারাবাহিকতা নিয়ে বিকশিত হয়েছে।

উভয় দেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় সাদৃশ্য

উপরের পার্থক্যগুলি থাকা সত্ত্বেও ভারত ও বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় বেশ কিছু কিছু মিল বা সাদৃশ্য বিদ্যমান;

ক) ভারত এবং বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা উন্নত গণতান্ত্রিক দেশগুলির মতো স্বয়ং সম্পূর্ণ সাবলীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিকশিত হতে পারেনি বা হয়নি।

(খ) এ দু'টি দেশের স্থানীয় সরকারসমূহের আর্থিক ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

(গ) এ দু'টি দেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলিতে যে সব প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন তারা দলনিরপেক্ষ প্রার্থী হয়ে থাকেন। অর্থাৎ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলিতে যারা জনপ্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেন তারা দল-নিরপেক্ষ ব্যক্তি হয়ে থাকেন।

(ঘ) এ দু'টি দেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ মূলত সমাজের উচ্চতর শ্রেণী থেকে আসেন।

(ঙ) ভারত ও বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষমতা কাঠামোতে খুব কম সংখ্যক মহিলার প্রতিনিধিত্ব প্রতিফলিত হয়েছে।

(চ) উভয় দেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের শিক্ষাগত যোগ্যতার স্তর মাধ্যমিক পর্যায়ের উর্ধ্বে উঠে খুব কম ক্ষেত্রেই।

(ছ) উভয় দেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলিতে সরকারী নিয়ন্ত্রণ আজও জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

(জ) ভারত এবং বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলি স্থানীয়ভাবে সম্পদ সমাবেশকরণের ক্ষেত্রে তেমন কোন ভূমিকা পালন করতে পারছেনা।

(ঝ) এ দু'টি দেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলি স্বশাসিত ও স্বয়ংক্রিয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিকশিত হতে পারেনি কাঙ্ক্ষিত মাত্রায়।

উপসংহার

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ভারতের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ খুব একটা শক্তিশালী অবস্থানে যেতে পারেনি। যদিও বলা হয় যে, শক্তিশালী স্থানীয় সরকারের বিকাশ এবং স্বশাসিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের বিকাশ গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশের অন্যতম অপরিহার্য শর্ত, তবুও ভারতের মতো গণতান্ত্রিক দেশে যেখানে অব্যাহতভাবে গণতন্ত্রের চর্চা চলে এসেছে সেখানে শক্তিশালীভাবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় বিকাশ না ঘটা সত্যিই দুঃখজনক। বৃটিশ আমলে ভারতে যে ধরনের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বিকাশ ঘটেছিল, স্বাধীনতা পরবর্তীকালে মোটামুটিভাবে সেভাবেই স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বিকাশ ঘটেছে। স্বাধীন ভারত ভূমির স্বপ্নদ্রষ্টা এবং অন্যতম দার্শনিক মহাত্মা-গান্ধীর দর্শনের অনুসরণে গ্রামীণ স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানাদির বিকাশের জন্য পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল। এজন্য প্রয়োজনীয় কমিশনও গঠিত হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবিক অর্থে ভারতে স্বশাসিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বিকশিত হয়নি সেরূপভাবে। ভারতের সংবিধানে স্থানীয় সরকারের যথাযথভাবে বা স্বশাসিতভাবে বিকাশের জন্য তেমন কোন কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। আশ্চর্জনক হলেও সত্য যে, ভারতে কেন্দ্রীয়ভাবে স্থানীয় সরকার বিকাশের জন্য

সংবিধানের তেমন কোন উদ্যোগ পরিলক্ষিত না হওয়ায় বিশালকায় ভারতের এক প্রদেশে যেভাবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বিকাশ ঘটেছে, অন্য প্রদেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের বিকাশ ঘটেছে ভিন্ন প্রক্রিয়ায়। সর্বভারতীয়ভাবে বিবেচনায় দেখা যায় যে, ভারতের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের বিকাশ সনাতনী পদ্ধতির আদলেই সম্পন্ন হয়েছে। দু'একটি প্রদেশে যদিও আধুনিক পদ্ধতি অনুসরণ করে অর্থাৎ স্বশাসিত ও আর্থিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বিকাশ ঘটানোর প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে, তবুও ভারতের সবক'টি প্রদেশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বিকাশ কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় ঘটেনি। তবে আশা করা যায় যে, 'গ্লোবালাইজেশন' এর পরিপ্রেক্ষিত চিন্তা করে ভারতেও বিশ্বের অন্যান্য উন্নত দেশের অনুকরণে শক্তিশালী, স্বশাসিত এবং আর্থিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা বিকশিত হবে।

গ্রন্থপঞ্জি

1. Majumdar, R. C. (1960). *The History & Culture of Indian People*, Vol. 11, Bombay.
2. Bhatnagar, S. (1978). *Rural Local Government in India*. Light & Life Publishers, New Delhi.
3. Jain, S. C. (1967). *Community Development and Panchayeti Raj in India*, Bombay.
4. Khanna, R. L. (1977). *Panchayeti Raj in India*, English Book Depot, Ambala.
5. Maheshwar, S, R. (1987). *Local Government in India*, Lakshmi Narain Agarwal, Agra.
6. Siddiqui, Kamal (1992). *Local Government In South Asia*, UPL, Dhaka.
7. Malviya, H. D. (1956). *Village Panchayet in India*, All India Congress Committee, New Delhi.
8. Narain, J. P. (1970). *Communitarian Society and Panchayeti Raj*, Navachetana, Varanase.
9. Nahru, J. L. (1945). *Glimpses of World History*, Lindsay Drummond Ltd. London.
10. Ahmed A, U. (1989). *Revitalizing Panchayeti Raj in India*, Journal of Local Government, NILG, Voll 18, No. 1, Jan-June.

11. Bhattacharya, M. (1970). *Essays in Urban Government*. Calcutta, The World Press Private Ltd..

12. Chaturvedi, T. N. and R. B Jain (eds.) (1981). *Panchayeti Raj*. IIPA, New Delhi.

13. Chaturavedi, T. N. and Datta, Abbifit (1984). *Local Government. IIPA*. New Delhi.

14. Jangain, R. T. and Sharman, BAV. (1972). *Leadership in Urban Government*. Sterling Publisher, New Delhi.

15. Kopardekar, HD and Sastry SMY. (1990). *The Role of Local Government Development in India*. Quarterly Journal Vol LXI, No.2, A IILSG, Bombay.

16. Maheshwari, S. R. (1987). *Local Government in India*. Laxmi Narayan Agarwal, Agra (Fourth edition).

17. Sachdeve, L. And Dua, N. (1986). *Local self-Government in India*. Ajanta Publishers, New Delhi.

বাংলাদেশের মহিলা ও শিশুদের উপর বন্যার আর্থ-সামাজিক প্রতিক্রিয়া

আ, ক, ম, মাহবুবুজ্জামান *

ভূমিকা

বাংলাদেশ প্রধানত একটি দুর্যোগপূর্ণ দেশ। প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহ, যেমন ঃ বন্যা, নদীভাঙ্গন, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়, খরা, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, কালবৈশাখী, পানিতে আর্সেনিকের প্রভাব প্রভৃতি প্রতি বছরই এই দেশটিকে আক্রান্ত করে। মানব-সৃষ্ট দুর্যোগসমূহও এদেশে কম ক্ষতিকারক নয়। যেমন ঃ পরিবেশদূষণ, বন-উজাড় তথা বৃক্ষ-নিধন, পয়ঃনিষ্কাশনে বাধা সৃষ্টি, পানি দুষিতকরণ, অপরিকল্পিত বাঁধ নির্মাণপূর্বক জলাবদ্ধতা সৃষ্টি, যানবাহন দুর্ঘটনা প্রভৃতি মানব-সৃষ্ট দুর্যোগ এদেশে অকালে কেড়ে নিচ্ছে বহু অমূল্য প্রাণ অথবা সৃষ্টি করছে নানা প্রকার মারণ-ব্যাধি।

এ সমস্ত প্রাকৃতিক ও মানব-সৃষ্ট দুর্যোগের মধ্যে বন্যা নামক দুর্যোগটি এদেশে প্রতি বছরই প্রায় আঘাত হেনে চলেছে। এ বিষয়ে Alam (1990) বলেন যে, "...বার্ষিক বন্যা আক্রান্ত এলাকা সাধারণত ২৫ হাজার থেকে ৪০ হাজার বর্গকিলোমিটারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। তবে বন্যা বিপন্ন এলাকা এর চেয়েও বেশী, বিশেষজ্ঞবৃন্দ বাংলাদেশের ১,৪২,৭৭৭ বর্গ কিলোমিটারের মধ্যে ৮২,০০৮ বর্গকিলোমিটার (৫৮%) এলাকাকে বন্যা বিপন্ন বলে গণ্য করে থাকেন। অপর এক হিসাব অনুসারে বলা হয় যে, উর্ধ্ব অঞ্চলের আকস্মাৎ নেমে আসা ঢলে বাংলাদেশের প্রায় ৮০% এলাকা প্লাবিত হয়ে যেতে পারে। ১৯৫৪ সাল থেকে বিগত ৩৫ বছরে ২৮ বার এদেশে বন্যা সংঘটিত হয়েছে, যার মধ্যে ১১ বার মারাত্মক বন্যা এবং ৫ বার সর্বাধিক মারাত্মক বন্যা অন্তর্ভুক্ত ছিল।"

বাংলাদেশে ২৩০টি প্রধান ও অপ্রধান নদ-নদী প্রায় ১৫,০০০ মাইল বিস্তৃত হয়ে দেশের অভ্যন্তর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে (Islam, A. T. M.1985)। এর মধ্যে গঙ্গা-পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র -যমুনা ও সুরমা-মেঘনাকে প্রধান নদ-নদী হিসেবে গণ্য করা হয়। "১৯৮৮ সালের বন্যা স্মরণকালের মধ্যে ভয়াবহতম

* উর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

আকার ধারণ করেছিল। এই বন্যায় দেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ৫৩টি এবং ৪৬০টি থানার মধ্যে ৩২২টি কবলিত হয়েছিল"(Siddique, 1989)। দেশের প্রায় ৮২,০০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা প্লাবিত ও নিমজ্জিত হয়েছিল এবং ধরা হয়েছে যে, ৫০-১০০ বছর পরে এরূপ বন্যা সংঘটিত হয়েছে (বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ১৯৮৮)। ৩,০০০ কিলোমিটার রাস্তা, ১৮০টি ব্রীজ ও কালভার্ট এবং ৬৪০ কিলোমিটার রেল লাইন হয় ভেসে গেছে, নয়তো আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়া ২,৭০০ স্কুল-মাদ্রাসা সম্পূর্ণরূপে ভেসে গেছে। বন্যা পরবর্তী পুনর্নির্মাণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচিতে তাৎক্ষণিক প্রয়োজন ১৩,৪১৬ মিলিয়ন টাকা এবং দীর্ঘ মেয়াদী প্রয়োজন ২২,৫২০ মিলিয়ন টাকা। সর্বমোট ৩৫,৯২৬ মিলিয়ন টাকা ব্যয়ের প্রয়োজন হিসাব করা হয় (টাস্ক ফোর্স, ১৯৮৮)।

বাংলাদেশের বন্যা এবং বিপন্ন জনগোষ্ঠী

বাংলাদেশের প্রধান ৩টি নদীর তীরবর্তী জেলাসমূহ প্রায় প্রতি বছরই বন্যা কবলিত হয়। নদী তীরবর্তী এলাকার বাসিন্দাদেরকে বন্যাকালে আপন বাসগৃহ ছেড়ে পার্শ্ববর্তী উঁচু এলাকা, গ্রাম, বাঁধ, স্কুল-কলেজ বা সরকারী দপ্তরসমূহের প্রাঙ্গণে অস্থায়ীভাবে আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। সাধারণত এরূপ আশ্রয় গ্রহণের মেয়াদ ১ মাস স্থায়ী হয়। কোন কোন বছর তা ২ থেকে ৩ মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এ সময়ে তাঁরা তাঁদের অস্থাবর সম্পদের কিছু অংশ সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন। প্রায় খোলা আকাশের নিচে অথবা স্কুল-কলেজ বা সরকারী দপ্তরের এককেটি ঘরে বহু পরিবার একত্রে ঠাসাঠাসি করে মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য হন। প্রায় একই সময়ে বর্ষার কারণে আশ্রয় গ্রহণকারীদের জীবন-যাপন আরও কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। খাদ্য প্রস্তুত ও পানীয় জল সংগ্রহ তখন তীব্র সমস্যার রূপ ধারণ করে।

এ সময়ে বন্যা কবলিত আশ্রয় গ্রহণকারীদের কাজের ও রোজগারের সমস্যাও প্রকট হয়ে ওঠে। দরিদ্র পরিবারের প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ সদস্যগণ কাজের খোঁজে দূর-দূরান্তে গমন করেন। কখনও বা তাঁরা শহর অভিমুখে অনির্দিষ্ট গন্তব্যে ভাগ্যান্বেষণে ছুটে যান। আশ্রয়স্থলে অবস্থান করেন প্রধানত মহিলা ও শিশুগণ। বয়স্ক মহিলাগণ আশ্রয়স্থলের আশে পাশের বিত্তবান পরিবারে বিভিন্ন কাজ গ্রহণ করেন অথবা ধান ভানা, মুড়ি-চিঁড়া ভাজা, কাঁথা সেলাই, মাদুর বোনা ইত্যাদি কাজ গ্রহণ করেন। অবিবাহিতা ও যুবতী মহিলাদের পক্ষে আশ্রয়স্থলের বাইরে সহসা গমন সম্ভব হয়না বলে তাঁদের বলতে গেলে কোন পেশা বা উপার্জনই থাকেনা।

দরিদ্র পুরুষ সদস্যগণ কাজের অন্বেষণে দূরবর্তী স্থানে বা কোন শহরাঞ্চলে গমন করলে তাঁর পরিবারের মহিলা ও শিশুদের জীবনযাপন প্রক্রিয়া তথা আহার জোটানোর সমস্যা তীব্র হয়। অনেক সময় দূরগামী পুরুষ সদস্যগণের বহুদিন পর্যন্ত কোন খোঁজ পাওয়া যায়না অথবা তাঁরা আর ফিরেই আসেন না। এদিকে তাঁর পরিবারের মহিলা ও শিশুগণ বন্যা পরবর্তীকালে আপন বাস্তুভিটায় ফিরে গিয়ে পুনরায় ঘর নির্মাণসহ জীবন

যাপনের বন্দোবস্ত করতে অপারগ ও পরমুখাপেক্ষী হয়ে পড়েন। বন্যার ফলে যদি তাদের আপন গ্রামটি বিলীন হয়ে যায়, তাহলে সত্যিকার অর্থেই মহিলা ও শিশুগণ চিরতরে আশ্রয়হীন হয়ে যান। উভয় অবস্থাতেই মহিলা ও শিশুদেরকে 'বিপন্ন শ্রেণী' বা Vulnerable Group হিসেবে গণ্য করা যায়।

সাধারণ অবস্থায় এদেশের মহিলাদেরকে প্রধান দু'টি দায়িত্ব পালন করতে হয়। (১) পরিবারের রান্না ও খাবারের সার্বিক আয়োজন; এবং (২) সন্তান লালন-পালন। বন্যার ফলে বিপন্ন মহিলাদেরকে আরেকটি নতুন দায়িত্বের সম্মুখীন হতে হয়, তা হলো; পরিবারের শিশু সন্তানসহ অবিবাহিতা মেয়েদের জন্য আয়-রোজগার করা। এই নতুন দায়িত্বটি পালনের ক্ষেত্র বাংলাদেশে মোটেও সুগম নয়। কারণ, এদেশে মহিলাদের রোজগারের ক্ষেত্রে ৪টি প্রধান সমস্যা বিদ্যমান। সেগুলো হলো ঃ

(১) সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণে মহিলাদের গ্রহণযোগ্য পেশার পরিধি অত্যন্ত সীমিত।

(২) আত্ম-কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে মূলত পুঁজি, প্রশিক্ষণ ও বাজারজাতকরণের অভাব।

(৩) সর্বক্ষেত্রে অত্যন্ত স্বল্প মজুরী

(৪) কর্মক্ষেত্রে পুরুষ কর্তৃক অবমাননার আশঙ্কা।

এগুলোর বাইরে মহিলাদের রোজগারের ক্ষেত্রে আরও কিছু সমস্যা বিদ্যমান। যেমন ঃ দৈনিক মজুরী ভিত্তিক কর্মের ক্ষেত্রে প্রসূতিকালীন কোন ছুটি বা মজুরী নেই, দুগ্ধপোষ্য শিশুকে ঘরে রেখে কর্মে যাওয়া সম্ভব নয়, আবার বার বার ঘরে ফিরে এসে সন্তানকে দুগ্ধদানের ছুটিও মালিক পক্ষ দিতে চায়না, সঙ্গে এরূপ সন্তান নিয়ে কর্মক্ষেত্রে যাওয়াও অনেক মালিক সমর্থন করেনা, কর্মক্ষেত্রে শৌচাগারের অভাব, কর্মক্ষেত্রে যাতায়াতকালীন ছিনতাই, রাহাজানী, ধর্ষণের ভয় প্রভৃতি সমস্যাও মহিলাদের কর্মক্ষেত্রে সর্বদা বিরাজমান।

তবু সন্তান লালন-পালনের দায়িত্ব এদেশে প্রধানত মহিলাদের উপর বর্তায় এবং দুর্যোগকালে মহিলাদের এটি অপরিহার্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়, যা পুরুষের উপর বর্তায়না। অথচ, দুর্যোগকালে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচির তালিকায় তাঁদের নাম থাকেনা, থাকলেও তা তালিকার সর্ব নিম্নে এবং প্রায়শ বিফল হয়ে শূন্য হাতে ফিরে আসতে হয়। বন্যা পরবর্তীকালে প্রায় অবশ্যম্ভাবীরূপে দেখা দেয় মহামারী, ডায়রিয়া প্রভৃতি অসুখ। এক্ষেত্রেও অসহায় শ্রেণী মহিলা ও শিশুগণ। বন্যাজনিত কারণে প্রতিবছর প্রধান প্রধান নদী তীরবর্তী এলাকায় মহিলা ও শিশুদের এরূপ চিত্র ক্রমাগতভাবে সংঘটিত হয়। এরূপ অবস্থায়ও তাঁদেরকে বাঁচার সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়। আপন বাস্তুভিটায় এরা পরবাসী হয়ে জীবন কাটান। পুরুষ-প্রধান নিম্নবিত্ত

পরিবার এবং বিত্তবান (মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত) মহিলা-প্রধান পরিবারের মহিলা ও শিশুগণও নিরাপত্তাহীনতা, সহায়ক কাজের লোকের অভাব, চিত্ত বিনোদনের অভাব, যোগাযোগ ও চিকিৎসা সুযোগের অভাবে নিপতিত হন।

গবেষণার উদ্দেশ্যাবলী

গ্রামীণ বাংলাদেশে বিশেষ করে মহিলা ও শিশুদের বন্যাজনিত বিপন্নতা একটি আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে এই গবেষণা কার্যক্রমের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য স্থির করা হয়েছে। এর আলোকে বর্তমান গবেষণাটি নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যাবলী সফল করার জন্য পরিচালিত হয়েছে ঃ

(১) প্রতি বছর বন্যায় আক্রান্ত এলাকার মহিলা ও শিশুদের আক্রান্ত হওয়ার মাত্রা ও প্রকৃত পরিস্থিতি নির্ধারণ;

(২) বন্যাক্রান্ত হওয়ার পরে মহিলা ও শিশুদের বিপন্নতার (Vulnerability) স্বরূপ ও প্রকৃতি নির্ধারণ;

(৩) মহিলা ও শিশুগণ কর্তৃক বন্যাকালে ও বন্যা পরবর্তী পর্যায়ে জীবন যাপনের উপায় গ্রহণ ও অবস্থার সঙ্গে মোকাবিলা করার পদ্ধতি বিশ্লেষণ; এবং

(৪) বন্যাকালীন ও পরবর্তী সময়ে সংশ্লিষ্ট সরকারী ও বেসরকারী দপ্তরসমূহের করণীয় ও পালনীয় কার্যক্রম এবং স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণপূর্বক ক্ষয়-ক্ষতি হ্রাসের ক্ষেত্রে পন্থা নির্ধারণ।

গবেষণা পরিধি

এলাকাগত পরিধি হিসেবে প্রতিবছর বন্যাক্রান্ত সিরাজগঞ্জ ও রাজবাড়ী সদর থানার যথাক্রমে খোকসাবাড়ী ও মিজানপুর নামক ইউনিয়নদ্বয়ের মধ্যে গবেষণা কর্ম পরিচালিত হয়েছে।

বিষয়বস্তুগত দিক থেকে সমীক্ষাটির পরিধি নিম্নরূপ ঃ

- বন্যাক্রান্ত এলাকার বন্যা প্রবণতা, বন্যার কারণ ও স্থায়িত্ব এবং বন্যার ফলে এলাকার ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ
- বন্যা-পূর্বকালীন গৃহীত সরকারী, বেসরকারী ও ব্যক্তিগত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা, বন্যার ক্ষয়-ক্ষতিরোধে গৃহীত সরকারী বেসরকারী ব্যবস্থা, বন্যকালীন ত্রাণ-তৎপরতা ও বন্যা-উত্তর পুনর্বাসন কর্মসূচি

- বাঁধের বাইরে ও ভিতরে বিভিন্ন বিত্তশ্রেণীর মহিলাদের বন্যাকালীন প্রতিক্রিয়া
- বন্যাক্রান্ত এলাকার জনগণের জনতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, বন্যাকালে আশ্রয়গহণ, খাদ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থা, প্রাপ্ত ত্রাণসামগ্রী, পেশা, আয় ও রোজগার, বন্যায় বসতবাটীসহ স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের ক্ষয়-ক্ষতি
- বন্যাকালে পুরুষ ও মহিলা প্রধান পরিবারের মহিলাদের সন্তান লালন-পালন, রান্না-বান্না ও সংসার পরিচালনার সমস্যাদি
- শিশুদের শিক্ষা কার্যক্রম, চিত্তবিনোদন, শিশুশ্রম, চিকিৎসা ব্যবস্থা, টীকা/ইনজেকশান গ্রহণ
- বন্যা ও বন্যা-উত্তরকালে মহিলাদের গৃহীত ঋণের উৎস ও সুদের হার,বন্যার কারণে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ বিক্রয়
- মহিলাদের অনুভূত সমস্যাদি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা (পুরুষ-প্রধান ও মহিলা-প্রধান পরিবার)
- মহিলা-প্রধান পরিবারের কর্ত্রীদের জীবনালেখ্য এবং মহিলা ও শিশুদের জীবন যাপনে বন্যার ফলে সৃষ্ট আর্থ-সামাজিক প্রতিক্রিয়া

গবেষণা পদ্ধতি

বাংলাদেশের দু'টি প্রধান নদী যমুনা ও গঙ্গার তীরবর্তী দু'টি জেলা, যথাক্রমে সিরাজগঞ্জ ও রাজবাড়ী বন্যাপ্রবণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের হিসেব অনুযায়ী প্রতি বছর জেলা দু'টির ২৫-৪০ ভাগ এলাকা বন্যাক্রান্ত হয়ে থাকে এবং ১৯৮৭ ও ৮৮ সালে শতকরা ৭৫ ভাগেরও বেশী এলাকা বন্যাক্রান্ত হয়েছিল। বন্যাক্রান্ততার প্রবণতা বিবেচনা করে এ দু'টি জেলার সদর থানার নদী তীরবর্তী দু'টি ইউনিয়ন, যথাক্রমে খোকসাবাড়ী ও মিজানপুরকে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের ভিত্তিতে নমুনা এলাকা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। সংযুক্ত মানচিত্রে নমুনা এলাকা চিহ্নিত করা হলো।

নমুনা এলাকায় গবেষণা পরিচালনার লক্ষ্যে ম্যাপ অনুসরণ, পর্যবেক্ষণ, দাপ্তরিক নথিপত্র পর্যালোচনা, সাক্ষাৎকার ও কেইস স্টাডি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। উভয় নমুনা এলাকা থেকে পূর্ব-পরীক্ষীত প্রশ্নপত্রের সাহায্যে ২০০ পরিবার প্রধানের সাক্ষাৎকার গ্রহণ, পূর্ব-পরীক্ষীত গাইড লাইনের সাহায্যে ১০ জন মহিলা-প্রধান পরিবারের কর্ত্রীর জীবনালেখ্য গ্রহণ এবং চেকলিষ্টের মাধ্যমে স্থানীয় জন প্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট সরকারী ও বেসরকারী দপ্তরসমূহের কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার ও প্রদত্ত

তথ্যাদি গ্রহণ করা হয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে বন্যা ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং থানা পর্যায়ে মহিলাবিষয়ক দপ্তর, পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, সমাজ সেবা দপ্তর, যুব উন্নয়ন দপ্তর, থানা নির্বাহী কর্মকর্তার দপ্তর এবং বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান-সমূহের দপ্তর থেকে তথ্যাদি আহরণ করা হয়েছে।

উভয় নমুনা ইউনিয়নের মধ্যে মাটি দ্বারা নির্মিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ অবস্থিত। বাঁধের বাইরে বন্যার প্রকোপ অধিকতর এবং প্রতি বছরই আক্রান্ত হয় বলে নমুনা গ্রহণে শতকরা ৬০ ভাগ এবং বাঁধের ভিতরের অংশে শতকরা ৪০ ভাগ ধার্য করা হয়েছে। শিশু হিসেবে অনূর্ধ্ব ১৪ বছর বয়স্ক শিশুদেরকে গবেষণার আওতায় আনা হয়েছে। ১৯৯৭ সালের জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে মাঠ পর্যায় থেকে তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে।

সমীক্ষা এলাকার বৈশিষ্ট্য

বর্তমান সমীক্ষার জন্য বাংলাদেশের দু'টি প্রধান নদী যমুনা ও গঙ্গার কূলবর্তী সিরাজগঞ্জ জেলার সদর থানার খোকসাবাড়ী ইউনিয়ন এবং রাজবাড়ী জেলার সদর থানার মিজানপুর ইউনিয়নকে নমুনা এলাকা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। নমুনা ইউনিয়দ্বয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এখানে বর্ণনা করা হলো।

সিরাজগঞ্জ জেলার খোকসাবাড়ী ইউনিয়ন

এই ইউনিয়নটি সিরাজগঞ্জ সদরের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে ৩ কিলোমিটার দূর থেকে আরম্ভ হয়ে ৯ কিলোমিটার দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। এর উত্তরে সদর থানার ছনগাছা ইউনিয়ন, পূর্বে যমুনা নদী, দক্ষিণে সিরাজগঞ্জ পৌরসভা এবং পশ্চিমে বাহুলি ইউনিয়ন অবস্থিত। খোকসাবাড়ী ইউনিয়নের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্ত দিয়ে ইছামতি নামক মরা নদী ইউনিয়নটিতে প্রবেশ করেছে এবং ক্রমাগত উত্তরমুখী ভাবে প্রবাহিত হয়ে শৈলাবাড়ী গ্রামের নিকট বি,আ,ই বাঁধে সমাপ্ত হয়েছে। অনেকে একে চন্দ্রকোণা নদী বলে অভিহিত করেন। এটি যমুনার একটি উপনদী। এর একটি শাখা ছালামতি খাল নামে পরিচিত। যমুনার একটি ক্ষুদ্র শাখা 'দইভাঙ্গা' নদী নামে ছনগাছা ইউনিয়নের মধ্য দিয়ে খোকসাবাড়ীতে প্রবেশ করেছে। আর ৩টি মরা খাল ইউনিয়নটিতে বয়ে গেছে। সেগুলোর নাম বালিয়াজান, তেলকুপী ও কাটাখালী।

বাংলাদেশের বন্যার প্রকারভেদ মানচিত্রে সমীক্ষা এলাকা নির্দেশ

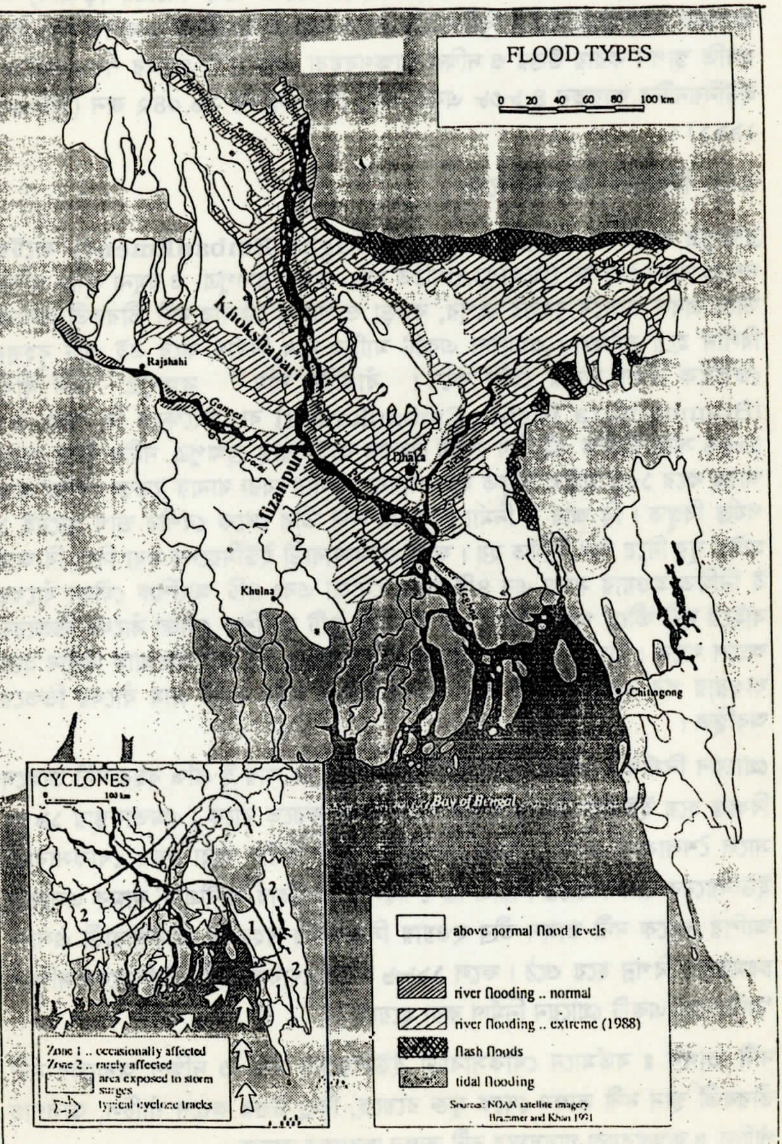

ইউনিয়নটিতে মোট ১৭টি মৌজা রয়েছে। ছোট বড় মিলে মোট ২৭টি গ্রাম বর্তমানে অবস্থিত। ইউনিয়নটিতে উত্তর-পূর্ব প্রান্তে 'বেলতা' নামক একটি গ্রাম ছিল, যা যমুনার ভাঙ্গনে ১৯৬৮ সালে নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। তাছাড়া 'ব্রাহ্মণবয়রা' নামক উত্তর পূর্বাংশের একটি বিশাল গ্রাম (ইউনিয়নের মধ্যে সবচেয়ে বড় গ্রাম) নদী ভাঙ্গনের ফলে প্রায় অর্ধেক বিলীন হয়ে গেছে এবং অধিবাসীগণ ক্রমাগত সরে গিয়ে বসতি স্থাপন করায় উত্তর ও দক্ষিণ ব্রাহ্মণবয়রা নামে দু'টি গ্রামের পত্তন ঘটেছে। ইউনিয়নটির আয়তন ৪,৮৩৮ একর এবং লোক সংখ্যা ২৬,০৪২ জন (বিবিএস, ১৯৯১)।

বন্যা নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো

ব্রহ্মপুত্র ডান বাঁধ **(Bramhaputra Right Embankment)**: ষাটের দশকে যখন ওয়াপদা (WAPDA)গঠিত হয়, তখন ব্রহ্মপুত্র ও যমুনা নদীর পশ্চিম তীরে প্রবল ভাঙ্গনে বৃহত্তর রংপুর, বগুড়া ও পাবনা জেলার নদী তীরবর্তী এলাকা বিলীন হয়ে যাচ্ছিল। ওয়াপদা একটি মাটির বাঁধ নির্মাণ করে এই ৩টি বৃহত্তর জেলাকে রক্ষা করার চেষ্টা করে। বাঁধটির নাম ' ব্রহ্মপুত্র ডান বাঁধ' (Bramhaputra Right Embankment) বা সংক্ষেপে বি, আর, ই। ১৯৬৬ সালে নির্মিত এই বাঁধ রংপুর জেলার কাউনিয়াস্থ ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে থেকে আরম্ভ করে ১৩৫ মাইল বিস্তৃত হয়ে পাবনা জেলার বেরা থানার 'ভেড়া খোলা' গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত। বি আর ই নির্মাণের সময় নদী তীর থেকে বেশীর ভাগ স্থানেই ১ মাইল দূর দিয়ে বাঁধ নির্মিত হয়। ফলে খোকসাবাড়ী ইউনিয়নের মধ্য দিয়ে বি আর ই নির্মিত হওয়ার সময় এর ৪টি সমগ্র মৌজা এবং ৪টি আংশিক মৌজা বাঁধের বাইরে নদী তীরে পড়ে। বাকী ৯টি সমগ্র ও ৪টি আংশিক মৌজা বাঁধের ভিতরের অংশে থাকে। বাঁধের বাইরের অংশের ১টি সমগ্র ও ১টি আংশিক গ্রাম বিলীন হয়ে যাওয়ার পর বর্তমানে ৭টি গ্রাম বাঁধের বাইরে এবং ২০টি গ্রাম বাঁধের ভিতরে অবস্থিত।

গ্রোয়েন নির্মাণ ঃ খোকসাবাড়ী ইউনিয়ন সংলগ্ন বি আর ই প্রতি বছর নদী ভাঙ্গনে বিধ্বস্ত হয়ে ইউনিয়নটির মারাত্মক ক্ষতি সাধন করতে থাকে। এমতাবস্থায় ১৯৭৯ সালে শৈলাবাড়ী গ্রামের কাছে একটি গ্রোয়েন নির্মাণ করা হয়। খোকসাবাড়ী ইউনিয়নের দক্ষিণ প্রান্তে সিরাজগঞ্জ পৌরসভা এলাকার 'রানীগ্রাম' নামক এলাকায় আশির দশকে নদী ভাঙ্গন তীব্র হওয়ায় সিরাজগঞ্জ শহর ও খোকসাবাড়ী এলাকা চরমভাবে বিপন্ন হয়ে ওঠে। ফলে ১৯৮৬ সালে খোকসাবাড়ী ইউনিয়নের দক্ষিণে 'রানীগ্রামে' একটি গ্রোয়েন নির্মাণ করা হয়েছে।

নদী ভাঙ্গন ঃ বর্তমানে খোকসাবাড়ী ইউনিয়নের মধ্য ও দক্ষিণ অঞ্চলের নদী তীরবর্তী স্থান নদী ভাঙ্গন থেকে মুক্ত রয়েছে, কিন্তু উত্তর অংশে পাঁচিল, তালগাছ পাঁচিল ও ব্রাহ্মণবয়রা গ্রামসমূহে নদী ভাঙ্গন অব্যাহত রয়েছে।

খোকসাবাড়ী ইউনিয়নের অন্যান্য তথ্যাদি

খোকসাবাড়ী ইউনিয়নে মোট ১৩টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ১৫টি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র রয়েছে। ইউনিয়নে ৪টি উচ্চ বিদ্যালয়, ৬টি মাদ্রাসা (৩টি ইবতেদায়ী, ২টি দাখিল, ১টি আলিম) এবং ৪২টি মসজিদ রয়েছে। জনসংখ্যার ৯৬ শতাংশ মুসলমান।

এনজিও কার্যক্রম ঃ খোকসাবাড়ী ইউনিয়নে ব্র্যাক, প্রশিকা, গ্রামীণ ব্যাংক ও দ্বীপসেতু নামে ৪টি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের শাখা কার্যরত রয়েছে। এর মধ্যে 'দ্বীপসেতু' নামক এনজিওটি আঞ্চলিক, বাকীগুলো জাতীয়ভিত্তিক এনজিও।

সরকারী প্রতিষ্ঠান ঃ জনগণের দারিদ্র বিমোচন ও ঋণ প্রদানের মাধ্যমে স্ব-নির্ভরতা অর্জনের ক্ষেত্রে সরকারের 'রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকে'র শাখা অফিস, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের শাখা অফিস এবং 'ভূমি-দরিদ্র কৃষক পরিবারের দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি' নামক একটি সরকারী প্রকল্প এই ইউনিয়নে কর্মরত আছে। শেষোক্ত প্রকল্পটি ১৯৯৪ সালে বাংলাদেশের মোট ২০টি ইউনিয়নে চালু করা হয়েছে। সিরাজগঞ্জ জেলায় কেবল খোকসাবাড়ী ইউনিয়নের পাঁচিল গ্রামে প্রকল্পটির ১টি শাখা কাজ করে যাচ্ছে।

শিক্ষার হার ঃ ১৯৯১ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী ইউনিয়নে শিক্ষার হার জাতীয় হারের (৩২.৪) চেয়ে কম, শতকরা ২৫.৭ ভাগ। এর মধ্যে পুরুষ শতকরা ৩১.৮ ভাগ এবং মহিলা শতকরা ১৯.৫ ভাগ। শিক্ষিতদের অধিকাংশেরই (শতকরা ৭৬ ভাগ) শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রাথমিক পর্যায়ের। ১৯৯১ সাল থেকে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু হওয়ায় শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে। নমুনা পরিবারসমূহের বর্তমান শিক্ষার হার ৬৯%।

পেশা ঃ এই ইউনিয়নের পুরুষদের অধিকাংশের প্রধান পেশা কৃষি। এছাড়া দিন মজুর, চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী ইত্যাদি পেশার লোকও রয়েছে। এই ইউনিয়নে কোন তাঁত নেই। পার্শ্ববর্তী ইউনিয়নে (বাগবাটী ও বাহুলী) তাঁতের কাজ চলে। এই ইউনিয়নের কিছু লোক পার্শ্ববর্তী ইউনিয়নে তাঁতের কাজ করেন। নদী তীরবর্তী এলাকা হলেও জেলের সংখ্যা অত্যন্ত কম। পুরুষদের অপ্রধান পেশার মধ্যে ব্যবসা, নৌকা চালানো, কৃষি, রিক্সা/ভ্যান চালানো, বন্যাকালে মাছ ধরা এবং দালালী (টাকার বিনিময়ে অন্য লোককে কোন কিছু ক্রয়ে বা কোন কাজ করতে সহায়তা করা) পেশা উল্লেখযোগ্য। মহিলাদের গৃহকর্মই প্রধান পেশা, কিছু শ্রমজীবী ও দিন মজুর রয়েছে। তাদের অপ্রধান পেশার মধ্যে শাক-সব্জী চাষ, হাঁস-মুরগী পালন, তাঁতের কাজ (মূলত সূতো কাটা ও রং করা) কাঁথা সেলাই এবং ক্ষুদ্র ব্যবসা উল্লেখযোগ্য।

মহিলাদের সমিতি কার্যক্রম ঃ এই ইউনিয়নে দরিদ্র মহিলাদের মধ্যে সমিতি গঠনপূর্বক সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা থেকে ঋণ গ্রহণ এবং আয় বর্ধনমূলক কাজে

অনেকেই নিয়োজিত। সরকারী সংস্থা পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের 'মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি' (এম, বি, এস, এস) ১৭টি রয়েছে, যার সদস্য সংখ্যা ৪২৫ জন। এরা সবাই গড়ে ৪,০০০ টাকা করে ঋণ গ্রহণ করেছেন (সূত্রঃ বিআরডিবি, সিরাজগঞ্জ সদর থানা শাখা দপ্তর)। গ্রামীণ ব্যাংকের মোট ৪০০টি সদস্য পরিবার এই ইউনিয়নে ঋণ গ্রহণ করেছেন। এদের মধ্যে শতকরা ৬০ ভাগ মহিলা (সূত্রঃ গ্রামীণ ব্যাংক, শাহানগাছা শাখা দপ্তর)। প্রশিকা নামক এনজিও'র ১০০টি গ্রুপ উক্ত ইউনিয়নে ঋণ সুবিধাসহ প্রশিক্ষণ ও সাহায্য পেয়ে থাকে। এর প্রতিটি গ্রুপেই সর্বোচ্চ ২৫ জন করে মহিলা সদস্য রয়েছেন (সূত্রঃ প্রশিকা, কাজীপুর রোড, সিরাজগঞ্জ শাখা দপ্তর)। ব্র্যাকের মোট ১৪টি সমিতিতে ৭০৫ জন সদস্য রয়েছেন এই ইউনিয়নে, এর মধ্যে ২৮৩ জন মহিলা সদস্য। এঁরা সকলেই আয়বর্ধক কাজের জন্য ঋণ পেয়ে থাকেন।

খোকসাবাড়ী ইউনিয়নে বন্যার তীব্রতা, ১৯৯২-১৯৯৬

বিগত ৫ বছরের বন্যার তীব্রতা সংক্রান্ত তথ্যে দেখা যায় যে, প্রতিবছরই ব্রহ্মপুত্র ডান বাঁধের বাইরের অংশ প্লাবিত হয়েছে এবং বন্যার পানি বাঁধে এসে আঘাত হেনেছে। বাঁধের বাইরের অংশের মধ্যে গ্রোয়েন এলাকায় সামান্য কিছু পরিবারের বাড়ীতে পানি ওঠেনি। বাকি সকল পরিবারের আঙ্গিনায় পানি ছিল। ১৯৯৫ ও ৯৬ সালে পূর্বের ৩ বছরের তুলনায় বন্যার মাত্রা তীব্র ছিল। ঘরের ভিতরে ১-২ ফুট পানি প্রবেশ করেছিল।

বাঁধের ভিতরের অংশে ২টি মরানদী ও ৪টি খাল থাকায় সে অংশেও বন্যা হয়েছে প্রতি বছর। কিন্তু বন্যার পানি বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করেনি। প্রায় ৫০ ভাগ রাস্তাঘাটে পানি উঠেছিল ১৯৯৫ ও ৯৬ সালে। ১৯৯৩, ৯৫ ও ৯৬ সালে বন্যা মে মাসের শেষ দিকে আঘাত হানার ফলে বোরো ধানসহ অন্যান্য ফসল প্রায় অর্ধেক বা তার বেশী নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। উল্লেখ্য যে, যমুনা নদীতে সাধারণত দু'বার বন্যা দেখা দেয়। প্রথমবার জুন মাসে, দ্বিতীয় বার জুলাই মাসের শেষে বা আগষ্ট মাসে।

রাজবাড়ী জেলার মিজানপুর ইউনিয়ন

রাজবাড়ী জেলার রাজবাড়ী সদর থানার মিজানপুর ইউনিয়নটি রাজবাড়ী পৌরসভার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে ২ কিলোমিটার দূর থেকে ১০ কিলোমিটার দূর পর্যন্ত পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত একটি বিরাট ইউনিয়ন। এই ইউনিয়নের উত্তর ও পশ্চিম প্রান্তে গঙ্গা নদী, পূর্ব প্রান্তে যমুনা নদী, দক্ষিণে রাজবাড়ী পৌরসভা এলাকা ও দাদশী ইউনিয়ন। এই ইউনিয়নের আয়তন ১২,৪১২ একর (তবে নদী ভাঙ্গনের ফলে বর্তমানে আয়তন ৯,৪৬৮ একর) এবং মৌজা সংখ্যা ৩৮টি। মোট গ্রামের সংখ্যা বর্তমানে ৩৬টি। ইউনিয়নটি পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় ১৪ কিলোমিটার লম্বা। ইউনিয়নের উত্তর পূর্ব প্রান্তে 'বেতকা' নামক গ্রামটি সম্পূর্ণভাবে গঙ্গা নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। এছাড়া 'মৌকুড়ি' এবং 'বহড়া কাঠুরিয়া' গ্রামের অর্ধাংশ নদী ভাঙ্গনে বিলীন হয়েছে। মিজানপুর ইউনিয়নের 'বেনীনগর' নামক উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত গ্রামটির

নিকট থেকে গঙ্গা নদীর একটি শাখা ইউনিয়নিটিতে প্রবেশ করে ইউনিয়নের মধ্যখান দিয়ে 'মরাপদ্মা' নামে প্রবাহিত হয়ে পূর্ব দিকে যমুনা নদীতে দৌলতদিয়া ঘাটের নিকট পতিত হয়েছে। বন্যাকালে গঙ্গা এবং মরাপদ্মা এই দুই নদীর প্লাবনে মিজানপুর ইউনিয়নের দুই-তৃতীয়াংশ প্লাবিত হয়ে থাকে।

১৯৯১ সালের আদমশুমারী অনুসারে ইউনিয়নের পরিবার সংখ্যা ৫,৭৮৬টি এবং লোকসংখ্যা ৩১,৫৭৮জন। কিন্তু ১৯৯৬ সালের কৃষি শুমারী অনুযায়ী পরিবার সংখ্যা ৬,৯১০টি এবং লোক সংখ্যা ৪০,১২৪জন।

বন্যা নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো

১৯৮৭ সালের বন্যার পর ডাচ ও সুইডিস সরকারের অর্থায়নে 'ফরিদপুর-বরিশাল প্রকল্প' নামে একটি গঙ্গা নদী তীরবর্তী মাটির বাঁধ প্রকল্প গ্রহণ করে কাজ আরম্ভ করা হয়। বাঁধটি 'ফরিদপুর-বরিশাল প্রকল্প' হিসেবে গ্রহণ করা হলেও এর কাজ আরম্ভ হয় কুষ্টিয়ার বিখ্যাত 'শিলাইদহ' থেকে এবং ফরিদপুর পর্যন্ত ৩৪ কিলোমিটার বাঁধের কাজ ১৯৯০ সালে শেষ হয়। এটি প্রথম পর্যায়ে মাদারীপুর পর্যন্ত যাওয়ার কথা। সেক্ষেত্রে ফরিদপুর থেকে আরও ৮৯ কিলোমিটার নির্মাণ করা হবে। শিলাইদহ থেকে গঙ্গা নদীর দক্ষিণ তীরে নির্মিত এই বাঁধ মিজানপুর ইউনিয়নে এসে গঙ্গা ও মরাপদ্মা এই দুই নদীকে উত্তরে রেখে গোয়ালন্দ অভিমুখে নির্মিত হয়েছে। ফলে গঙ্গা ও মরাপদ্মা নদীর বন্যা একযোগে এই বাঁধে আঘাত হানে প্রতিবছর এবং বাঁধের বাইরের এলাকা প্লাবিত হয়। বর্তমানে রাজবাড়ী থেকে গোয়ালন্দ পর্যন্ত বাঁধের উপরে পাকা রাস্তা নির্মিত হচ্ছে।

বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের বাইরে এই ইউনিয়নের ১৭টি পূর্ণ মৌজা এবং ৫টি আংশিক মৌজা এবং বাঁধের ভিতরে ১৬টি পূর্ণ মৌজা ও ৫টি আংশিক মৌজা অবস্থিত। তবে বাঁধ নির্মাণের পরে বাঁধের বাইরের সঙ্গতিপূর্ণ বহু পরিবার বাঁধের ভিতরের অংশে জমি কিনে বাড়ী তৈরি করায় বাঁধের বাইরের এলাকায় পরিবার সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। বাঁধের বাইরে শতকরা ৮০ ভাগ নিম্নবিত্ত, ১৭ ভাগ মধ্যবিত্ত এবং মাত্র ৩ ভাগ উচ্চবিত্ত সম্পন্ন পরিবার বর্তমানে অবস্থান করছে। উচ্চবিত্ত (৩%) দের অনেকেরই রাজবাড়ী শহরে বা বাঁধের ভিতরের অংশে আরেকটি করে বাড়ী রয়েছে। বন্যাকালে তারা সে সব বাড়ীতে ২/৩ মাসের জন্য বসবাস করে থাকে।

মিজানপুর ইউনিয়নের অন্যান্য তথ্যাদি

মিজানপুর ইউনিয়নে ৭টি সরকারী এবং ৫টি রেজিষ্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে বাঁধের বাইরের এলাকায় ২টি সরকারী ও ১টি রেজিষ্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় অবস্থিত। বাকীগুলো বাঁধের ভিতরের অংশে অবস্থিত। ২টি উচ্চ বিদ্যালয় ও ২টি মাদ্রাসা (১টি ইবতেদায়ী ও ১টি আলিম মাদ্রাসা) বাঁধের ভিতরের অংশে অবস্থিত।

মোট ২৪টি মসজিদ ও ২টি মন্দির রয়েছে ইউনিয়নটিতে। কোন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

এনজিও কার্যক্রম ঃ এই ইউনিয়নে এনজিও কার্যক্রম তেমন একটা জোরদার নয়। ব্র্যাক ও কারিতাস ছাড়া অন্য কোন সংগঠনের শাখা নেই এখানে। ব্র্যাক পুরুষ ও মহিলা মিলিয়ে মোট ১৪টি সমিতি গঠন করে তাঁদেরকে ঋণ প্রদান পূর্বক আয়-বর্ধনমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তবে বাঁধের বাইরের অংশে মাত্র ৩টি সমিতি রয়েছে। কারিতাস কোন প্রকার ঋণ বিতরণ করেনা। তবে প্রতি বছর বন্যায় ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে সাহায্য প্রদান করে থাকে। ১৯৯৫ সালে কারিতাস ৩০০টি দরিদ্র পরিবারের প্রত্যেক পরিবারকে ১০ কেজি চাল, ২ কেজি ডাল ও ১কেজি করে লবণ দান করেছিল। বন্যার পরে ১০০টি পরিবারকে ১টি করে ঘর তৈরি করে দিয়েছে। এর উপকরণ হলো ঃ ২ বান্ডিল টিন, ৪টি লোহার এ্যাঙ্গেল, ৬টি আরসিসি পিলার, ৩টি বাঁশের খুটি, মুলিবাঁশের বেড়া ৪টি এবং তৈরির জন্য ৪০০ করে টাকা।

সরকারী প্রতিষ্ঠান ঃ সমাজসেবা অধিদপ্তরের রাজবাড়ী থানা শাখা এ যাবত ৩৬০জনকে সুদমুক্ত ঋণ হিসেবে ১,৪৪,০০০ টাকা এবং ২৭০ জনকে সামাজিক বনায়নের জন্য ৫টি করে গাছের চারা দান করেছে। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের ১৯টি বিত্তহীন সমবায় সমিতি রয়েছে, যার সদস্য সংখ্যা ৩৭৫জন। এদের মধ্যে ফসলী কর্জ হিসেবে ৪,৬৯,৮০০ টাকা এবং মেয়াদী কর্জ হিসেবে ৪,৭২,৩২৯ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। বিআরডিবি'র কোন মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি (এম, বি, এস, এস) এই ইউনিয়নে এখনও গঠন করা হয়নি। থানা মহিলাবিষয়ক দপ্তর থেকে ৫১ জন দুঃস্থ মহিলাকে ১,১৪,০০০ টাকা ঋণ হিসেবে বিতরণ করা হয়েছে (সূত্রঃ থানা সমাজ সেবা, বিআরডিবি ও মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার দপ্তর, রাজবাড়ী সদর থানা, ১৯৯৭)।

শিক্ষার হার ঃ মিজানপুর ইউনিয়নে শিক্ষার হার অত্যন্ত কম। ১৯৯১ সালের আদম-শুমারী অনুযায়ী শিক্ষার হার শতকরা ২০.৮ ভাগ। এর মধ্যে মহিলা শিক্ষার হার শতকরা ১৪.৮ এবং পুরুষ শিক্ষার হার শতকরা ২৬.৮ ভাগ। বাঁধের বাইরের অংশের শিক্ষার হার অত্যন্ত কম, তবে তার সঠিক সংখ্যা কোথাও পাওয়া যায়নি। ১৯৯২ সালে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু হওয়ায় শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে। নমুনা পরিবারসমূহের শিক্ষার হার বর্তমানে ৫০%।

পেশা ঃ মিজানপুর ইউনিয়নের অধিকাংশ পুরুষের প্রধান পেশা কৃষি। তবে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোকের পেশা দিনমজুরী, ব্যবসা, মেকানিক্স, রিক্সা ও ভ্যান চালানো। পুরুষদের অপ্রধান পেশার মধ্যে মাছ ধরা, ব্যবসা, দিনমজুরী, মহাজনী ও মজুতদারী। বাঁধের বাইরের অংশের অধিকাংশ লোক দরিদ্র। বন্যাকালে দ্বিগুণ মূল্যে শস্যাদি বিক্রির জন্য সম্পদশালীরা মজুতদারী পেশায় নিয়োজিত থাকেন। মহিলাদের প্রধান পেশা গৃহকর্ম, দরিদ্র মহিলাদের প্রধান পেশা দিনমজুরী ও ঝি-গিরি। অপ্রধান

পেশার মধ্যে কৃষিকার্যে সহায়তা, হাঁস-মুরগী পালন, কাঁথা সেলাই, ধানভানা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

মহিলাদের সমিতি কার্যক্রম ঃ মিজানপুরে মহিলাদের সমিতি কার্যক্রম অত্যন্ত স্বল্প। শিক্ষার স্বল্প হার ছাড়াও ধর্মীয় কুসংস্কার এখানে বেশী। তাই এনজিও কার্যক্রমে সমিতি গঠন করে ঋণ গ্রহণপূর্বক আয় বর্ধনমূলক কাজে মহিলাদের মোটেও আগ্রহ নেই। তাঁরা মনে করেন, ঋণ গ্রহণ করলে তাঁদের ভিটে-মাটি নিলাম হয়ে যাবে। তাছাড়া, সমিতি করে সদর থেকে টাকা আনা-নেওয়া বা পুরুষদের সঙ্গে মেলামেশা ও যাতায়াতকে তাঁরা ধর্মীয়ভাবে খারাপ কাজ বলে মনে করেন। বাঁধের বাইরের অংশে কোন মহিলা সমিতির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি। আর একটি বিষয় এখানে উল্লেখ্য। বাঁধের বাইরের অংশে চর এলাকায় 'সর্বহারা' পার্টির আনাগোনা রয়েছে। সে কারণে কোন এনজিও এই এলাকায় সমিতি গঠন বা কার্যক্রম পরিচালনায় আগ্রহী হয়না।

মিজানপুর এলাকায় বন্যার তীব্রতা, ১৯৯২-৯৬

১৯৯২ ও ৯৩ সালের তুলনায় ১৯৯৬ সালে বন্যার মাত্রা কিছুটা বেশী ছিল। ১৯৯৪ ও ১৯৯৫ সালে বন্যার মাত্রা ছিল প্রবল। বাঁধের বাইরের অংশে প্রতিবছরই বন্যা হয়। রাস্তাঘাট সব তলিয়ে যায়। বাড়ীর উঠোনে পানি জমে, তবে বাড়ীর মধ্যে পানি সব স্থানে ওঠেনি। এর মধ্যে গঙ্গা নদীর পাড়ের এলাকায় বাড়ী ঘরে পানি ওঠে না, কিন্তু মরাপদ্মা নদীর দক্ষিণ পাড়ের এলাকায় প্রায় প্রতি বছরই বাড়ী ঘরে পানি ওঠে। বাঁধের বাইরের অংশের প্রায় সর্বত্রই অন্য বাড়ী যেতেও নৌকা বা ভেলা ব্যবহার করতে হয়। প্রতি বছরই গঙ্গা নদীর পাড়ে বন্যাকালে নদী ভাঙ্গন দেখা যায়। বিগত ৫ বছরে মিজানপুর এলাকার বাঁধের ভিতরের অংশে কোন বন্যা হয়নি। ১৯৯৫ সালে অতি বর্ষণজনিত কারণে কিছুটা জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছিল। রাস্তাঘাটে কয়েকদিন পানি জমে ছিল, আর কোন ক্ষয়-ক্ষতি হয়নি।

বন্যা ও বিপন্নতা

বন্যার ফলে সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি

নমুনা এলাকায় ১৯৯২-৯৩ সালে বন্যা তেমন একটা প্রকট ছিল না। ১৯৯৪ সালে মিজানপুরে এবং ১৯৯৫ সালে উভয় এলাকায় বন্যার তীব্রতা যথেষ্ট বেশী ছিল। ১৯৯৬ সালের বন্যার মাত্রা ১৯৯২-৯৩ সালের তুলনায় উভয় এলাকায় বেশী ছিল। ১৯৯৬ সালে খোকসাবাড়ীতে বাঁধের বাইরের অংশে মিজানপুরের বাঁধের বাইরের অংশের তুলনায় বন্যার মাত্রা বেশী ছিল। ১৯৯৬ সালের বন্যায় শতকরা ৫৩ ভাগ পরিবারের বাড়ী ঘর সম্পূর্ণ বা আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অন্যান্য ক্ষয় ক্ষতির মধ্যে শতকরা ৮৬ ভাগের ফসল এবং শতকরা ৭৩ ভাগের ফলজ বৃক্ষাদি আংশিক বা সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

২০০ পরিবারের মোট ৩৮৮টি ঘরের ক্ষতিগ্রস্ততার বিবরণ সারণী-১ এ দেখানো হলো।

সারণী ঃ ১

নমুনা এলাকাদ্বয়ে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ঘরের বর্ণনা ও সংখ্যা, ১৯৯৬

ক্ষতিগ্রস্ততার বর্ণনা	খোকসাবাড়ী (N=১৫৫)				মিজানপুর (N=২৩৩)				সর্বমোট (N=৩৮৮)	শতকরা
	বাঁ-ভি	বাঁ-বা	মোট	শতকরা	বাঁ-ভি	বাঁ-বা	মোট	শতকরা		
আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত	২৭	৫৪	৮১	৫২.২৬	৭	২৫	৩২	১৩.৭৩	১১৩	২৯.১২
সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত	১৬	৩৭	৫৩	৩৪.১৯	৬	৩৫	৪১	১৭.৬০	৯৪	২৪.২৩
ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি	২১	–	২১	১৩.৫৫	৮৫	৭৫	১৬০	৬৮.৬৭	১৮১	৪৬.৬৫
মোট ঘর	৬৪	৯১	১৫৫	১০০.০০	৯৮	১৩৫	২৩৩	১০০.০০	৩৮৮	১০০.০০
শতকরা			৩৯.৯৫				৬০.০৫		১০০.০০	

(বাঁ-ভি=বাঁধের ভিতরে, বাঁ-বা=বাঁধের বাইরে)

বন্যার ফলে অভিগমন

বিগত ৫০ বছরে উভয় এলাকার নমুনা পরিবারে মধ্যে খোকসাবাড়ীর ৮৪টি এবং মিজানপুরের ৭৪টি পরিবার, মোট ১৫৮টি পরিবার বন্যা ও নদী ভাঙ্গনের কারণে বাড়ী ঘর স্থানান্তরিত করেছেন এবং উভয় এলাকার মোট ২৭টি পরিবার বাঁধের বাইরে থেকে ভিতরের অংশে চলে এসে বাড়ী ঘর নির্মাণ করেছেন। উভয় এলাকার ১০টি পরিবারে মোট ১২জন সদস্য অন্যত্র অভিগমন করেছেন (সারণী-২)।

সারণী ঃ ২

বন্যার কারণে বিগত ৫০ বছরে গৃহ স্থানান্তরিত করার সংখ্যা / বার (N=২০০)

গৃহ স্থানান্তর সংখ্যা	নমুনা এলাকা				সর্বমোট	শতকরা	বাঁধের বাইরের এলাকা থেকে বাঁধের ভিতরের এলাকায় চলে আসা পরিবার সংখ্যা
	খোকসাবাড়ী		মিজানপুর				
	বাঁ-ভি	বাঁ-বা	বাঁ-ভি	বাঁ-বা			
১ বার	১০	২২	১১	১৬	৪৯	২৪.৫	১৩
২ বার	৭	৮	৩	৯	২৭	১৩.৫	৬
৩ বার	২	১১	২	৫	২০	১০.০	৩
৪ বার	১	৪	২	৪	১১	৫.৫	১
৫ বার	৩	২	১	৩	৯	৪.৫	২
৬ বার	২	৩	১	২	৮	৪.০	১
৭ বার	২	১	১	১	৫	২.৫	১
৮ বার	–	২	–	১	৩	১.৫	
৯ বার	–	১	–	৫	৬	৩.০	
১০ বার	–	৩	–	২	৫	২.৫	
১১ বার	–	–	–	১	১	০.৫	
১২ বার	–	–	–	১	১	০.৫	
১৩ ও তদূর্ধ্ব বার	–	–	–	৩	৩	১.৫	
স্থানান্তরিত করেনি	১৩	৩	১৯	৭	৪২	২১.০	
মোট	৪০	৬০	৪০	৬০	২০০	১০০.০	২৭টি পরিবার

বিঃ দ্রঃ খোকসাবাড়ীর বাঁধের বাইরের এলাকার ৬টি পরিবার ও মিজানপুরের ৪টি পরিবার, মোট ১০টি পরিবার থেকে ১২ জন সদস্য বাঁধের ভিতরের এলাকায় বা অন্যত্র (শহরে) অভিগমন করেছে।

চিকিৎসা ব্যবস্থা

উভয় এলাকার ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও মাতৃ কল্যাণকেন্দ্র বাঁধের ভিতরের এলাকায় অবস্থিত। বন্যাকালে সেখানেও ওষুধ সরবরাহ থাকে না। ডাক্তার ডেকে বাড়ীতে আনার সম্মানী/ফি প্রায় ২/৩ গুণ বৃদ্ধি পায়। ফলে বেশীর ভাগ পরিবার চিকিৎসার প্রয়োজনে নৌকা বা ভেলায় রোগীকে নিয়ে জেলা/থানা সদর হাসপাতালে অথবা বেসরকারী ডাক্তারের চেম্বারে যান। বন্যাকালে চিকিৎসা ব্যয় প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায়। মহিলাদেরকে প্রায় সারাদিন সংসারের কাজে ভেজা কাপড়েই থাকতে হয়। এভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন অনেকেই, অথচ তাঁরা খুব কমই চিকিৎসা সুযোগ পান।

আইন শৃংখলা ব্যবস্থা

বন্যাকালে খোকসাবাড়ী এলাকায় চুরি বেড়ে যায়, ডাকাতি তেমন একটি বাড়ে না। কিন্তু মিজানপুরে চুরি এবং জলদস্যু কর্তৃক ডাকাতি অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়ে যায়। চুরির জন্য স্থানীয় লোকদেরকে দায়ী করা হয়ে থাকে, তবে ডাকাতি বা জলদস্যুতার ক্ষেত্রে অন্য এলাকার (সাধারণত নদী পারের চর এলাকার) লোকদেরকে দায়ী করা হয়। রাহাজানি (হাইজ্যাক) কিছুটা বৃদ্ধি পায়। তবে ধর্ষণ খুব একটা বৃদ্ধি পায় না। পুরুষ-প্রধান পরিবারের তুলনায় মহিলা-প্রধান পরিবারে এসব সমস্যা বেশী হয় না বলে জানা গেছে। কিন্তু মহিলাবৃন্দ বন্যা বেশী হলেও নিজেদের ঘর ছেড়ে অন্য কোথাও আশ্রয় নিতে রাজী থাকেন না। এক্ষেত্রে দু'একজন স্পষ্ট জানিয়েছেন যে, অন্যত্র আশ্রয় নিলে ধর্ষণের ভয় বৃদ্ধি পায়। সম্ভবত এরূপ ঘটনা ঘটে থাকে, যার তথ্য পাওয়া আমাদের সমাজে খুবই কঠিন।

ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম

১৯৯৬ সালে সরকারী ত্রাণ সাহায্য পেয়েছেন মাত্র শতকরা ৩২ ভাগ পরিবার। ত্রাণ সামগ্রীর মধ্যে চালই প্রধান। শতকরা ৪৪ ভাগ ক্ষেত্রে প্রাপ্ত সরকারী ত্রাণ সামগ্রীর মূল্য ৪১-৫০ টাকা। বেসরকারী ত্রাণ সাহায্য পেয়েছেন মাত্র ৩টি পরিবার, যার মূল্য দু'টি ক্ষেত্রে ১১-৩০ টাকা এবং ১টি ক্ষেত্রে ১২১ টাকার কিছু বেশী। পুনর্বাসন সামগ্রী হিসেবে সরকারী সাহায্য পেয়েছেন মোট ২৬টি পরিবার এবং এর অধিকাংশ ক্ষেত্রে মূল্য ৩১-৬০ টাকার মধ্যে। পুনর্বাসন সামগ্রীর মধ্যে চাল এবং বীজ ও সার অন্যতম। বেসরকারী পুনর্বাসন সামগ্রী হিসেবে মিজানপুর এলাকার ৩টি নমুনা পরিবার 'কারিতাস' নামক এনজিও'র নিকট থেকে ৩টি টিনের ঘর পেয়েছেন, যেগুলোর মূল্য ৫,০০০-৭,০০০ টাকার মধ্যে। ত্রাণ ও পুনর্বাসন সামগ্রী বিতরণ অনিয়মিত, বিলম্বিত এবং খুবই অপ্রতুল।

বন্যার কারণে পেশা পরিবর্তন

১৯৯৬ সালের বন্যাকালে শতকরা ৭০ ভাগ অধিবাসীর প্রধান পেশা বন্ধ ছিল। যে ৩০ ভাগ অধিবাসী তাঁদের নিজেদের পেশা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন, তাঁদের

অধিকাংশই (২৭%) বাঁধের ভিতরের অংশের অধিবাসী। বাঁধের বাইরে মাত্র ৩ ভাগ তাঁদের প্রধান পেশা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। পুরুষ ও মহিলা উভয় শ্রেণীরই প্রধান পেশা বন্যাকালে বাধাগ্রস্ত হয়ে যায়। ফলে তাঁদেরকে সাময়িকভাবে অপ্রধান পেশা গ্রহণ করতে হয়। অপ্রধান পেশার ক্ষেত্রে দু'টি শ্রেণী-বিভাগ করা যায়। যেমন, কিছু বিত্তবান ব্যক্তি, তাঁরা বন্যার পূর্বে স্বল্প মূল্যে ফসল ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বেশী করে কিনে মজুত করে রাখেন। বন্যা ও বন্যার অব্যবহিত পর পর্যন্ত অসহায় ও পানিবন্দী পরিবারগুলো এঁদের নিকট খাদ্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য অত্যন্ত চড়া মূল্যে ক্রয় করতে বাধ্য হন। এ সময়ে ঐ সব মজুতদার দৈনিক ১৫০০-২০০০ টাকা লাভ করে থাকেন। কেউ কেউ চড়া সুদে টাকা ধার দিয়ে দরিদ্রদের অসহায়ত্বকে আরও তীব্রতর করে তুলেন। এঁরাও দৈনিক ১০০০-১৫০০ টাকা মুনাফা/সুদ (গড়ে) পেয়ে থাকেন। আর নিম্নবিত্ত শ্রেণীর প্রধান পেশা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তাঁরা কৃষি কাজ বা দিনমজুরীর পরিবর্তে মাছ ধরা, নৌকা চালানো, মুটেগিরি এবং ভিক্ষা করা পেশায় জীবিকা নির্বাহ করেন। মহিলাদের ক্ষেত্রে ক্ষেত-মজুর বা মিলের শ্রমিক যাঁরা ছিলেন, তাঁরা ঝি-গিরি, কাঁথা সেলাই করা, ভিক্ষা করা প্রভৃতি অপ্রধান পেশা অবলম্বন করে জীবিকা নির্বাহে বাধ্য হন। এঁদের প্রধান পেশায় ফিরে আসতে গড়ে ২৭দিন সময় বিলম্ব হয়েছিল। পেশা পরিবর্তন কেবল আয়ই কমায় না, তাঁদের নতুন ও কষ্টকর পেশা চালনা করতে বাধ্য করে। নৌকা চালানো দিন মজুরীর তুলনায় কষ্টকর কাজ এবং ভিক্ষা করা ক্ষেতমজুরীর তুলনায় নিকৃষ্টতর পেশা (সারণী-৩)।

সারণী ঃ ৩

বন্যার পরে পরিবারের সদস্যবৃন্দের প্রধান পেশা আরম্ভকরণে বিলম্ব কাল, ১৯৯৬

প্রধান পেশা আরম্ভকরণে বিলম্ব কাল (দিনে)	নমুনা এলাকা				সর্বমোট (N=২০০)	শতকরা
	খোকসাবাড়ী (N=১০০)		মিজানপুর (N=১০০)			
	বাঁ-ভি	বাঁ-বা	বাঁ-ভি	বাঁ-বা		
কোন বিলম্ব হয়নি, সর্বদাই পেশা চালু ছিল	২২	৪	৩২	২	৬০	৩০.০
অনূর্ধ্ব১৫ দিন	৮	৬	৪	১২	৩০	১৫.০
১৬-৩০ দিন	১০	২১	৪	২৫	৬০	৩০.০
৩১-৪৫ দিন	–	১৯	–	১৭	৩৬	১৮.০
৪৬-৬০ দিন	–	১০	–	৪	১৪	৭.০
মোট	৪০	৬০	৪০	৬০	২০০	১০০.০

বন্যার কারণে সম্পদ বিক্রি, ঋণ ও বিপন্নতা

বন্যার কারণে নমুনা এলাকার শতকরা ৪৯ ভাগ পরিবার কর্জ (ধার, যা বিনাসুদে গ্রহণ করে) ও ঋণ (যা সুদের বিনিময়ে গ্রহণ করে) গ্রহণ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে ৩১.৫% ভাগ আত্মীয়/প্রতিবেশীদের নিকট কর্জ এবং ১৭.৫ ভাগ সুদের বিনিময়ে ঋণ গ্রহণ করেছেন। সুদের হার বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ১০০ টাকায় মাসে ১০ টাকা। তবে কিছু পরিবারকে ১০০ টাকায় মাসে ৩০ টাকা হারেও সুদ দিতে হয়। অর্থাৎ বন্যায় যদি ৪ মাস এঁরা কাজ না পান, তাহলে মহাজনকে দ্বিগুণ টাকা ফেরত দিতে হবে। ফলে নিঃস্বতার একটি পথ এভাবেই তৈরি হচ্ছে। আরেকটি দিক উল্লেখযোগ্য, অধিবাসীগণ বন্যার কারণে অনেক সময় আধা পাকা ফসল কাটতে বাধ্য হন এবং তার বিক্রি মূল্যও প্রায় অর্ধেক পেয়ে থাকেন। বন্যা এলে রাখার স্থানের অভাবে ফসল, গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগী বিক্রি করেন জলের দামে। ঠেকায় পড়ে ফসল কম দামে বিক্রি করে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য কিনতে হয়। বন্যার অব্যবহিত পরে ঘর মেরামত বা তৈরির জন্যও বিক্রি করতে হয় স্থায়ী বা অস্থায়ী সম্পদ। নমুনা এলাকায় বন্যা কালে শতকরা ৪০ ভাগ পরিবারকে স্থায়ী ও অস্থায়ী সম্পদ বিক্রি করতে হয়েছে গড়ে অন্য সময়ের চেয়ে শতকরা ২৬ ভাগ কম দামে। এর ফলে নিঃস্ব ও বিপন্ন হওয়ার দিকে এগিয়ে চলেছেন এসব অধিবাসী (সারণী-৪)।

সারণী ঃ ৪

বন্যা-পরবর্তী কালে স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ বিক্রয়, ১৯৯৬

স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ বিক্রির কারণ	নমুনা এলাকা							
	খোকসাবাড়ী (N -১০০)		মোট	শতকরা	মিজানপুর (N -১০০)		মোট	শতকরা
	বাঁ-ভি	বাঁ-বা			বাঁ-ভি	বাঁ-বা		
অভাবে/সংসার পরিচালনার জন্য	১	৭	৮	৮.০	৭	১৩	২০	২০.০
ঘর তৈরি করতে	১	–	১	১.০	২	৭	৯	৯.০
ফসলের বীজ ক্রয় কারতে	–	–	–	–	–	২	২	২.০
কোন কিছু বিক্রি করেনি	৩৮	৫৩	৯১	৯১.০	৩১	৩৮	৬৯	৬৯.০
মোট	৪০	৬০	১০০	১০০.০	৪০	৬০	১০০	১০০.০

বন্যা ও মহিলাদের বিপন্নতা

বন্যাকালে ও বন্যার অব্যবহিত পরে পরিবারের মহিলা সদস্যবৃন্দ অত্যন্ত বিপন্ন হয়ে পড়েন। বন্যাকালে সাধারণত মাচার বা চৌকির (তক্তপোষ) উপর মাটির বা টিনের চুলো বানিয়ে নমুনা এলাকার অধিবাসীবৃন্দ রান্না-বান্না ও আহারের ব্যবস্থা করেন। ১৯৯৬ সালে বন্যা তেমন প্রবল না হওয়ায় শতকরা ৪৪ ভাগের রান্না-বান্না স্বাভাবিকভাবে রান্নাঘরে বা চুলোয় তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। এই ৪৪% এর মধ্যে ৩৩% বাঁধের ভিতরের এলাকার অধিবাসী। যাঁরা বাঁধের বাইরের অংশে বাস করেন, এরূপ পরিবারকে মাচার উপর চুলো বসিয়ে রান্না করতে হয়েছে। এদের সংখ্যা ৫৬%। আটা বা ময়দা গুলে খেতে হয়েছে ৫টি পরিবারকে প্রায় ৭ দিন। কেউ কেউ অন্যের বাড়ী থেকেও রান্না করে নিয়ে এসেছেন। অনেকে অনাহারে থাকেন। অথচ দরিদ্র ও মহিলা-প্রধান পরিবার প্রতিবছর খোকসাবাড়ীতে গড়ে ৫ কেজি চাল এবং মিজানপুরে ১০/১২ কেজি গমের বেশী ত্রাণ/সাহায্য পান না। কেইস স্টাডি থেকে প্রাপ্ত মহিলা-প্রধান পরিবারের তথ্যে জানা গেছে যে, বন্যাকাল আসলেই ১২/১৩ বছর বয়সী মেয়েদের বিয়ের ভাবনা মহিলাদেরকে বেশী পীড়িত করে। কারণ তাতে একজনের আহার জোটাবার কষ্ট কমে যেতো এবং সম্ভ্রম রক্ষার দুশ্চিন্তায় রাতের ঘুম নষ্ট হতো না। এঁদেরকে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বাজার/হাট থেকে এনে দেবার তেমন কেউ থাকেন না। চিকিৎসার প্রয়োজনে প্রতিবেশীদেরকে অনুরোধ জানাতে হয়। অসুস্থ স্বজনকে দেখতে যেতে পারেন না। দূর থেকে পানীয় জল আনতে ভেলায় চড়ে যেতে হয়। যদি কারুর ভেলা না পাওয়া যায়, তাহলে বন্যার পানিই পান করতে বাধ্য হন।

পুরুষ-প্রধান পরিবারের মহিলাদের সংসার পরিচালনার সমস্যা

মহিলাদেরকেই বাংলাদেশে গৃহের যাবতীয় কর্মের দায়-দায়িত্ব পালন করতে হয়। বন্যকালে তাঁদের বহুমুখী সমস্যা দেখা দেয়। যেমন, খড়ির অভাবে রান্না করার অসুবিধা, মাচার উপরে রান্না করার কষ্ট, দূর থেকে পানীয় জল নিয়ে আসার কষ্ট, সন্তান পালন, বিশেষ করে অনূর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী সন্তানদেরকে পানিতে পড়ে যাবার ভয়ে সর্বক্ষণ আগলে রাখা, রোগী, প্রসূতি মাতা ও মেহমানদের সেবা করার ক্ষেত্রে সমস্যা, একই ঘরে প্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান ও গবাদি পশু নিয়ে বাস করা, চোর/ডাকাতের ভয়ে এবং ছোট শিশুর পানিতে পড়ে যাবার উদ্বেগে রাতে জেগে থাকা, হাঁস/মুরগী ও গবাদি পশু রক্ষণাবেক্ষণ ও সেগুলোর আহার জোগানো প্রায় সারাদিন ভেজা কাপড়ে অবস্থান করার ফলে শারীরিক অবসাদ ও অসুখ সৃষ্টি, ধান থেকে চাল ও আটা তৈরির সমস্যা প্রভৃতি নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত হতে হয় মহিলাদেরকে (সারণী-৫)।

সারণী ঃ ৫

বন্যাকালে গৃহস্থালীর বিভিন্ন কাজে মহিলাদের সমস্যা, ১৯৯৬

গৃহস্থালী কাজে মহিলাদের সমস্যা	নমুনা এলাকা							
	খোকসাবাড়ী (N=১০০)		মোট	শতকরা	মিজানপুর (N=১০০)		মোট	শতকরা
	বাঁ-ভি	বাঁ-বা			বাঁ-ভি	বাঁ-বা		
ধান থেকে চাল/আটা তৈরির অসুবিধা	৭	১৭	২৪	২৪.০	৬	১৯	২৫	২৫.০
বাড়ী-ঘর উঠোন পরিস্কার করার সমস্যা	৮	১৪	২২	২২.০	৭	৮	১৫	১৫.০
ঘুঁটে তৈরি ও শুকানোর সমস্যা	৩	৬	৯	৯.০	৪	৮	১২	১২.০
পায়খানা/প্রস্রাবখানার সমস্যা	৩	৫	৮	৮.০	২	৫	৭	৭.০
কাপড়-চোপড় সিদ্ধ করে কাচার সমস্যা	–	৩	৩	৩.০	–	৩	৩	৩.০
নবজাতকের ও প্রসূতির সেবা করার সমস্যা	৪	২	৬	৬.০	১	৪	৫	৫.০
রোগীর পথ্য রান্নার অসুবিধা	–	২	২	২.০	–	১	১	১.০
সাবালক সন্তানদের সঙ্গে একই চালায়/ঘরে শয়ন করার সমস্যা	–	৭	৭	৭.০	–	৪	৪	৪.০
আত্মীয়-স্বজন বেড়াতে আসলে রান্না-বান্নার সমস্যা	২	২	৪	৪.০	২	২	৪	৪.০
প্রায়শ ভেজা কাপড়ে থাকার ফলে অসুখ সৃষ্টি	–	১	১	১.০	–	২	২	২.০
অবসর ও ঘুমের অভাব	৫	১	৬	৬.০	১০	–	১০	১০.০
অন্য সময়ের তুলনায় খাটুনী (গৃহস্থালী কাজে) অনেক বেশী	৮	–	৮	৮.০	৮	৪	১২	১২.০
মোট	৪০	৬০	১০০	১০০.০	৪০	৬০	১০০	১০০.০

মহিলা পরিবার-প্রধান ও রোজগারী-মহিলাদের সমস্যা

মহিলা-প্রধান পরিবারের কর্ত্রী উচ্চ বা মধ্যবিত্তের অধিকারী হলে তাঁদের সমস্যা তুলনামূলকভাবে কিছুটা কম হয়। বাড়তি সমস্যা হিসেবে বাজার করা, ঝি না পেয়ে নিজে সংসারের সমস্ত কাজ দেখাশুনা করা এবং কৃষি কাজ তদারকী করার সমস্যায় পড়তে হয়। অপরদিকে মহিলা পরিবার-প্রধান যদি প্রকৃত ভূমিহীন বা ভূমিহীন (যাঁদের বসতবাটীসহ অনূর্ধ্ব ৫০ শতাংশ জমি আছে) হন, তাহলে তাঁর সমস্যাবলী আরও প্রকট হয়। যেমন, আপন পেশার কাজ চালানো সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়, কাজ চালু থাকলে কার্যস্থলে গমনাগমন অত্যন্ত কষ্টকর হয়, অনেকে আপন পেশা চালাতে না পেরে বিকল্প পেশা গ্রহণ করেন, তাতে আয়/মজুরী প্রায় অর্ধেক কমে যায়, অনূর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী সন্তানকে অন্যের বাড়ীতে রেখে বা সঙ্গে নিয়ে কার্যস্থলে যেতে হয়, অন্যথায় পানিতে ডুবে যাবার ভয় থাকে, বন্যা বেশী বৃদ্ধি পেলে কোন আয়ই থাকে না। তখন ভিক্ষাবৃত্তি, অনাহার অথবা সর্বশেষ সম্বল বিক্রি করে দিতে হয় এবং চড়া সুদে (মাসিক শতকরা ১০-৩০ টাকা) ঋণ গ্রহণ করতে হয়। সন্তানের এবং নিজের অসুখে চিকিৎসার তেমন কোন ব্যবস্থা করতে সক্ষম হন না। কেইস স্টাডি থেকে দেখা গেছে যে, বন্যাকালে ছেলে ধরা গুজব ও আতঙ্ক অত্যন্ত বেড়ে যাবার ফলে অনেক রোজগারী মহিলা কাজে গমন না করে অনাহারে সন্তান পাহারা দেন। ১৯৯৬ সালের বন্যাকালে রোজগারী মহিলাদের সংসার পরিচালনার সমস্যাদি সারণী-৬ এ দেখানো হলো।

সারণী ঃ ৬

নমুনা এলকাদ্বয়ে বন্যা ও বন্যা-উত্তরকালে রোজগারী মহিলাদের সংসার পরিচালনার সমস্যা ,১৯৯৬

কাজ না পেলে সংসার চালানোর প্রক্রিয়া	নমুনা এলাকা				সর্বমোট (N=২০০)	শতকরা
	খোকসাবাড়ী (N=১০০)		মিজানপুর (N=১০০)			
	বাঁ-ভি	বাঁ-বা	বাঁ-ভি	বাঁ-বা		
অর্ধাহারে দিন কাটতো	১৬	১৫	১২	৯	৫২	২৬.০
ধার করতো	৩	১০	৪	৭	২৪	১২.০
সুদের উপর টাকা ঋণ করতো	৪	৮	২	৫	১৯	৯.৫
সংসারের প্রয়োজনীয় দ্রব্য বিক্রি করতো	১	৫	৪	১১	২১	১০.৫
গ্রামের ধনীদের নিকট থেকে সাহায্য নিতো	১	২	–	–	৩	১.৫
সরকারী ভিজিডি কার্ডের গম দ্বারা চলতো	১০	১১	৮	৯	৩৮	১৯.০
শাড়ী/গহনা/কাঁথা বিক্রি করতো	–	২	৪	৩	৯	৪.৫
আত্মীয়-স্বজনের নিকট থেকে চেয়ে আনতো	১	২	২	৮	১৩	৬.৫
ভিক্ষা করতো	৪	৫	৪	৮	২১	১০.৫
মোট	৪০	৬০	৪০	৬০	২০০	১০০.০

বন্যা ও শিশুদের বিপন্নতা

শিশুদের বিদ্যালয়ে গমন

০-১৪ বছর বয়সী শিশুদের বিভিন্নমুখী সমস্যা ও বিপন্নতা লক্ষ্য করা গেছে। যেমন শিক্ষারত শিশুদের বিদ্যালয়ে গমনাগমন কষ্টকর হয়ে যায়। তারা পানি ও কাদার মধ্য দিয়ে দূরের বিদ্যালয়ে যেতে পারে না। সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৯৬ সালের বন্যাকালে শতকরা ২৬ ভাগ শিশু বিদ্যালয় গমনে সক্ষম হয়নি। তথ্য মতে গড়ে ১৩ দিন পর্যন্ত এরূপ বিদ্যালয় গমন বন্ধ ছিল। অনেক শিশুর সর্বোচ্চ ২ মাস বিদ্যালয় গমন বন্ধ থাকে। ফলে ড্রপ আউট সৃষ্টি হয় (সারণী-৭)।

সারণী ঃ ৭

শিক্ষারত শিশুদের বন্যাকালে বিদ্যালয়ে গমনাগমন, ১৯৯৬

বন্যাকালে বিদ্যালয়ে গমনাগমন	নমুনা এলাকা							
	খোকসাবাড়ী			মিজানপুর			সর্বমোট	শতকরা
	বাঁ-ভি (N=৫৭)	বাঁ-বা (N=৬৩)	মোট (N=১২০)	বাঁ-ভি (N=৫৮)	বাঁ-বা (N=৭১)	মোট (N=১২৯)	(N=২৪৯)	
গমন করতে পারে	৫১	৪২	৯৩	৫২	৪০	৯২	১৮৫	৭৪.৩০
গমন করতে পারে না	৬	২১	২৭	৬	৩১	৩৭	৬৪	২৫.৭০
মোট	৫৭	৬৩	১২০	৫৮	৭১	১২৯	২৪৯	১০০.০০

শিশুদের চিত্তবিনোদন

শিশুগণ সাঁতার ও নৌকায় চড়া ছাড়া আর কোন খেলাধুলা বা চিত্ত বিনোদনের সুযোগ পায় না। অবশ্য কেউ কেউ রেডিও শোনার সুযোগ পায়। অনেকে অলসভাবে আড্ডা দেয়ার ফলে 'কিশোর অপরাধী'তে পরিণত হয়। সবচেয়ে সমস্যা ও কষ্টের বিষয় হচ্ছে জলবন্দী ও স্যাঁতসেতে আবহাওয়ায় থাকার ফলে তাদের শারীরিক বিকাশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কেইস স্টাডি থেকে দেখা যায় যে, শিশুদের মাঝে এক প্রকার বিষণ্নতা ও মানসিক অবসাদ কাজ করে। এই বয়সী শিশুদের অনেককে নৌকা চালানো, মাছ ধরা, গবাদি পশু পালনের মত শারীরিকভাবে কষ্টকর ও শক্তি নিঃশেষ

করার কাজের দায়িত্ব পালন করতে হয়। অথচ এদের চিত্ত-বিনোদনের পথগুলো রুদ্ধ হয়ে যায় বেশীর ভাগই।

শিশুশ্রম

খোকসাবাড়ী এলাকায় দরিদ্র পরিবারের শিশুদেরকে বন্যাকালে পিতা বা বড় ভাইয়ের সঙ্গে সারাদিন নৌকা চালনা করতে হয় এবং বড় বড় গাছের ডালে চড়ে খড়ি সংগ্রহ করতে হয়। মিজানপুর এলাকায় মাছ ধরা বড়শির টোপ হিসেবে ব্যবহারের জন্য ইঁদুরের গর্ত থেকে ইঁদুর ধরে আনতে হয়। অনেক সময় ইঁদুরের গর্ত থেকে সাপ বেরিয়ে আসে। তবু এসব বিপজ্জনক কাজ শিশুদেরকেই করতে হয়।

শিশুদের ই. পি. আই. কর্মসূচি

০-২ বছর বয়সী শিশুদের ৬টি মারাত্মক রোগের টীকা/ইনজেকশন প্রদানের কাজ বন্যার কারণে ব্যাহত হয়। বন্যাকালে ডিপিটি, পোলিও, বিসিজি, হাম প্রভৃতি টীকা গ্রহণের সময় হলে তা গ্রহণ করা সম্ভব হয়না। ফলে শিশুদের ইপিআই কর্মসূচির কোর্স পূরণ (সকল ডোজ গ্রহণ) সম্ভব হয়না। এটি অত্যন্ত ক্ষতিকারক বলে বিবেচিত।

শিশুদের চিকিৎসা সুযোগ

০-৫ বছর বয়সী শিশুদেরকে মা-বাবারা বাড়ীর মধ্যে এমনকি ঘরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন যাতে জলে ডুবে মারা না যায়। দীর্ঘদিন এভাবে খেলাধুলাহীন ও আড়ষ্ঠ জীবন কাটানোর ফলে অনেক শিশু রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। সে সময়ে অধিকাংশ পরিবারের তেমন কোন আয় না থাকায় এবং চিকিৎসার সুযোগ সহজপ্রাপ্য না হওয়ায় শিশুদের অসুখ হলে দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়না। অনেক দরিদ্র শিশু বন্যাকালে আদৌ কোন চিকিৎসা পায়না। বন্যার কারণে বাঁধে বা উঁচু স্থানে আশ্রয় নিলে এসব শিশু সারাদিন রোদে পোড়ে, আবার বৃষ্টি হলে ভেজা কাপড় গায়ে শুকায়। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে শিশুদের পুরো বন্যাকাল অতিবাহিত হয়। কর্মজীবী মহিলাদের ক্ষেত্রে এরূপ শিশুকে অন্যের বাসায় রেখে মা কাজে যান। শিশুরা অন্য বাড়ীতে অবহেলা লাভ করে। ফলে তাদের মানসিক সুস্থ বিকাশ ঘটে না। শারীরিক অসুখ তীব্রতর হলে প্রাইভেট ডাক্তারের নিকট চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হয়। এই চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহে বহু পরিবার ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

মহিলা ও শিশুদের সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনা

বন্যাকালে মহিলা ও শিশুদের বিপন্নতার বর্ণনা ও মাত্রা থকে অনুমিত হয় যে, এদেশের অনগ্রসর ও অবহেলিত এই দু'টি শ্রেণী সত্যিকার অর্থে বন্যাকালে অসহায় হয়ে পড়ে। অথচ ত্রাণ ও পুনর্বাসন সাহায্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে শিশুর কোন কোটা নেই, মহিলারা পেছনের সারিতে। অপরদিকে বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে পিতা তাঁর সন্তান-কে অভূক্ত রেখে খেতে পারলেও মা তা পারেন না। তাই রোজগারী মহিলাবৃন্দ

বন্যাকালে যখন পেশা পরিবর্তন করে পেটে-ভাতে ঝি-গিরি করেন, তখনও নিজে না খেয়ে নিজের খাবারটুকু নিয়ে এসে সন্তানের সঙ্গে ভাগ করে অর্ধাহারে থাকেন।

কেইস ষ্টাডি থেকে প্রাপ্ত তথ্য

খোকসাবাড়ী ইউনিয়ন (সিরাজগঞ্জ) ও মিজানপুর ইউনিয়ন (রাজবাড়ী) থেকে গৃহীত ১০ জন মহিলার কেইস স্টাডি থেকে যথার্থভাবে অনুভূত হয় বন্যা পীড়িত এলাকার মহিলা পরিবার-প্রধানদের প্রকৃত অবস্থা। কেইস স্টাডিগুলো থেকে সমীক্ষা এলাকায় দু'টি বিষয় অনুধাবন করা যায়। প্রথমত, বাঁধের বাইরের অংশে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র ও বিত্তহীন মহিলাদের বসবাস। তাঁদের বিত্ত বৈভব থাকলে সম্ভবত তাঁরা বাঁধের ভিতরের অংশে চলে এসে বসতি স্থাপন করতেন অথবা অন্যত্র বন্যাহীন এলাকায় চলে যেতেন। কারণ, পুরো বন্যাকাল এক অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্টের মধ্যে কাটে তাঁদের দিন। যাঁদের শিশু সন্তান (০-১৪ বছর বয়সী) আছে, তাঁদের অবস্থা আরও বেশী দুঃসহ। সন্তান রেখে কাজে যাওয়া কঠিন, যদি শিশু পানিতে ডুবে মারা যায়, এই ভয়ে। আবার কাজে না গেলে নিজের আহার, সন্তানের দু'মুঠো ভাত জোটানো যায় না। অপরদিকে বাঁধের ভিতরের অংশের মহিলা পরিবার-প্রধানগণ তুলনামূলকভাবে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। তাঁদেরও বন্যাকালে সমস্যা হয়, কিন্তু সে সমস্যা বেঁচে থাকার বা ক্ষুধার অন্ন জোগাবার জন্য নয়, নিরাপত্তাজনিত অথবা দ্রব্য মূল্য বেড়ে যাওয়া বা ঝি-চাকর না পাবার সমস্যা। তাই সমস্যাটি বাঁধের বাইরে বেঁচে থাকার সংগ্রাম, বাঁধের ভিতরে নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দের অভাব।

যেমন দেখা যায়, বিধবা সালেহা বেগম তাঁর দুই মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে ঢাকায় এসে মেয়েদেরকে গার্মেন্টিসে চাকরি করতে দিয়েও টিকে থাকতে পারেননি। ফিরে যেতে হয়েছে প্রতি বছর বন্যাক্রান্ত খোকসাবাড়ীর সেই তালগাছ পাঁচিল এলাকায়। তাঁর দুই মেয়ে ১৬ ও ১৮ বছর বয়সী (অবিবাহিতা) যদিও শিশু নন, তবু বন্যাকালে তাঁরাই বেশী বিপন্ন। ঘরে কাজ নেই, খাবার নেই, বাঁধে আশ্রয় নিতে নিরাপত্তার অভাব। এ এক দুঃসহ জীবন। আবার মিজানপুরের বড়লক্ষিপুর গ্রামের সুন্দরী বিত্তবান ২৭ বছর বয়সী বিধবা আনোয়ারা বেওয়াও বিপন্ন। বন্যাকালে বাড়ীতে চুরির ভয়, নিজের সৌন্দর্য এবং অল্প বয়সে বৈধব্য তাঁকে আরও বেশী বিপন্ন করে তুলেছে। ছেলে ধরা আতঙ্ক বাড়ে বন্যাকালে। প্রতি মুহূর্তে শঙ্কিত জীবন এক অসহনীয় জীবন।

প্রতিবছর যমুনা ও গঙ্গা নদীতে বন্যা আসে। প্রবল বন্যা না হলেও নদী তীরের মহিলা পরিবার প্রধানদের কাজ থাকে না, মজুরী কমে যায়, প্রধান পেশ পরিবর্তন করে অপ্রধান পেশা গ্রহণ করে মহিলা পরিবার-প্রধানদেরকে বেঁচে থাকতে হয়, বাঁচিয়ে রাখতে হয় তাঁদের শিশু সন্তানদের। দু'টিই বিপন্ন শ্রেণী, তবু প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে কোন ভাবে টিকে আছেন তাঁরা। বর্তমান তাঁদেরকে কিছু দেয়নি। অনাগত ভবিষ্যত যদি একটু সুখ এনে দেয়, তারই প্রত্যাশায় চলছে তাঁদের নিরন্তর লড়াই।

বন্যার ক্ষয় ক্ষতি হ্রাসকরণে গৃহীত পদক্ষেপ

নমুনা এলাকাদ্বয়ের অধিবাসীগণ বন্যার ক্ষয়-ক্ষতি হ্রাসে যে সমস্ত কৌশল গ্রহণ করেন, তার অধিকাংশই ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং স্বল্প মেয়াদী। তারা বাস্তুভিঠা মাটি দিয়ে উচুঁ করেন, বাড়ীর চারদিকে (কেউ কেউ) মাটির ৩/৪ ফুট উঁচু বাঁধ নির্মাণ করেন, পানি নিষ্কাশনের জন্য নালা কেটে রাখেন। তবে একটি ক্ষেত্রেই কেবল তাঁদের সমষ্টিগত প্রয়াস লক্ষ্য করা গেছে, তা হলো, বন্যা কালে নিরাপত্তা বিধানের জন্য দল বেঁধে রাতে গ্রাম পাহারার ব্যবস্থা করেন। তাঁদের মন্তব্য অনুযায়ী সরকারী বা প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা হিসেবে বাঁধ নির্মাণ ও মেরামত, পানি বিশুদ্ধকরণ ওষুধ, হাঁস-মুরগীর টীকা/ইনজেকশান ইত্যাদি ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। তবে এসব প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা সর্বদা প্রাপ্তি নিশ্চিত নয় এবং প্রায়ই বিলম্বে পাওয়া যায়।

উপসংহার

সুপারিশমালা

মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্য এবং বাংলাদেশের অন্যতম প্রাকৃতিক দুর্যোগ বন্যা ও তার ফলে সৃষ্ট বিপন্নতা সংক্রান্ত মাধ্যমিক উৎসের তথ্যাদি থেকে বন্যাকালে মহিলা ও শিশুদের আর্থ-সামাজিক প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত পর্যালোচনা শেষে কতিপয় বিষয়ের প্রতি সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। এসব বিষয় নিয়ে সুপারিশ পেশ করতে গেলে প্রথমেই আমাদের ভেবে দেখতে হবে যে, বাংলাদেশে বন্যা নিয়ন্ত্রণ শব্দটি আদৌ প্রয়োগ করা সমীচীন হচ্ছে কিনা। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর কোন দেশেই সম্পূর্ণভাবে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা যায়নি, বরঞ্চ এর ক্ষয়-ক্ষতি হ্রাসের ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা গ্রহণ এবং অধিকতর বিপন্ন শ্রেণীসমূহের সক্ষমতা আনয়নের প্রচেষ্টা অনেক বেশী লাভজনক। এটি না করার ফলে বন্যাজনিত বিপন্নতা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। বিশেষ করে মহিলা ও শিশুদের বিপন্নতা বাংলাদেশে একটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা হিসেবে দীর্ঘস্থায়ী হয়ে রয়েছে। এসব পর্যালোচনার আলোকে সমীক্ষালব্ধ এলাকায় স্থায়ী ও অস্থায়ী কতিপয় সুপারিশ প্রণয়ন করা হলো।

সমীক্ষা এলাকার বন্যাপূর্ব সতর্কতা বা বন্যার পূর্বাভাস সম্পর্কিত তথ্যে দেখা গেছে যে, শতকরা ৯৫ ভাগ অধিবাসী সরকারী ও বেসরকারী কোন প্রকার প্রচারণা বা উদ্বুদ্ধকরণ বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত নন। এ বিষয়ে সরকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে স্মরণীয় যে, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের ক্ষেত্রে পূর্বাভাস ও উদ্বুদ্ধকরণ প্রক্রিয়া বাংলাদেশে বেশ সফলতা লাভ করেছে। ফলে ১৯৯৭ সালের ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষয়-ক্ষতির মাত্রা যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে। বন্যার ক্ষেত্রেও এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণীয় হতে পারে।

বন্যাপ্রবণ এলাকা হিসেবে বর্ণিত নমুনা ইউনিয়ন দু'টির বাঁধের বাইরের অংশে দ্বি-তল বিল্ডিং বিশিষ্ট স্বাস্থ্য ও মহিলা কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ করা প্রয়োজন। এতে

বন্যাকালে বন্যাক্রান্ত পরিবারসমূহ যেমন আশ্রয় লাভ করতে পারবেন, তেমনি চিকিৎসা, সম্প্রসারিত টীকাদান কর্মসূচি এবং পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি বিঘ্নিত হবে না।

উভয় ইউনিয়ন প্রতি বছরই বন্যাক্রান্ত হয় বলে শিক্ষার হার, বিশেষ করে নারী শিক্ষার হার অত্যন্ত কম। এই হার বাঁধের বাইরের এলাকায় খুবই কম। তাই বাঁধের বাইরের অংশে একটি করে বালক উচ্চ বিদ্যালয় ও একটি করে বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এগুলো দ্বারা শিক্ষার হার বৃদ্ধি এবং আশ্রয় স্থলের ব্যবস্থা সম্ভব হবে।

বন্যাপ্রবণ এলকাসমূহে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের বিদ্যালয় ও মাদ্রাসাসমূহের গ্রীষ্মকালীন ছুটি বাতিল করে 'বন্যাকালীন ছুটি' চালু করা যেতে পারে। এতে শিশুদের লেখাপড়ার ক্ষতি হবে না, ড্রপ আউটের হার হ্রাস পাবে এবং বন্যা কালে ঐ সব প্রতিষ্ঠানে বন্যাক্রান্ত পরিবারসমূহ আশ্রয় লাভের সুযোগ পাবে।

বন্যাক্রান্তদের গৃহীত আশ্রয় স্থলসমূহে সরকারী বা বেসরকারী পাহারা ব্যবস্থা চালু থাকা প্রয়োজন। এর ফলে মহিলা আশ্রয় গ্রহণকারীগণ অধিকতর নিরাপত্তা লাভ করবেন এবং অনেকেই কষ্টকরভাবে পানি প্লাবিত বাড়ীতে না থেকে আশ্রয় কেন্দ্রে আসতে আগ্রহী ও সম্মত হবেন।

বন্যাপ্রবণ এলাকায় বন্যাকালে সরকারী বা বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় কুটির শিল্পের বিভিন্ন উপকরণ সরবরাহ করে কর্মের সংস্থান করা যায়। এতে মহিলা ও শিশুগণ হেয়তর পেশা গ্রহণ ও বন্যাকালীন বেকারত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে কাজের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের পথ খুঁজে পাবেন। সরকারী বা বেসরকারী সংস্থাও এতে লাভবান হতে পারবে। এরূপ কাজের সুযোগ দেয়া হলে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি মহিলা ও শিশুগণ অনেকটা পুষিয়ে নিতে পারবেন। এমনকি ঐ পেশা পরবর্তীকালেও বজায় রাখতে পারেন। অবশ্য স্থানীয় পর্যায়ে চাহিদাপূর্ণ কুটির শিল্প নির্বাচন করতে হবে।

বন্যাক্রান্ত এলাকায় ত্রাণ সামগ্রী প্রেরণে বিলম্ব দূর করতে হবে। এর সুষ্ঠ বন্টন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য জনপ্রতিনিধিদের পাশাপাশি পরিবীক্ষণ দলও প্রেরণ করা প্রয়োজন। অনুরূপভাবে বন্যা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুনর্বাসন সামগ্রী প্রেরণ ও বন্টনের ব্যবস্থা করতে হবে। ত্রাণ সামগ্রীর ক্ষেত্রে রান্না না করেই খাওয়া যায়, এরূপ সামগ্রী এবং পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে বীজ,সার, কীটনাশক এবং ঘরবাড়ী নির্মাণের সামগ্রী প্রদান করা অধিকতর শ্রেয় বিবেচিত হবে। বন্যাপ্রবণ এলাকার বিত্তহীন ও দুঃস্থ মহিলা প্রধান পরিবারের তালিকা পূর্ব থেকেই ইউনিয়ন পরিষদকে সংগ্রহ করে রাখার নির্দেশ দিতে হবে। বন্যাকালে ত্রাণ বিতরণের ক্ষেত্রে সেসব পরিবারে ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দিতে হবে। কষ্ট ও খরচ করে দূর থেকে এসে ত্রাণ সংগ্রহ মহিলাদের পক্ষে অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না।

বন্যাকালে ও বন্যার পরে অধিক হারে সরকারী ও বেসরকারী ঋণ বিতরণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। যাতে নিতান্ত স্বল্প মূল্যে বন্যাক্রান্তদেরকে তাঁদের শেষ সম্বল বিক্রি করতে না হয় এবং অত্যন্ত চড়া সুদের কারবারী মহাজনদের হাতে থেকে তাঁরা রক্ষা পান।

উভয় নমুনা এলাকা নদী ভাঙ্গন দ্বারা আক্রান্ত এবং ইতোমধ্যে উভয় ইউনিয়নের ১টি করে গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আরও ১টি করে গ্রাম নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে। সরকারে 'ফ্যাপ' (ফ্লাড এ্যাকশন প্রোগ্রাম) অনুযায়ী আরও নদী ভাঙ্গন ঠেকাতে 'গ্রোয়েন' নির্মাণ বা অন্য কোন দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে। বাঁধের বাইরের অংশে 'ম্যানগ্রোভ' জাতীয় বৃক্ষের চারা সরবরাহ করতে হবে। এর ফলে বন্যায় গাছ-পালা মরে যাবে না, নদী ভাঙ্গন রোধ করা যাবে এবং পরিবেশের উন্নতি ঘটবে।

উপরি-উক্ত পর্যবেক্ষণ ছাড়াও ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যবৃন্দ, থানা, জেলা ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে বন্যা বিষয়ক বিশেষজ্ঞদের নিকট থেকে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে বন্যা বিপন্নতা হ্রাসে যে সমস্ত সুপারিশ পাওয়া গেছে, তার আলোকে প্রণীত সুপারিশসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

প্রথমত, বন্যার ক্ষয়-ক্ষতি রোধে বাঁধ বা গ্রোয়েন নির্মাণের মত ব্যয়বহুল স্ট্রাকচারাল পন্থা গ্রহণ না করে নন-স্ট্রাকচারাল কিছু পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে Khan (1981) এর কিছু নন-স্ট্রাকচারাল পদ্ধতির কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। তিনি বন্যাপ্রবণ এলাকার জনগণের মন থেকে বন্যা ভীতি দুরীকরণ ও কতিপয় বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেছেন। সেগুলো হলো, বন্যাপূর্ব সতর্কীকরণ ব্যবস্থা জোরদারকরণ এবং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দকে প্রশিক্ষণ প্রদান, বন্যকালে যথাশীঘ্র ত্রাণ সামগ্রী এবং বন্যার অব্যবহিত পরে পুনর্বাসন সামগ্রী প্রেরণ, বন্যকালে দ্রুত উদ্ধারকার্য পরিচালনা, প্রভৃতি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এ জন্য জাতীয় পর্যায়ে ত্রাণ-মজুদ কেন্দ্র স্থাপন করা যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত, নমুনা এলাকার জনপ্রতিনিধিবৃন্দের মতে বন্যাপ্রবণ এলাকায় গ্রামীণ ব্যাংক ও বেসরকারী সংস্থাসমূহের অফিস নির্মাণ এবং বন্যা ও বন্যার অব্যবহিত পরে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ প্রদান কর্মসূচি এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন সামগ্রী প্রদানে ঐ সব প্রতিষ্ঠানকে অনুরোধ জানানো যেতে পারে। এতে চড়া সুদে ঋণগ্রস্ততা ও বিপন্নতার মাত্রা হ্রাস পেতে পারে।

তৃতীয়ত, সরকারী বেশ কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের শাখা অফিস থানা পর্যায়ে রয়েছে, যারা পৃথক পৃথকভাবে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষয়-ক্ষতি-হ্রাসে এবং মহিলা ও শিশু কল্যাণে নিয়োজিত রয়েছে। যেমন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, পানি উন্নয়ন বোর্ডের শাখা অফিস, সমাজ সেবা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের শাখা অফিস (থানা পর্যায়ে) সমূহের মধ্যে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও মহিলাদের আত্মকর্ম সংস্থানমূলক কাজের মধ্যে কোন সমন্বয় নেই। এসব দপ্তরসমূহের মধ্যে

সমন্বয় ঘটিয়ে সমন্বিতভাবে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, ক্ষয়-ক্ষতি হ্রাস এবং মহিলাসহ দুঃস্থ জনগণের সংঘটিত ক্ষতি পুষিয়ে নেবার ক্ষেত্রে কাজ করার কৌশল নির্ধারণ করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

চতুর্থত, দুঃস্থ মহিলা, রোজগারী মহিলা, দরিদ্র মহিলা পরিবার প্রধান ও শিশুদের একটি তালিকা প্রণয়ন করে তাঁদের জন্য পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে কোটা নির্ধারণের বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে।

উপরি-উক্ত সুপারিশসমূহ, বিশেষ করে মহিলা ও শিশু বিষয়ক সুপারিশগুলো দেশের নীতি নির্ধারক ও প্রশাসকবৃন্দ ভেবে দেখতে পারেন এবং বন্যাপ্রবণ এলাকার বিপন্ন মহিলা ও শিশুদের কল্যাণার্থে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারেন।

উপসংহার

বাংলাদেশ তার নিজস্ব ভূ-প্রকৃতিগত কারণেই একটি বন্যাপ্রবণ দেশ। প্রতিবছর স্বল্প ও তীব্র মাত্রার বন্যা এদেশে আঘাত হানে। বন্যার ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠী নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর হয়ে চলেছে। এই নিঃস্বতা কেবল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নয়, সামাজিক, মানসিক ও দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রেও বিপন্নতা সৃষ্টি করে চলেছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি মহিলা ও শিশুগণ এদেশে অনগ্রসর, পশ্চাদপদ ও অবহেলিত শ্রেণী হিসেবে বিপন্নতার একটা বিশাল অংশ তাঁদের উপর আপতিত হয়।

মহিলা ও শিশুদের উপর বন্যার আর্থ-সামাজিক প্রতিক্রিয়া বিষয়ে এখন পর্যন্ত পৃথকভাবে কোন গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হয়নি। ফলে এই দুই গোষ্ঠী, যা বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ জুড়ে রয়েছে, তাঁদের সম্পর্কে গবেষণা ক্ষেত্রে কিছুটা শূন্যতা বিরাজমান। এই গবেষণা কিছুটা হলেও সে ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে। তাছাড়া, মহিলা ও শিশুদের আর্থ-সামাজিক প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণের সূক্ষ্মতর ক্ষেত্রে আরও গবেষণা পরিচালিত হতে পারে, যাতে তাঁদের বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে আরও প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া সম্ভব হবে।

সম্প্রতি দুর্যোগ মোকাবেলায় সরকারী ও বেসরকারী কতিপয় উদ্যোগ বেশ প্রশংসা পেয়েছে। কিন্তু এখনও বৃহৎ জনগোষ্ঠীর বিপন্নতা মুক্ত করার ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। এ কারণে আর্থ-সামাজিকভাবে সচেতনতা সৃষ্টি এবং সক্রিয়করণের সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করা না হলে এই দু'টি শ্রেণীর উন্নয়ন ও বেঁচে থাকার সংগ্রামকে সফল করা সম্ভব হবে না।

[লেখক ১৯৯৭ সালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের অধীনে এম. ফিল অভিসন্দর্ভ হিসেবে এই গবেষণা কর্মটি সম্পাদন করেন। বর্তমান নিবন্ধটি মূল অভিসন্দর্ভ অনুসরণে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রণীত।]

তথ্য নির্দেশিকা

আঞ্চলিক কার্যালয়, পানি উন্নয়ন বোর্ড। সিরাজগঞ্জ, ১৯৯৭।

আঞ্চলিক কার্যালয়, পানি উন্নয়ন বোর্ড। রাজবাড়ী, ১৯৯৭।

ইউনিসেফ, (১৯৯৩)। *বাংলাদেশের নারী ও শিশু।* ঢাকা।

থানা নির্বাহী কর্মকর্তার দপ্তর। সিরাজগঞ্জ সদর থানা, ১৯৯৭।

থানা নির্বাহী কর্মকর্তার দপ্তর। রাজবাড়ী সদর থানা, ১৯৯৭।

থানা সমাজ সেবা কর্মকর্তার দপ্তরের তথ্য। সিরাজগঞ্জ সদর থানা, ১৯৯৭।

থানা সমাজ সেবা কর্মকর্তার দপ্তরের তথ্য। রাজবাড়ী সদর থানা, ১৯৯৭।

থানা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের তথ্য। সিরাজগঞ্জ সদর থানা, ১৯৯৭।

থানা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের তথ্য। রাজবাড়ী সদর থানা, ১৯৯৭।

থানা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার দপ্তরের তথ্য। সিরাজগঞ্জ সদর থানা, ১৯৯৭।

থানা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার দপ্তরের তথ্য। রাজবাড়ী সদর থানা, ১৯৯৭।

থানা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার দপ্তরের তথ্য। রাজবাড়ী সদর থানা, ১৯৯৭।

থানা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার দপ্তরের তথ্য। সিরাজগঞ্জ সদর থানা, ১৯৯৭।

থানা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার দপ্তরের তথ্য। রাজবাড়ী সদর থানা, ১৯৯৭।

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, পরিসংখ্যান বিভাগ, (১৯৯২)। *আদম শুমারী-১৯৯১,* ঢাকা।

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, (১৯৮৮)। *টাস্ক ফোর্স রিপোর্ট-১৯৮৮,* ঢাকা।

বাংলাদেশের পানি উন্নয়ন বোর্ড, (১৯৯৫)। *বন্যপ্রবণ জেলাসমূহের তালিকা,* ঢাকা।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, (১৯৯৫)। *পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ।* ঢাকা।

মির্জা, এম, মনিরুল কাদের ও পাল, সুব্রত, (১৯৯২)। *প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বাংলাদেশের পরিবেশ।* ঢাকা ঃ সেন্টার ফর এনভাইরণমেন্টাল স্ট্যাডিজ এ্যান্ড রিসার্চ।

Alam, S. M. Nurl, (1990). *Annotation of Social Science Literature on Natural Disasters in Bangladesh.* Dhaka : PACT Bangladesh/PRIP.

Elahi, K.M. (1991). *Riverbank Erosion, Flood Hazard and Population Displacement in Bangladesh : An Overview*, In : Elahi, K. M., Ahmed K. S. and Mafizuddin, M. (eds). *Riverbank Erosion, Flood and Population Displacement in Bangladesh.* Dhaka : REIS, J. U.

Islam, A. T. M. Aminul, (1985). *History of Water Resorces Development in Bangladesh.* paper Presented at the Seminar on *'Small Scale Water Development Schemes'.* Dhaka : BWDB.

Khan, Akbar Ali, (1987). *Flood Control Since the Mardel plata Conference 1977 : Selected Economic, Social and Administrative Issues.* Paper presented at the faculty seminar of BPATC, Dhaka.

Siddique, A.B.M. (1989). *Impact of flood on the Economy of Bnagladesh.* in Mohiuddin Ahmed (ed.) *Flood in Bangladesh*, Dhaka.

পথ-শিশুদের বর্তমান অবস্থা ও সমস্যা সম্পর্কিত একটি পর্যালোচনা ঃ বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত

মিসেস মাজেদা হোসেন চৌধুরী *
ও
মিসেস তাহ্‌মিনা আখতার* *

ভূমিকা

আধুনিক বিশ্বে জ্ঞান ও প্রকৌশল প্রযুক্তির বিস্ময়কর উন্নতির পাশাপাশি দারিদ্রপীড়িত পরিবার এবং পথ-শিশুর সংখ্যা বৃদ্ধির হারও কম বিস্ময়কর নয়। জাতিসংঘের এক রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, ক্ষুধা, আশ্রয় ও স্বাস্থ্য পরিচর্যার অভাবে বিশ্বে প্রতিদিন ৩৮ হাজারেরও বেশী শিশু মারা যায় এবং প্রতিদিন আনুমানিক ১০ কোটি শিশু তাদের পরিবার কর্তৃক বিশ্বের বিভিন্ন নগরীর রাস্তায় পরিত্যক্ত হয়।[১] বাংলাদেশে ১৯৯৩ সালে এক হিসেব অনুযায়ী (১৫ বৎসরের নীচে) মোট শিশুর জনসমষ্টি ১৪২ লক্ষ শিশু-যা ২০০০ সাল নাগাদ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াবে ১৭৬ লক্ষ। উচ্চ জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে (২.২ শতাংশ) প্রতিবছর বাংলাদেশে জন্ম নিচ্ছে ৩৭ লক্ষ শিশু। তীব্র দারিদ্রের পীড়নে জর্জরিত এইসব শিশু বেঁচে থাকার ন্যূনতম মৌলিক চাহিদাসমূহ পূরণের প্রত্যাশায় জীবিকা অর্জনের জন্যে রাজপথের ভাসমান জীবনকে আবাসস্থল হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

একদিকে দারিদ্র, অপুষ্টি চিকিৎসাহীনতা, অজ্ঞতা, অশিক্ষার মত নানাবিধ কারণে প্রতিদিন বাংলাদেশে ২৪০০ জন শিশু মারা যায়; ৫ বছরের কমবয়সী এইসব মৃত শিশুর সংখ্যা দাড়ায় ৮ লক্ষ ৭০ হাজার, অন্যদিকে বেঁচে যাওয়া শিশুর ৭০ শতাংশ বাস করে দারিদ্র সীমার নীচে; ৫৬ শতাংশ শিকার হয় স্থায়ী অপুষ্টির।[২] কিন্তু এরপরও টিকে যাওয়া শিশুদের মধ্যে যে অবস্থাটি সবচেয়ে ভয়াবহ সমস্যা হিসেবে দেখা দিচ্ছে, তা হচ্ছে তাদের গৃহহীন, আশ্রয়হীন নিরাপত্তাহীন, অভিভাবকত্বহীন ও ন্যূনতম

---

* সহযোগী অধ্যাপিকা, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

* * সহকারী অধ্যাপিকা, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

অধিকারহীন রাস্তার জীবনের করুণ পরিণতি। বাংলাদেশের মত সারাবিশ্বের শহরগুলোতে এই সমস্যাটি ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠছে।

শুধু ঢাকা শহরে মোট জনসংখ্যার ৪৪ শতাংশের বয়স ১৬ বছরের নীচে এবং এ শিশুদের মধ্যে পথ-শিশুদের সংখ্যা প্রায় ৪ লাখ ৫০ হাজার, যারা নগরীর সবচেয়ে অসুবিধাগ্রস্ত শ্রেণী হিসেবে জীবন যাপন করছে।[৩] ন্যাশনাল চিলড্রেন অব এ্যাকশন এর প্রদত্ত তথ্যে দেখা যায় বাংলাদেশে শহরে ভাসমান শিশুর সংখ্যা ১৮ লাখ যাদের অধিকাংশই শিশু শ্রমিক। আগামী ২০০০ সালের মধ্যে এদের সংখ্যা ৩০ লাখে পৌছাবে। এদের বড় একটা অংশ ছিন্নমূল, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন, বেঁচে থাকার নিমিত্তে শ্রম বিক্রি করতে হয়।[৪] ঢাকা শহরে বিভিন্ন রাস্তার মোড়ে, স্টেশনে, হাইকোর্ট প্রাঙ্গনে, হাট-বাজারে, লঞ্চঘাটে, কলোনীর সিড়িতে, বিভিন্ন পার্ক প্রভৃতি স্থানে যে অসংখ্য হতভাগ্য দারিদ্রক্লিষ্ট শিশুদের দেখতে পাওয়া যায়। যাদেরকে নগরবাসী টোকাই, মিন্তি, ইংরেজী নাম 'স্ট্রীট চিলড্রেন' রাজনীতির ভাষায় 'পথকলি' প্রভৃতি নাম, বিশেষ্য বা বিশেষণে ডেকে থাকে। যারা জীবনে কোনদিন পারিবারিক ভালাবাসা, শিশুখাদ্য, শিশু চিকিৎসা, শিশুশিক্ষা ও যথার্থ শিশু বিনোদনের মুখ দেখেনি-অথচ এইসব হতভাগ্য শিশুরাও সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, আগামী প্রজন্মের নাগরিক।[৫]

অধ্যাপক মিয়া বলেন "The common characteristics of all these categories (of street childrens) are that they come form extremely poor families having migrated from rural areas work for their own survival and or to support their families for a subsistence."[৬] হেলেন রহমান তাঁর গবেষণায় দেখেছেন (১৯৯০) "They have no permanent address even on streeet where they live. They are seen in busy and active parts of the city doing various kinds of works or going through different rubbish heaps througout the city."[৭]

এই সব ভাগ্যহত শিশুদের জীবনে সমস্যা বহুমাত্রিক ও জটিল। মৌল মানবিক চাহিদার সবকটিই তাদের জীবনে অপূর্ণ ও অনুপস্থিত। টেরিডাস (সুইজারল্যান্ড) এর আওতায় বাংলাদেশের এ ধরনের শিশুদের সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা নিয়ে হেলেন রহমান পথ শিশুদের চাহিদাকে এভাবে চিহ্নিত করেছেন।[৮] (ক) মানসিক নিরাপত্তা (খ) দিনে বা রাতে ঘুমাবার জন্যে একটি নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত আশ্রয়স্থল (গ) এমন কোন নিজস্ব জায়গা যেখানে তারা তাদের সঞ্চয় নিরাপদে জমা রাখতে পারে (ঘ) শিশু বিনোদনের সুযোগ (ঙ) গোসল করা, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া ও কাপড় ধোয়ার সুবিধা (চ) চিকিৎসা সুবিধা (ছ) বিশেষ করে অসুস্থতার সময় খাদ্য ও কাপড়ের নিশ্চয়তা (জ) প্রয়োজনীয় শিক্ষা।

উপর্যুক্ত চাহিদাসমূহ পূরণের জন্য যে ব্যাপক এবং বাস্তবভিত্তিক কর্ম পরিচালনা প্রয়োজন-বাংলাদেশে এক্ষেত্রে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগ সে তুলনায় নিতান্তই

অপ্রতুল। যদিও বাংলাদেশের সংবিধানে শিশুদের অধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়েছে (দ্রষ্টব্য ১৪ ও ১৫ নং ধারা)। তাছাড়া জাতিসংঘ কর্তৃক ১৯৯০ সালে গৃহীত "শিশু অধিকার সনদে" প্রথম স্বাক্ষরকারী দেশগুলির মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। ৫৪টি ধারা সম্বলিত এই সনদে বলা হয়েছে বেঁচে থাকার অধিকার প্রতিটি শিশুর জন্মগত, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থানের অধিকার, স্নেহ-প্রীতি, ভালবাসা পাবার অধিকার, খেলাধুলা ও বিনোদনের অধিকারসহ দুর্যোগ মোকাবেলার সর্বাঙ্গীন সাহায্য পাবার অধিকার সকল শিশুর মৌলিক অধিকার।[৯]

বিশ্বব্যাপী অপেক্ষাকৃত কম সুবিধাগ্রস্ত শিশুদের উপর সবিশেষ গুরুত্বারোপের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে সরকার ইউনিসেফের সহায়তায় একটি জাতীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে সি, ই, ডি,সি, প্রোগ্রাম হাতে নিয়েছে। এছাড়া সার্কভুক্ত দেশের মধ্যে এবং জাতিসংঘের সহায়তায় শহর সমষ্টি উন্নয়ন (U.C.D) এর তত্ত্বাবধানে পথ-শিশুদের জন্যে "ড্রপ-ইন-সেন্টার" খোলার উদ্যোগ নিয়েছে। সরকারের পাশাপাশি পথ-শিশুদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কাজ করছে; তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ইউসেপ, ওয়ার্ল্ডভিশন, কনসার্ন, টেরিডোস হোমস্ (সুইজারল্যান্ড) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান। তাত্ত্বিকভাবে পথ-শিশুদের জন্যে অনেক কিছুই করার ইচ্ছা রয়েছে, সমস্যাটা হচ্ছে বাস্তবায়নে এর উদাসীনতা বা আন্তরিকতার অভাব।

বাস্তবিক অর্থে পথ-শিশুদের জন্যে (সরকারী ও বেসরকারী) কর্মসূচিগুলির মধ্যে সমন্বিত গতিশীলতা, সুনির্দিষ্ট কর্ম পরিকল্পনা, প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত তথ্য এবং কৌশলগত দিকের প্রতি বিশেষ দূর্বলতা বিদ্যমান। তাই বর্তমান সময়ে দেশব্যাপী লক্ষ লক্ষ পথ-শিশুর মৌলিক চাহিদা পূরণের যে সকল অসুবিধা পারিবারিক পর্যায়ে কিংবা গোটা আর্থ-সামাজিক কাঠামোর মধ্যে বিদ্যমান সেগুলো ক্রমশ বিলোপ সাধন করা অত্যন্ত সময়োপযোগী। এই প্রয়োজনীয়তাকে উপলব্ধি করে ঢাকা শহরের পথ-শিশুদের সম্পর্কিত সাধারণ তথ্যাবলী, এলাকাভিত্তিক অবস্থান, পারিবারিক অবস্থান ও সম্পর্ক, জীবনযাত্র র মান, আয়-ব্যয়ের ধরন, পথ-শিশুদের প্রতি সামাজিক প্রতিক্রিয়া, সমাজের প্রতি এদের মনোভাব, শিক্ষার প্রতি আগ্রহ এবং সমস্যা সমাধানে পথ-শিশুদের প্রত্যাশা ও চাহিদা ইত্যাদি সম্পর্কে কিছু নতুন, নিরপেক্ষ ও নির্ভরযোগ্য তথ্য উদঘাটন করা, যাতে করে পথ-শিশুদের সমস্যা সমাধানের কৌশল নির্ধারণ, কর্মসূচীর সম্প্রসারণ এবং নতুন কর্মসূচী প্রণয়নে অত্যন্ত কার্যকর ও অর্থবহ অবদান রাখতে পারে এবং সময়ের চাহিদায় এ বিষয়টির ফলাফল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এরই প্রেক্ষাপটে উপর্যুক্ত বিষয়ে জানার জন্য ঢাকা শহরের পথ-শিশুদের ওপর একটি জরিপ করা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য ঃ

গবেষণার মূল উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১। পথ-শিশুদের সাধারণ তথ্যাবলী, পারিবারিক প্রেক্ষাপট ও অভিভাবকত্ব সম্পর্কে জানা।

২। পথ-শিশুদের পেশা, আয় ও ব্যয় সম্পর্কে জানা।

৩। এদের বর্তমান জীবনযাত্রার বিভিন্ন দিক, যেমন ঃ খাদ্যগ্রহণ, পোষাক, স্বাস্থ্য ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, রাত্রি-যাপন, অবসর বিনোদন প্রভৃতি নিরূপণ করা।

৪। পথ-শিশুদের প্রতি সামাজিক প্রতিক্রিয়া ও সমাজের প্রতি এদের মনোভাব সম্পর্কে জানা।

৫। লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ এবং অনুভূত চাহিদা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া।

গবেষণা পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণাটি বিশ্লেষণাত্মকধর্মী, তাই গবেষণাটিতে তথ্য উদঘাটনমূলক সামাজিক নমুনা জরিপ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। ঢাকা শহরে ৮-১৬ বছর বয়সী বিভিন্ন পেশার, বয়সের ও লিঙ্গের ছেলেমেয়েদেরকে বিভিন্ন স্তরে ভাগ করে তাদের মধ্য থকে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের মাধ্যমে প্রায় সব কয়টি থানার অধীনে ১৫টি এলাকা থেকে ২৯০জন পথ-শিশুকে নমুনা হিসাবে নির্বাচন করা হয়। পূর্ব পরীক্ষার মাধ্যমে একটি কাঠামোবদ্ধ এবং মানসম্মত 'সাক্ষাতকার অনুসূচি'র মাধ্যমে ২৯০ জন শিশুর কাছ থেকে সরাসরি সাক্ষাতকার পদ্ধতিতে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়। একই সাথে তথ্য সংগ্রহকালে পর্যবেক্ষণকৃত কিছু তথ্যও প্রশ্নপত্রে সন্নিবেশিত করা হয়েছিল। এখানে উল্লেখ্য যে, ৮ বছরের কমবয়সী পথ-শিশু ঢাকা শহরে নিতান্তই কম নয়; কিন্তু উত্তরদানে অধিকাংশ শিশুই অপারগ বিধায় ৮ বছর বয়স থেকেই নমুনা হিসেবে নেয়া হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যাবলী যথাযথ সম্পাদনা করে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে শ্রেণীকরণ ও সারণীকরণ করা হয়েছে এবং সরল পরিসংখ্যানগত পদ্ধতি ব্যবহার করে একচলক ও বহুচলকবিশিষ্ট সারণীর মাধ্যমে ফলাফল বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

গবেষণা ফলাফল

বর্তমান জরিপের উদ্দেশ্যাবলী ও প্রশ্নপত্রের প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে জরিপে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। পর্যায়সমূহ নিম্নরূপ ঃ

১. পথ-শিশুদের সাধারণ, পারিবারিক ও অবিভাবকত্ব সম্পর্কিত তথ্যাবলীর বিশ্লেষণ

এক্ষেত্রে পথ-শিশুদের এলাকাভিত্তিক অবস্থান, বয়স ও লিঙ্গগত বৈশিষ্ট্য, পথ-শিশুদের পারিবারিক কাঠামো, শিক্ষা, মা-বাবার পেশাসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

১.১ পথ-শিশুদের এলাকাভিত্তিক অবস্থা ঃ ঢাকা শহরে কমবেশী বিভিন্ন এলাকায়ই পথ-শিশুরা রয়েছে। এলাকাভিত্তিক অবস্থানে দেখা যায় যে ফার্মগেট/কাওরান বাজার এলাকায় অবস্থানকারী পথ-শিশুদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী (১৩.৭৯%) এবং ধোলাইপাড় ও যাত্রাবাড়ী এলাকায় বসবাসরত পথ-শিশুদের সংখ্যা সবেচেয়ে কম (২.০৭%)। ঢাকা শহরের জনাকীর্ণ অঞ্চল, যেমন ঃ ফার্মগেট/কাওরান বাজার, আজিমপুর, কামরাঙ্গিরচর ইত্যাদি স্থানে এবং শহরের ট্রানজিট পয়েন্ট যেমন গুলিস্তান, ফুলবাড়িয়া, গাবতলী

সারণী-১

পথ-শিশুদের এলাকাভিত্তিক অবস্থান

এলাকাসমূহ	ছেলে	মেয়ে	মোট	এলাকাসমূহ	ছেলে	মেয়ে	মোট
ফার্মগেট/কাউরান বাজার	৩৬	০৪	৪০ (১৩.৭৯)	মৌচাক / মালিবাগ	০৮	০৬	১৪ (৪.৮৩)
ফুলবাড়িয়া/প্রেসক্লাব	৩৩	০২	৩৫ (১২.০৭)	লালবাগ / ইসলামবাগ	১৩	-	১৩ (৪.৪৮)
মিরপুর ১,২,৩/ চিড়িয়াখানা	২০	১১	৩১ (১০.৬৯)	নিউমার্কেট / নীলক্ষেত	১২	০১	১৩ (৪.৪৮)
কমলাপুর ষ্টেশন/মতিঝিল	২৭	০৪	৩১ (১০.৬৯)	টি,এস,সি / শাহ্বাগ	১২	০১	১৩ (৪.৪৮)
আজিমপুর/কামরাঙ্গিরচর	২৪	০৩	২৭ (৯.৩১)	সদরঘাট	০৬	০৫	১১ (৩.৭৯)
সংসদভবন / আগারগাঁও	২০	০৩	২৩ (৭.৯৩)	মোহাম্মদপুর	০৫	০২	০৭ (২.৪২)
গুলশান/বনানী/উত্তরা	১৩	০৩	১৬ (৫.৫২)	ধোলাইখাল / যাত্রাবাড়ী	০৪	০২	০৬ (২.০৭)
গাবতলী বাসষ্ট্যান্ড	১০	-	১০ (৩.৪০)				
সর্বমোট							২৯০ (১০০.০০)

(বন্ধনীর মধ্যে শতকরা হার দেখানো হয়েছে।)

ইত্যাদি স্থানে বেশীর ভাগ ছেলে পথ-শিশু (৬৫.৭১%) বসবাস করে।

মেয়েদের অবস্থান অপেক্ষাকৃত বেশী মিরপুর ১,২,৩, ও চিড়িয়াখানা এলাকায় যা মোট বালিকা শিশুর ২৪.৪৪ শতাংশ।

১.২ বয়স, ধর্ম ও লিঙ্গগত বৈশিষ্ট্য : জরিপকৃত ২৯০ জন পথ-শিশুর লিঙ্গগত বৈশিষ্ট্যে দেখা যায় যে, মেয়ে পথ-শিশুদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম, এদের সংখ্যা হচ্ছে মাত্র শতকরা ১৮.৩৩ জন, অন্যদিকে ছেলে পথ-শিশুদের সংখ্যা হচ্ছে শতকরা ৮১.৬৭ জন। উল্লেখ্য যে পর্যবেক্ষণ তথ্য ও অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্য থেকে বলা যায় যে, ঢাকা শহরের অধিকাংশ মেয়েশিশু গৃহভৃত্য ও পোষাক শিল্পে নিয়োজিত রয়েছে।

সারণী-২

পথ-শিশুদের বয়স ও লিঙ্গগত বৈশিষ্ট্যের বিবরণ

বয়স (বছর)	ছেলে	শতকরা	মেয়ে	শতকরা	মোট	শতকরা	
৮-১০	২৯	১১.৮৪	১২	২৬.৬৭	৪১	১৪.১৪	
১০-১২	৭৫	৩০.৬১	১৬	৩৫.৫৬	৯১	৩১.৩৮	
১২-১৪	৬৮	২৭.৭৬	০৬	১৩.৩৩	৭৪	২৫.৫২	৭৯.৩২
১৪-১৬	৭৩	২৯.৭৯	১১	১৬.৯৪	৮৪	২৮.৯৬	
সর্বমোট	২৪৫	৮১.৬৭	৪৫	১৮.৩৩	২৯০	১০০.০০	

X =১৫.৩৪

(সারণী-২) এ দেখা যাচ্ছে যে, পথ-শিশুদের গড় বয়স ছিল ১৫.৩৪ বৎসর। বয়স সম্পর্কিত উপাত্তে ১০-১২ বৎসর বয়ঃসীমার মধ্যে ছেলে এবং মেয়ে পথ-শিশুর সংখ্যা সবচেয়ে বেশী, শতকরা ৩১.৩৮ জন। পথ-শিশুদের সার্বিক বয়সের তালিকায় (সারণী-২) দেখা যাচ্ছে যে, ১০-১৬ বৎসর বয়ঃসীমার পথ-শিশুরা সবচাইতে বেশী। সম্মিলিতভাবে এদের সংখ্যা হচ্ছে শতকরা ৭৯.৩২ জন। পথ-শিশুদের লিঙ্গ ও বয়সগত এই বৈশিষ্ট্য আন্তর্জাতিক তথ্যমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ভারতে ৬টি শহরে সম্পাদিত একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, পথ-শিশুদের অধিকাংশের বয়স ১১-১৫ বছরের মধ্যে এবং অধিকাংশই ছেলে শিশু।[১০]

১.৩ উত্তরদাতাদের ভাইবোনদের সংখ্যা ও তাদের শিক্ষা : পথ-শিশুদের গড় ভাইবোন সংখ্যা হচ্ছে ৩.৩৪ জন। উত্তরদাতাদের পরিবারসমূহের মধ্যে ৩-৪ জন সন্তান আছে এমন পরিবারের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী (৫৫.১৭%)। ৭-৯ জন সন্তান বিশিষ্ট পরিবারের সংখ্যা সবচাইতে কম (৪.৮২%)। ২৯০টি পরিবারে মোট সন্তান সংখ্যা ৯৭২জন। এদের মধ্যে নিরক্ষর সন্তান সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী, এদের সংখ্যা হচ্ছে ৬১১ জন (৬২.৮৬%)। এরপরেই দেখা যাচ্ছে ১ম-৩য় শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাগত হারের সংখ্যা শতকরা ২৬.৬৪ জন। ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা আছে মাত্র শতকরা ৩.৮১ জনের। অবশ্য পথ-শিশুদের বয়সের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে ১০-১৪ বৎসরের বয়সী শিশুদের সংখ্যা বেশী। সুতরাং এস, এস, সি বা তদূর্ধ্ব শিক্ষাস্তরের শিক্ষিতের সংখ্যা না থাকাটাই স্বাভাবিক। উল্লেখ্য, যে ৩৬১ জন ছেলেমেয়ে শিক্ষিত তাদের মধ্যে মাত্র ৩৮.৫ শতাংশ স্কুলে যায়, বাকী ৬১.৪৯ শতাংশ স্কুলে যায় না। ২৯০টি পরিবারের সকল শিশুকে হিসেবে ধরলে তাদের মধ্যে শতকরা মাত্র ১৪.৩০ ভাগ শিশু স্কুলে যায়। বাকী ৮৫.৭০ ভাগ শিশু স্কুলে যায়না। তাছাড়া পথ-শিশুদের বাবা/মার শিক্ষার ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে, শতকরা ৮৯.৮৯ জন মা এবং শতকরা ৭২.২৫ জন বাবাই নিরক্ষর। এস, এস, সি পর্যন্ত মাত্র ১জন পথ-শিশুর বাবাই শিক্ষিত ছিলেন।

১.৪ পথ-শিশুদের মা-বাবা/অভিভাবকের পেশা : পথ-শিশুদের মা-বাবার পেশাগত বিন্যাসে দেখা যায়, বেকার বা কোন উপার্জনের সাতে জড়িত নাই এমন মা-বাবার সংখ্যাই সর্বাধিক (৩০.৫৬%)। তবে এক্ষেত্রে বাবাদের সংখ্যা হচ্ছে শতকরা ১০.৪৫ জন এবং মায়েদের সংখ্যা হচ্ছে শতকরা ৫১.৩৪। এর পরেই দেখা যাচ্ছে অন্যের বাসায় কাজ করে। চাকরি এবং কুলি/মিস্ত্রি/দিনমজুরদের সংখ্যা হচ্ছে যথাক্রমে শতকরা ১৭.৭৫ ও শতকরা ৯.৬৬ জন। এ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য, যে সব পেশার ক্ষেত্রে মায়েরা সবচেয়ে বেশী, তা হচ্ছে গৃহিনী/বেকার (৫১.৩৪%), অন্যের বাসায় কাজ করে (৩০.৮০%), ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত (১১.৯৩%) এবং কুলি বা দিনমজুর (১২.৪৪%)। অন্যদিকে বাবার ক্ষেত্রে বেশীরভাগ বাবাই রিকসা / ঠেলাচালক (১৮.৯১%), কৃষিকাজ (১২.৪৩%), কুলি/দিনমজুর (১২.৪৩%) এবং কাঁচা তরকারী, কলা ও ফুটপাতের বিক্রেতা (১৩.৪৩%), পেশাজীবীদের সংখ্যা বেশী লক্ষ্যণীয়।

অভিভাবকত্বের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে, ৯২ জন শিশুর (৩১.৭৩%) মা অথবা বাবা বা উভয়েই জীবিত থাকলেও ঢাকায় থাকে না। অভিভাবকদের মধ্যে শিশুদের মায়ের দিকের আত্মীয় স্বজন যেমন-মামা-মামী, খালা-খালু সবচাইতে বেশী। এইসব অভিভাবকরা বিভিন্ন পেশার সাথে জড়িত। এদের মধ্যে রয়েছে রিক্সা/ঠেলাচালক, ফেরীওয়ালা, দোকান/হোস্টেলের কর্মচারী, ছোট চাকুরে/টিউশনি, টেম্পু ড্রাইভার/হেলপার, রাজমিস্ত্রী/রংমিস্ত্রী, ভিক্ষুক এবং অন্যান্য।

২. পথ-শিশুদের শিক্ষা, পেশা, আয় ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্যের বিশ্লেষণ

২.১ পথ-শিশুদের শিক্ষা : পথ-শিশুদের শিক্ষা সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, ২৯০ জনের মধ্যে ২২৯ জনই (৭৯.৯৭%) নিরক্ষর। এর মধ্যে ছেলেদের সংখ্যা হচ্ছে ১৯২ জন (৬৬.২১%) এবং মেয়েদের সংখ্যা হচ্ছে ৩৭ (৮২.২২%)।

সারণী-৩

পথ-শিশুদের শিক্ষাগত যোগ্যতার বিবরণ

বিবরণ	নিরক্ষর	শিক্ষিত	১ম-৩য়	৪র্থ-৫ম	৬ষ্ঠ-৭ম
ছেলে (শতকরা)	১৯২ (৬৬.২১)	৫৩ (২১.৬৩)	৪৪ (১৭.৯৬)	০৮ (১৩.১১)	০১ (১.৬৩)
মেয়ে (শতকরা)	৩৭ (৮২.২২)	০৮ (১৭.৭৯)	০৫ (১১.১১)	০২ (৩.২৮)	০১ (১.৬৩)
মোট (শতকরা)	২২৯ (৭৯.৯৭)	৬১ (২১.০৩)	৪৯ (৮০.৩৩)	১০ (১৬.৩৯)	০২ (৩.২৮)
	n-২৯০		n=৬১		

মোট ৬১জন শিক্ষিতের মধ্যে ৫৩ জন (২১.৬৩%) হচ্ছে ছেলে এবং ৮ জন (১৭.৭৯%) হচ্ছে মেয়ে। এদের মধ্যে ১ম-৩য় শ্রেণীর শিক্ষাগত যোগ্যতার সংখ্যাই সর্বাধিক (৪৯জন)। এর পরেই রয়েছে যথাক্রমে ৪র্থ-৫ম (১০জন) ও ৬ষ্ঠ-৭ম শ্রেণী পর্যন্ত (২জন)। পথ-শিশুদের শিক্ষাগত প্রাপ্ত তথ্য আমাদের জাতীয় শিক্ষা অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যদিও এদের মধ্যে গড় শিক্ষিতের হার সঙ্গত কারণেই কম। তবে ঢাকা শহরে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থাকার কারণে এদের মধ্যে শিক্ষিতের হার তুলনামূলকভাবে বেশী।[১১] ৬১ জনের মধ্যে আবার ১১ জন জানিয়েছে, তারা স্কুলে যায়। বাকীরা স্কুলে যায় না।

২.২ পথশিশুদের পেশা ও কাজের সময় : ঢাকা শহরে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কাগজ, পলিথিন কুড়ানো, ইট ভাঙ্গা ও ফুটপাতে দোকানী, হকার, চা-স্টলের বয়, মিস্ত্রি, ফুলবিক্রি, ইত্যাদি পেশায় পথ-শিশুরা নিয়োজিত। লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে, ছেলে পথশিশুরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে কাগজ/পলিথিন কুড়ানো, ইট ভাঙ্গা (২৬.৫৩%), ফুটপাতে দোকানী ও হকার, (২৪.৫৮%) এবং মিস্ত্রি/কুলি/জুতা

পালিশ করা (২২.৮৫) ইত্যাদি পেশায় জড়িত আছে। কিন্তু সেই তুলনায় মেয়ে পথ-শিশুরা এইসব পেশার সাথে জড়িত থাকার হার খুবই কম। মেয়ে পথ-শিশু সবচাইতে পার্কে/বাজারে পানি ও ফুল বিক্রীর সাথে জড়িত রয়েছে। এদের সংখ্যা হচ্ছে শতকরা ৪৪.৪৪ জন। এরপরে শতকরা ২২.২২ জন কাগজ. পলিথিন কুড়ানো ও ইট ভাঙ্গা কাজে নিয়োজিত। মিস্ত্রি/কুলি/জুতা পালিশ/গাড়ীর গ্যারেজ হেলপার ইত্যাদি পেশায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। তবে পতিতাবৃত্তি পেশায় ৪৫ জন মেয়ের মধ্যে যে ৬জন নিয়োজিত থাকার কথা স্বীকার করেছে তাদের বয়স ১৪-১৬ বছরের মধ্যে। এদের কারোরই প্রকৃত অবিভাবক নেই এবং গড় আয় ৮০-১০০/=টাকা। ভিক্ষাবৃত্তি পেশায় নিয়োজিত ১১ জনের মধ্যে বেশীর ভাগের বয়স ৯-১০ বছর এবং এদের গড় আয় ১০-২০টাকা। অন্যান্য পেশার মধ্যে চুরি, কান পরিষ্কার করা, শরীর ম্যাসেজ করা, হাতের ও সেলাইয়ের কাজ রয়েছে। চৌর্য্যবৃত্তি পেশার শিশুরা দৈনিক ৫০/৬০ টাকা পায়, তার সবটাই ব্যয় করে হেরোইন/ফেনসিডিলের মত মারাত্মক মাদকদ্রব্য গ্রহণের পিছনে।

উত্তরদাতাদের পেশার ভিত্তিতে 'কর্মকালীন সময়' সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্যে শতকরা ৩০.৩৪ জন উত্তরদাতা (সর্বোচ্চ সংখ্যক) ৬-৯ ঘন্টা কাজ করে এবং ১৫ ঘন্টা তদূর্ধ্ব সময় ধরে কাজ করে এমন শিশুর সংখ্যা সবচেয়ে কম (৩.১%)। কর্মকালীন সময়ে ২য় স্থানে রয়েছে শতকরা ২২.৭৬ জন শিশু (৬৬জন) যাদের কর্ম সময় হচ্ছে ১২-১৫ ঘন্টা বা তদূর্ধ্ব। অমানবিক হলেও যে সব শিশুরা ১২-১৫ ঘন্টা বা তদূর্ধ্ব সময় ধরে কাজ করছে তাদের মধ্যে যথাক্রমে ২৪ জনই ফুটপাতের দোকানী/হকারের কাজ করে, ১৪ জন মিস্ত্রি/কুলি, ৭জন গাড়ীর গ্যারেজে, ৬জন ভিক্ষাবৃত্তিতে এবং ৩জন পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত। ৯-১২ ঘন্টা কাজ করে এরূপ পেশার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যথাক্রমে ১৭ জন পলিথিন/কাগজ/ইট কুড়ায়, ২৪ জন ফুটপাতে দোকানী ও হকারী পেশায় (সর্বাধিক), ১০ জন পানি ও ফুল বিক্রি করে এবং ৬ জন মিস্ত্রি/কুলির কাজ করে। কর্মজীবী শিশুদের উপর ১৯৯০ সালে পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে এরা দৈনিক গড়ে ১০ ঘন্টা কাজ করে।[১১] পথ-শিশুদের জন্য এই গড় সময় এজন্য সম্ভবত বেশী যে অধিকাংশই স্বনিয়োজিত পেশায় জড়িত যেখানে বেতন ও সময়ের নেই কোন নির্দিষ্টতা।

২.৩ পথ-শিশুদের আয়-ব্যয় : ২৯০ জন উত্তরদাতার মধ্যে ২৭৪ জনের (৯৪.৪৮%) আয়-ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য জানা গেছে এবং বাকী ১৬ জন (৫.৫২%)-এ ব্যাপারে কোন তথ্য প্রদান করেনি।

সারণী-৪

পথ-শিশুদের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত তথ্যাবলী

টাকা	দৈনিক আয় (জন)	শতকরা হার	দৈনিক ব্যয় (জন)	শতকরা হার
০-২০	৯১	৩৩.২১	১৬৪	৫৯.৮৬
২০-৪০	১৩১	৪৭.৮২	৯৮	৩৫.৭৬
৪০-৬০	৩৫	১২.৭৭	০৮	২.৯২
৬০-৮০	০৯	৩.২৮	০২	০.৭৩
৮০-তদূর্ধ্ব	০৮	২.৯২	০২	০.৭৩
সর্বমোট	২৭৪	১০০.০০	২৭৪	১০০.০০

সারণী-৪ এ দেখা যাচ্ছে যে শতকরা ৩৩.২১ জন ০-২০ টাকার মধ্যে আয় করে কিন্তু এই টাকার মধ্যে ব্যয় করে শতকরা ৫৯.৮৬জন। ২০-৪০ টাকার মধ্যে আয় করে সর্বাধিক সংখ্যক পথ-শিশু, এদের সংখ্যা হচ্ছে শতকরা ৪৭.৮২ জন এবং ব্যয় করে শতকরা ৩৫.৭৬ জন। ৮০-তদূর্ধ্ব টাকার মধ্যে আয় ও ব্যয় করে সবচেয়ে কম সংখ্যক পথ-শিশু, এদের সংখ্যা হচ্ছে যথাক্রমে ২.৯২ জন এবং ০.৭৩ জন। লক্ষ্যণীয় যে, ৫০-১০০ টাকার মধ্যে আয় করে এরূপ শিশুদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩৭ জন (১৩.৫০%)। এর মধ্যে ফুটপাতের ছোট দোকানদার/হকার ১৪ জন (৩৭.৮২), দিনমজুর/মিস্ত্রি ৮জন, কাগজ কুড়ানো ৪ জন, পতিতাবৃত্তি ৪ জন, জুতা পালিশ ২জন, অন্যান্য ৫ জন। পতিতাবৃত্তি পেশার ৬ জনের মধ্যে ৪ জনই উচ্চ আয়ের। দেখা গিয়েছে উচ্চ আয়ের শিশুদের দৈনিক ব্যয়ও তুলনামূলকভাবে বেশী।

৩. পথ-শিশুদের বর্তমান জীবন যাত্রা সম্পর্কিত তথ্যের বিবরণ

পথ-শিশুদের বর্তমান জীবনযাত্রার মধ্যে দেখানো হয়েছে এদের রাত্রি-যাপনের প্রকৃতি, রাত্রি-যাপন সম্পর্কে অভিযোগ, খাওয়া দাওয়া, অবসর-বিনোদন ইত্যাদি।

৩.১ উত্তরদাতাদের রাত্রিযাপনের ধরন, অভিযোগ ও খাওয়া-দাওয়ার প্রকৃতি : একটি পরিমিত আয়তনের আদর্শ বাসগৃহে মা-বাবা, ভাই, বোনের স্নেহের ছায়ায় নিশ্চিন্তে, নিরাপদ ও নিরুপদ্রবে ঘুমের মাঝে যে শিশুটির রাত কাটাবার কথা, সে এখন রাস্তার ধারের চটঘেরা ঝুপড়ীতে, অফিস আদালতে ও সিনেমা হলের বারান্দায় বাজারে বা ফুটপাতের খোলা আকাশের নীচে রাত্রে একাকী বা সমবয়সীদের সাথে কাটায়। এক্ষেত্রে শতকরা ৫২.৪১ জন পথ-শিশুই রাত্রিযাপন করে বস্তি, ঝুপড়ী, কলোনীতে তাদের মা-বাবার সাথে। এর মধ্যে শতকরা ৪৯.০৯ জন ছেলে এবং

শতকরা ৬৮.৮৯ জন মেয়ে পথ-শিশু রয়েছে অর্থাৎ মেয়ে শিশুদের হার ছেলেদের তুলনায় বেশী। এরপরেই শতকরা ১৬.২০ জন জানিয়েছে বিভিন্ন রেলষ্টেশন, ফুটপাত, ষ্টেডিয়ামে রাত কাটায় (এখানেও ছেলে শিশুদের অবস্থান বেশী)। খোলা আকাশের নীচে, মার্কেট, বাজার, পার্ক, মসজিদ/মন্দির, মাজারে রাত কাটায় শতকরা ১০.৩৪ জন। পতিতা ৬ জনের মধ্যে ৪জন রাত্রি যাপন করে পার্কে।

উপর্যুক্ত স্থানসমুহে পথ-শিশুরা নিরাপদে রাত কাটাতে পারে কিনা সে সম্পর্কে তাদের মতামত জানতে চাওয়া হলে ১০৮ জন (৩৭.২৪%) পথ-শিশুই রাত্রিযাপন সম্পর্কে অভিযোগ আছে বলে মন্তব্য করেছেন। অন্যদিকে ভাসমান জীবনে থেকেও রাত্রিযাপন সম্পর্কে যাদের অভিযোগ নাই এরূপ পথ-শিশুদের সংখ্যা হচ্ছে ১৮২ জন (৬২.৭৬)। এরা সবাই বাবা-মা'র সাথে থাকে তা নয়, এই সব শিশুরা রাস্তার জীবনের সাথে তাদের জীবনকে একসূত্রে গেঁথে ফেলেছে। রাত্রিযাপন সম্পর্কে পথ-শিশুদের প্রধান অভিযোগসমূহ হচ্ছে পুলিশ, নাইটগার্ড প্রমুখের হামলা, মারধর কিংবা বিরক্তি প্রকাশের অভিযোগ জানিয়েছে শতকরা ২৬.৮৫জন। শতকরা ১৯.৪৪ জন বাড়ীর লোকজন ও দোকানদারের বিরক্তির কথা ব্যক্ত করেছেন। মশার কামড়, গরম এবং বার বার জায়গা পরিবর্তন করতে হয় এমন শিশুদের সংখ্যা কম নয়, যথাক্রমে শতকরা ১৩.৮৯ এবং ১২.০৪ জন। 'বড়রা ঝামেলা করে' বলতে যৌন নির্যাতনকে বুঝাতে চেয়েছে যাদের অধিকাংশই মেয়ে শিশু (৯জন) এবং ২ জন ছেলে শিশু এ ধরনের অবস্থার স্বীকার বলে জানিয়েছে।

৩.২ পথ-শিশুদের খাওয়া-দাওয়ার ধরন : পথ-শিশুরা দিনে কয়বার খায়-এ প্রশ্নের উত্তরে শতকরা ৭০ জন পথ-শিশু দিনে ৩ বার খায় বলে জানিয়েছে মাত্র। ৫.৫২ শতাংশ শিশু জানিয়েছে যে তার দিনে ১বার খায় এবং সেটা দুপুর বা রাতে। ২৪.৪৮ শতাংশ জানিয়েছে যে তারা ২ বার খেতে পারে। উল্লেখ্য মিজানুর রহমান কর্তৃক (১৯৯০) সম্পাদিত এক জরিপে দেখা গেছে ৫৩ শতাংশ পথ-শিশু দিনে ২ বার, ৪৭ শতাংশ দিনে ৩ বার খায়।[১৩] বর্তমানে ২ বেলার চেয়ে ৩ বার খায় এরকম শিশুই বেশী। পথ-শিশুদের বেশীর ভাগ অংশই বাসায় খায় বলে জানিয়েছে। এদের সংখ্যা হচ্ছে শতকরা ৩৮.৯৭ জন। উল্লেখ্য যে, পূর্বেই দেখা গিয়েছে যে বেশীর ভাগ শিশু মা-বাবার সাথে থাকে বিধায় পরিবারের সাথে খায়। এর পরেই হোটেলে এবং ফুটপাতে খায় যথাক্রমে শতকরা ৩৩.৭৯ ও ১৬.২১ জন। অন্যান্য স্থান বলতে ভিক্ষা করা, মাজারের শিরনী খাওয়া, বিয়ে বাড়ীতে চেয়ে খাওয়া ইত্যাদি।

৩.৩ পথ-শিশুদের অবসর বিনোদন : পথ-শিশুরা বঞ্চনা ও মৌল অধিকারহীন রাস্তার জীবনে থেকেও কাজের পর অবসর সময়ে বিভিন্ন বিনোদন মাধ্যমগুলির দ্বারা জীবনকে উপভোগ করে। তবে ঢাকার পথ-শিশুরা একাধিক সুযোগ/সুবিধার মধ্যে অবসর সময়কে কাটানোর যে সুযোগ পেয়ে থাকে তা গ্রাম ও জেলাশহর গুলোতে

অত্যন্ত সীমিত পর্যায়ে রয়েছে। পথ শিশুরা কাজের অবসরে কি ধরনের বিনোদন করে থাকে জানতে চাওয়া হলো দেখা গিয়েছে, শতকরা ৭৭.২৪ জন শিশুই একাধিক বিনোদন মাধ্যমকে ব্যবহার করে। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যাচ্ছে যে শতকরা ৭৩.৪৫ জন শিশুই কোন পূর্ব পরিকল্পনা বা খেলাধুলার সামগ্রী ছাড়া কাজের অবসরে খেলাধুলা করে। শতকরা ৫৪.৮৩ জন শিশু বিভিন্ন ক্লাবে, বস্তিতে এবং টিভি মেরামতের দোকানে নিয়মিত টেলিভিশন দেখে থাকে। হলে সিনেমা ও ভি,সি, আর, দেখে যথাক্রমে শতকরা ৩৬.২১ ও ২৫.৭১ জন। অবশ্য অপ্রাপ্তবয়স্ক বেশ কয়েকজন ছেলে পথ-শিশু নিয়মিত অশ্লীল সিনেমা ও ভিডিও দেখে থাকে। শতকরা ৩৭.২৪ জন পথ-শিশু বিভিন্ন এলাকা থেকে শিশু পার্কে আসে।

প্রাপ্ত তথ্য থেকে অনুমান করা যায় যে, পথ-শিশুরা বিনোদনের জন্য বিভিন্ন মাধ্যম চায়।

৪. পথ-শিশুদের প্রতি সামাজিক প্রতিক্রিয়া ও সমাজের প্রতি এদের মনোভাব সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণের ফলাফল

পথ-শিশুরা পুলিশ ও সমাজের সাধারণ লোকের কাছ থেকে কেমন ব্যবহার পায়-সে সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে শতকরা ৩৮.৬২ জন পুলিশের কাছ থেকে এবং শতকরা ২৪.৮৩ জন সাধারণ লোকের কাছ থেকে 'খুবই খারাপ ব্যবহার' পেয়ে থাকে বলে মতামত প্রকাশ করেছে। আবার প্রায় সমসংখ্যক (৩৯.৩১%) জানিয়েছে পুলিশ তাদের সাথে 'ভালো ব্যবহার করে'। তবে সাধারণ লোকের কাছ থেকে 'ভালো ব্যবহার পায়' এরূপ উত্তরদাতার সংখ্যা হচ্ছে সর্বাধিক (৬২.৭৬%)।

সারণী-৫

পথ-শিশুদের প্রতি পুলিশ ও সাধারণ লোকের ব্যবহারের ধরন

ব্যবহার	পুলিশ	সাধারণ লোক	পুলিশ ও সাধারণ লোক
ভালো ব্যবহার	১১৪(৩৯.৩১)	১৮২(৬২.৭৬)	২৯৬(৫১.০৩)
সাধারণ ব্যবহার	৬৪(২২.০৭)	৩৬(১২.৪১)	১০০(১৭.২৪)
খারাপ ব্যবহার	১১২(৩৮.৬২)	৭২(২৪.৮৩)	১৮৪(৩১.৭২)
মোট	২৯০(১০০)	২৯০(১০০)	৫৮০(১০০)

(বন্ধনীর মধ্যে শতকরা হার দেখানো হয়েছে)

উত্তর দাতা শিশুরা অর্থনৈতিক নির্যাতনের শিকার হয় কিনা সে প্রশ্নের উত্তরে ৩০.৭৬ শতাংশ শিশু বিভিন্ন নির্যাতনের শিকার হয় বলে জানিয়েছে। এদের প্রায় অর্ধেক (৪৫) শিশুকে নিয়মিতভাবে মহল্লায় মাস্তান বা গুন্ডাদেরকে চাঁদা দিতে হয়। পুলিশকে চাঁদা দিতে হয় বলে জানিয়েছে ৮.১১% শিশু। লঞ্চঘাট, রেলষ্টেশন, বাস টার্মিনাল ইত্যাদি স্থানে কুলি, সর্দার, চোর বা পকেটমারের কবলে পড়ে শতকরা ৬.২০ জন।

৫. প্রাপ্ত মজুরী সম্পর্কে পথ-শিশুদের অভিমত

৫.১ প্রাপ্ত মজুরীর হার ও প্রকৃত প্রাপ্তি : বাংলাদেশে নয়, পৃথিবীর সর্বত্রই দেখা যায় যে, শিশু শ্রমিকদের নির্ধারিত সময়ের চেয়ে অনেক বেশী সময় ধরে কাজ করানোর পরও ন্যায্য মজুরী দেয়া হচ্ছে না। বর্তমান জরিপে 'কাজের বিনিময়ে ন্যায্য মজুরী পাচ্ছে কিনা' সে সম্পর্কে শতকরা ৬০.৫৫ জন পথ-শিশু ঠিকমত মজুরী পায় বলে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে। শতকরা ৩৯.৪৫ জন পথ-শিশু তাদের প্রাপ্ত মজুরীর ব্যাপারে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। তাদের এই অসন্তুষ্টির বেশ কিছু কারণ আছে। সবচেয়ে বেশী অসন্তুষ্ট চা, পানি, ভাত ও ফুল বিক্রি পেশায় নিয়োজিত শিশুরা (৩৬.২৩%)। তারা জানায়, অনেক সময় ক্রেতারা দাম না দিয়ে চলে যায় এবং ছোট বলে কম দাম দিয়ে থাকে। কাগজ বিক্রেতা শিশুরা জানায় (২৯.৬৭%) কাগজ কেনার সময় আড়তদাররা ওজনে ফাকি দেয়। পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত শিশুরা (১০.২৫%) জানায় অনেক সময় কাজ মিটে গেলে চুক্তিকৃত টাকা পুলিশের ভয় দেখিয়ে কম দেয় বা একেবারেই দেয় না। দোকান কর্মচারীরা ও হোটেল বয়রা অনেক সময় মালিক কর্তৃক উপযুক্ত বেতন পায় না বলে জানিয়েছে (১৮.৫৫)। ২ জন রিক্সাচালক (৫.১২) বলেছে মাস্তানরা রিক্সা ভাড়া না দিয়ে অধিকাংশ সময় চলে যায়। সুতরাং উপর্যুক্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে এই সিদ্ধান্তে পৌছান যেতে পারে যে, পথ-শিশুদের জন্যে যতই আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ে উদ্যোগ নেয়া হউক না কেন, তাদের প্রতি এখন পর্যন্ত নাগরিক সচেতনতাবোধ সমাজে সৃষ্টি হয়নি। এরা আর্থিক নির্যাতন ও বঞ্চনার শিকার অর্থাৎ পথ-শিশুদের প্রতি সামাজিক প্রতিক্রিয়া বর্তমানে যথেষ্ট নেতিবাচক।

৫.২ সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত সমবয়সীদের প্রতি উত্তর দাতাদের মনোভাব : সমবয়সী সুযোগ-সুবিধাপ্রাপ্ত ছেলে-মেয়েদের প্রতি পথ-শিশুদের মনোভাবে দেখা যায়, শতকরা ৪৯.৬৬ জন শিশু "ঐসব শিশুদের মত সুযোগ-সুবিধা পেতে ইচ্ছা করে" বলে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। নিজেদের দূরবস্থার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করেছে শতকরা ১২.৭৬ জন শিশু। শিশু অধিকারের এই ব্যাপারটিকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়েছে শতকরা ১০.৩০ জন (সারণী-৬)। শিশুদের ব্যক্ত প্রতিক্রিয়াসমূহের মাধ্যমে বলা যায় যে, প্রতিটি শিশুর যে মৌলিক অধিকার পূরণের দায়িত্ব রাষ্ট্রের-এ ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ অসচেতন ও রাষ্ট্র থেকে তাদের কোন প্রত্যাশাও নেই।

সারণী-৬

সমবয়সী সুযোগ সুবিধাপ্রাপ্ত ছেলে/মেয়েদের প্রতি পথ-শিশুদের মনোভাব

প্রতিক্রিয়াসমূহ	ছেলে	মেয়ে	মোট	শতকরা হার
কোন প্রতিক্রিয়া নেই	৪৫	০৮	৫৩	১৮.২৮
ওদের মত হতে ইচ্ছা করে	১২৫	১৯	১৪০	৪৯.৬৬
নিজের অবস্থা দেখে দুঃখ হয়	৩১	০৬	৩৭	১২.৭৬
আল্লাহ ওদেরকে ধনী করেছে	২৫	০৫	৩০	১০.৩৪
ওদের দেখলে ভাল লাগে	১৬	০৫	২১	৭.২৪
ওদের সাথে তুলনা হয় না	০৩	০২	০৫	১.৭৩
মোট	২৪৫	৪৫	২৯০	১০০

৬. পথ শিশুদের লেখাপড়া শেখার আগ্রহ, অনুভূত চাহিদা ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা

৬.১ পথ-শিশুদের লেখাপড়া শেখার আগ্রহ : যে শিশুটি হাতে বই নিয়ে স্কুল যাবে, দেশে শিক্ষিত নাগরিক হয়ে উঠবে, কিন্তু আর্থ-সামাজিক প্রতিবন্ধকতা তাকে দিয়েছে জীবিকা অর্জনের জন্য রাজপথ। এইসব অসুবিধাগ্রস্ত পথ-শিশুদের যে লেখাপড়ার প্রতি প্রচন্ড আগ্রহ রয়েছে তা বর্তমান জরিপকৃত তথ্যে উদঘাটিত হয়। পথ-শিশুদের লেখাপড়া শেখার আগ্রহ আছে কিনা এই প্রশ্নে ৭৮.২৮% শিশু ইতিবাচক মতামত প্রকাশ করেছে, কেবল ২১.৭২% শিশু নেতিবাচক মতামত প্রকাশ করেছে। যারা লেখাপড়া শিখতে চায় না তাদের নেতিবাচক মনোভাবের কারণ সম্পর্কে জানা যায় যে, (ক) গরীব বলে লেখাপড়া সম্ভব নয় (৩০.১৬) (খ) পড়াশুনার বয়স নেই (১৫.৮৭%) (গ) ভাগ্যহত জীবনে লেখাপড়ার কোন গুরুত্ব নেই (০৯.২৯) (ঙ) লেখাপড়া ভাল লাগে না (১৪.২৮) (চ) চেষ্টা করেছি হয় না (১২.৭০) (ছ) মা/বাবা দেয় না (১২.৭০)।

৬.২ পথ-শিশুদের অনুভূত চাহিদা : বয়স্কদের তুলনায় শিশুদের চাহিদা ভিন্নধর্মী। এজন্য পথ-শিশুদের অনুভূত চাহিদাগুলি সম্পর্কিত তথ্য উদঘাটন বর্তমান জরিপের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। এই কারণে প্রাপ্ত অনুভূত চাহিদাগুলি সম্পর্কিত তথ্য বিভিন্ন কর্মরত প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মসূচী প্রণয়নে দিক নির্দেশনায় সহায়তা করবে।

তথ্যে দেখা যায় যে, সর্বাধিক সংখ্যক উত্তরদাতা শতকরা ২৮.৬২ জনই অবসর সময়ে পড়াশুনা করতে চায়। ২৩.১০% অবসর সময়ে যে কোন ধরনের কাজ শিখতে চায়-যা তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা আনবে। ১২-১৬ ঘন্টা কাজ করে এরূপ

২২.৭৬% শিশু অবসর সময়ে একটু বিশ্রাম নিতে চায়। অবসর সময়ে সাংস্কৃতিক বিনোদনে কাটাতে চায় ৬.২১% জন শিশু। অনুভূত চাহিদার ক্ষেত্রে যে বিষয়টি লক্ষ্যণীয় তা হচ্ছে, ছেলেদের ক্ষেত্রে অধিকাংশ লেখাপড়া ও কাজ শিখতে চায়, অন্যদিকে মেয়েদের ক্ষেত্রে বেশী সংখ্যক (২৪.৪৪%) বিশ্রাম নিতে চায়, এরপরে পড়াশুনা ও খেলাধুলা উল্লেখযোগ্য।

৬.৩ পথ-শিশুদের ভবিষ্যত পরিকল্পনা : পথ-শিশুরা ভবিষ্যত জীবনে কি করতে চায় এর উত্তরে শতকরা ৪৩.১০ জন শিশু বড় হয়ে চাকরি করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। 'লেখাপড়া শিখে মানুষের মত মানুষ হতে চায়' শতকরা ১৬.৯০জন শিশু এবং শতকরা ১৪.৪৮ জন বর্তমান পেশা থেকে টাকা জমিয়ে 'ভবিষ্যতে ব্যবসা করতে চায়' বলে জানিয়েছে। যে সব শিশু বাস টার্মিনালে বা বাসষ্ট্যান্ডে থাকে বা গাড়ীর গ্যারেজে কাজ করে, সে সব পথ-শিশু বাস, টেম্পো, গাড়ীর ড্রাইভার হতে চায় (৪.৪৮%), গাড়ী, টিভির মেকানিক হতে চায় (৪.৪৮%), দক্ষ শ্রমিক হতে চায়(২.০৭%)। ২জন পথ শিশু পুলিশ হতে চায়, কারণ তারা পুলিশ কর্তৃক নির্যাতিত। অন্যান্যরা খেলোয়াড় বা শিল্পী হবে বলে জানিয়েছে (সারণী-৭)।

সারণী-৭
পথ-শিশুদের ভবিষ্যত আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কিত মত

ভবিষ্যত আকাঙ্ক্ষাসমূহ	ছেলে	মেয়ে	মোট	শতকরা হার
বড় হয়ে চাকরি করবে	১১৩(৪৬.১২)	১২(২৬.৬৬)	১২৫	৪৩.১০
লেখাপড়া শিখে মানুষ হবে	৩৯(১৫.৯২)	১০(২২.২২)	৪৯	১৬.৯০
টাকা জমিয়ে ব্যবসা করবে	৩৮(১৫.৫১)	.০৪ (০৮.৮৯)	৪২	১৪.৪৮
বাস, টেম্পো, গাড়ীর ড্রাইভার হবে	১৩(০৫.৩১)	০	১৩	৪.৪৮
মিল/কারখানার দক্ষ শ্রমিক হবে	০৩(০১.২২)	০৩ (০৬.৬৭)	৬	২.০৮
রিকসা চালাবে	০৩ (০১.২২)	০	০৩	১.০৩
অন্যান্য (শিল্পী, খেলোয়াড়, পুলিশ, সেলাইয়ের কাজ শেখা)	০৫ (০২.০৪)	০	০৫	১.৭২
রেডিও, টিভি, মেরামতের মেকানিক হবে	১৩ (০৫.৩১)	০	১৩	৪.৪৮
কোন পরিকল্পনা নাই	১৮(৭.৩৫)	১৬(৩৫.৫৬)	৩৪	১১.৭২
মোট	২৪৫ (১০০.০০)	৪৫ (১০০.০০)	২৯০	১০০.০০

(বন্ধনীর মধ্যে শতকরা হার দেখানো হয়েছে)

ভবিষ্যত পরিকল্পনা সম্পর্কে যে বিষয়টি লক্ষ্যণীয় তা হচ্ছে ১১.৭২% পথ-শিশু জানিয়েছে তাদের কোন ভবিষ্যত পরিকল্পনা নেই, এর মধ্যে ৩৫.৫৬% হল মেয়ে পথ-শিশু। ছেলেদের মধ্যে এই হার মাত্র ৭.৩৫%। এইসব পথ-শিশু জীবন সম্পর্কে হতাশ, কারণ তারা মনে করে ভবিষ্যতে তারা আরো অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতার সম্মুখীন হবে। আবার যেখানে ৪৬.১২% ছেলে বড় হয়ে চাকরি করবে এই আশা পোষণ করে সেখানে মেয়েদের সংখ্যা ২৬.৬৬%। একইভাবে লেখাপড়ার পরিকল্পনা যেখানে ছেলেদের ১৫.৯২, সেখানে মেয়েদের ক্ষেত্রে মাত্র ২.২২%। প্রাপ্ত তথ্যে সিদ্ধান্ত উপনীত হওয়া যায় যে, শিশুকাল থেকেই ছেলে শিশুদের তুলনায় মেয়ে শিশুরা জীবন ও ভবিষ্যত সম্পর্কে অসচেতন।

উপসংহার

সার্বিক জাতীয় উন্নয়নের স্বার্থে শিশুশ্রম সমস্যাটি নিয়ে ব্যাপকভাবে চিন্তাভাবনা ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কেবল আন্তর্জাতিক নীতিমালা এবং আইনের কঠোর প্রয়োগের মাধ্যমে পদক্ষেপ গ্রহণে সমস্যার সমাধানে তাৎপর্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে না। কেননা শিশুশ্রম মূলত এদেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। সমস্যাটি কেবল ঐ সব শিশু ও তাদের পরিবারের নয়, নয় সরকারের ও সমাজ কল্যাণ সংস্থাগুলোর, এটি দেশের সকলেরই সমস্যা। শিশু সে যেই হোক, যারই হোক, সে আমাদের সন্তান ও এ দেশের ভবিষ্যত। এদের প্রতি আমাদের সবাইকে হতে হবে আন্তরিক সহানুভূতিশীল ও দায়িত্ববান। জনসাধারণ, পথচারী, দোকানদার, পৌর কর্মকর্তা, এমনকি পুলিশ সদস্যের মধ্যে পথ শিশুদের দুরবস্থা, তাদের অধিকার, তাদের প্রতি সমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। এর জন্যে প্রয়োজন প্রচার ও উদ্বুদ্ধকরণ প্রক্রিয়া। গণমাধ্যমগুলি এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

সবশেষে পথ-শিশু সমস্যাকে জাতীয় পরিকল্পনা, সামাজিক উন্নয়ন ও সমগ্র উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাথে এর একটা অর্থবহ সংযোগ রেখে সচেষ্ট হতে হবে বিদ্যমান সংখ্যার সাথে নতুন কোন পথ-শিশু যেন যুক্ত না হয়। অন্যদিকে যারা ইতোমধ্যে এই জীবনে এসে পড়েছে; নিশ্চিত করতে হবে তাদের অধিকার। এর জন্য প্রয়োজন সরকারী মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলোর সাথে শিশু অধিকার ফোরাম, শিশুকল্যাণ পরিষদ, ইউনেস্কো, ইউনিসেফ এবং সংশ্লিষ্ট বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সুসমন্বিত ও সুপরিকল্পিত বাস্তবধর্মী কর্মপ্রয়াসের, যাতে পথ-শিশুদের জীবন নতুন মাত্রায় অর্থবহ হয়ে উঠতেপারে, হতে পারে এদেশের গর্বিত মানব সন্তান ও যোগ্য নাগরিক।

তথ্য নির্দেশিকা

১। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়,(১৯৯১), *নির্বাচিত পরিসংখ্যান সিরিজ* (নি,প,সি), সেপ্টেম্বর, ১৯৯১।

২। লুব্ধক; *স্থান কাল পাত্র,* দৈনিক ইত্তেফাক, ১২ অগ্রহায়ন, ১৩৯৬

৩। কামাল সিদ্দিকী ও অন্যান্য *"ঢাকা নগরীতে সাড়ে চার লাখ টোকাই,* (দৈনিক বাংলা, ২০শে আগষ্ট, ১৯৯২, পৃঃ১২)।

৪। Dr. Ahmadullah, *Working and street children challenge to and potentials of Social Work.* (South Asia Workshop on Street Children Organized by Tata Institute of Social Science) Bombay, India, April, 21-26, 1992.

৫। খান, মিজানুর রহমান, *"আন্তর্জাতিক নীতিবোধ ও বাংলাদেশী শিশু,* (সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ২৯ বর্ষ, ৩৭ সংখ্যা, জানুয়ারী ২৯, ১৯৯৩, পৃঃ ৪১)।

৬। কামাল, হোসনে আরা,(১৯৮৯), *"পরিবারে একক দায়িত্বে দুঃস্থ নারী-জীবন ও সংগ্রাম,* সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৭। Dr. Ahmadullah, *Working and street children challenge to and potentials of Social Work,* (South Asia Workshop on Street Children, Opcit, 1992.)

৮। Rahmn, Helen, *Working with street children in Dhaka* (Project Experience on T. H) In Touch, VITSS Health News Letter, Vol-ix, No-96, Nov-1990, P-38.

৯। প্রাগুক্ত।

১০। বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম, *"শিশু অধিকার সনদ"* ধারা ও প্রস্তাবসমূহের বাংলা প্রকাশনা।

১১। স. কবীর ও অন্যান্য, (১৯৯০), *"দি সিচুয়েশন অব চাইল্ড লেবার ইন বাংলাদেশ"*।

১২। প্রাগুক্ত।

১৩। খান মিজানুর রহমান, *"আন্তর্জাতিক নীতিবোধ ও বাংলাদেশী শিশু"* সাপ্তাহিক বিচিত্রা ২১ বর্ষ, ৩৭ সংখ্যা, জানুয়ারী ২৯, ১৯৯৩, পৃঃ ৪১।

নির্যাস লেখার কৌশল

মোঃ শফিকুল হক *

নির্যাস বা abstract হচ্ছে কোন একটি বই, গবেষণা প্রতিবেদন বা প্রবন্ধের অন্তর্নিহিত রস, সারবত্তা বা সার-সংক্ষেপ। একাডেমিক গবেষণায় সাধারণভাবে নির্যাসের ইংরেজী প্রতিশব্দ হিসেবে Abstract শব্দটি ব্যবহার করা হয়। একটি গবেষণা প্রতিবেদন, থিসিস বা অভিসন্দর্ভের আবশ্যকীয় অংশ হচ্ছে নির্যাস। নির্যাস সাধারণত গবেষক বা লেখক নিজেই লিখে থাকেন। নির্যাসের ইংরেজী প্রতিশব্দ হিসেবে Summary, digest, Precis, Synopsis, eptome ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

নির্যাস হচ্ছে এটি গবেষণার ক্যাপসুল যা গবেষণা প্রতিবেদন লেখা সম্পন্ন হবার পর লেখা হয়ে থাকে। গবেষণা কার্যটি কিভাবে সম্পাদিত হয়েছে অর্থাৎ গবেষণায় কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে এবং গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলসমূহ বা সুপারিশসমূহ নির্যাস থেকে জানা যায়। নির্যাস হচ্ছে একটি বড় প্রতিবেদনের সংক্ষিপ্তসার যেখানে প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্য, ফলাফল, উপসংহার ও সুপারিশমালার উল্লেখ থাকে।

নির্যাসের আবশ্যকীয় উপদানসমূহ

একটি নির্যাসের ৬টি আবশ্যকীয় উপাদান রয়েছে (Olsen and Thomas 1983:182)ঃ

- গ্রন্থপঞ্জীয় তথ্য (যদি মূল প্রতিবেদন ছাড়া নির্যাস আলাদাভাবে উপস্থাপন করা হয়)
- অধীত সমস্যা/সমস্যাসমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
- গৃহীত গবেষণা পদ্ধতি
- গবেষণার ফলাফল
- উপসংহার
- সুপারিশমালা (ঐচ্ছিক)।

---

* গবেষণা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

নির্যাসের উদ্দেশ্য

- নির্যাস পাঠককে মূল প্রতিবেদনটি পড়া বা না পড়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে। নির্যাস পড়ে পাঠক মূল প্রতিবেদনটি পড়ার প্রয়োজনীয়তা আছে কি না সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।
- ব্যস্ত পাঠক কিংবা ব্যবস্থাপক যাঁদের পক্ষে পুরো প্রতিবেদনটি পড়ার মত সময় নেই, নির্যাস তাঁদেরকে আবশ্যকীয় তথ্যের যোগান দেয়।
- নির্যাসে জরুরী তথ্যসমূহ থাকে, যা পাঠক কিংবা গবেষককে তাঁর কাজের সংশ্লিষ্টতা নির্ধারণে সহায়তা করে।
- নির্যাস পাঠকের সাথে যোগাযোগের সাশ্রয়ী পথ। নির্যাস সময়, কাগজ, শ্রম ও অর্থ সাশ্রয় করে, বিশেষত যখন প্রতিবেদনের আয়তন ৫০ বা ততোধিক পৃষ্ঠা হয়।
- নির্যাস প্রবন্ধ বা প্রতিবেদনের বিষয়বস্ত সম্পর্কে পাঠককে দ্রুত ধারণা অর্জনের সুযোগ করে দেয়।
- কোন প্রতিবেদনের মৌলিক বিষয় সম্পর্কে ধারণা পেতে আগ্রহী পাঠকদের জন্য নির্যাস যথেষ্ট হতে পারে।
- নির্যাস অবশ্যই স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সহজবোধ্য হবে, যা ব্যস্ত পাঠক মুল প্রতিবেদন পাঠ না করেই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ অবহিত হতে পারেন।
- একটি সুলিখিত নির্যাসের সাহায্যে প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু অনেককে জানিয়ে দেয়া যেতে পারে।
- একটি অন্বেষার পরিধি ও স্বয়ংপূর্ণ ফলাফলের কংক্রিট বর্ণনা নির্যাসে প্রতিফলিত হয়ে থাকে।
- গুরুত্বপূর্ণ আলোচনানুষ্ঠানে উপস্থিত প্রবন্ধ পাঠক/ব্যবস্থাপকের সামনে মৌখিক উপস্থাপনার ভিত্তি হিসেবে নির্যাস ব্যবহৃত হতে পারে।
- নির্যাস সহজেই অনেকের মাঝে বিতরণ করা যায়।
- কী বিষয়ে গবেষণা করা হয়েছে সে সম্পর্কে নির্যাস ধারণা দেয়।
- নির্যাসের কাঠামো থেকে একজন পাঠক মূল প্রতিবেদনের আকৃতি সম্পর্কে ধারণা পেতে পারেন।

নির্যাস লেখার পদক্ষেপসমূহ

নির্যাস হচ্ছে নির্ধারিত বিষয় বা সমস্যা/সমস্যাসমূহের বিবৃতি, গবেষণায় গৃহীত পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া এবং প্রাপ্ত ফলাফলের সার সংক্ষেপ (Harring and Lounsbury 1971 : 86)। নির্যাস লেখা একটি শিল্প। এর জন্য প্রয়োজন হয় পঠন, লিখন ও সম্পাদনায় দক্ষতা (Golen, Pearce, and Figgins, 1985 : 275)।

১। পঠন **(Reading)** ঃ একটি নির্যাস লেখার পূর্বে মূল প্রতিবেদনটি যত্নের সাথে আদ্যপ্রান্ত পাঠ করা জরুরী। এর ফলে মূল বিষয়টি অনুধাবন ও কার্যকর সারসংক্ষেপন সহজ হয়।

২। নির্বাচন ও নিম্নরেখ **(Selecting and Underlining)** : মূল প্রতিবেদনটি দুই বা ততোধিকবার পড়ার পরবর্তী পদক্ষেপ হচ্ছে প্রধান উপজীব্য বিষয়গুলো নির্বাচন ও নিম্নরেখ প্রদান। এ পর্যায়ে কেন্দ্রীয় ধারণা চিহ্নিত করে কম গুরুত্বপূর্ণ সকল কিছু বাদ দেয়া প্রয়োজন হয়।

৩। লিখন **(Writing)** ঃ নির্যাস লেখার তৃতীয় ধাপে নির্বাচিত বিষয়গুলো আলাদা কাগজে লিখে নিতে হয়।

৪। সম্পাদনা **(Editing)** ঃ চতুর্থ পর্যায়ে নির্বাচিত বিষয়গুলো সম্পাদনা শেষে নিজ ভাষায় পুনর্লিখনের প্রয়োজন হয়। এ পর্যায়ে গবেষণার উদ্দেশ্য, পরিধি ও প্রধান ফলাফলগুলো সংক্ষেপে উপস্থাপন করতে হয়।

৫। তুলনা ও পুনর্লিখন **(Comparing and Rewriting)** ঃ সঠিকতার জন্য লিখিত নির্যাসকে এ পর্যায়ে মূল প্রতিবেদনের সাথে মিলিয়ে নিতে হয় এবং প্রয়োজনে পুনর্লিখন করতে হয়।

৬। ডকুমেন্টেশন **(Documentation)** ঃ নির্যাস অন্য কারো কাজের উপর লিখতে হলে সেক্ষেত্রে গ্রন্থপঞ্জি লেখার নিয়মে সূত্র উল্লেখ করতে হয়। এ ছাড়াও মূল প্রতিবেদন থেকে আলাদাভাবে নির্যাস উপস্থাপন করা হলে গ্রন্থপঞ্জীয় তথ্য উপস্থাপন করতে হয়।

নির্যাসের আয়তন

নির্যাসের আয়তন নিয়ে কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। এটি একটি বাক্য হতে পারে, আবার কয়েক হাজার শব্দের মধ্যেও হতে পারে। নির্যাসের উদ্দেশ্যের দ্বারা এর আয়তন নির্ধারিত হয়। এছাড়াও গবেষণা প্রতিবেদন এবং এর অধীত সমস্যা, গবেষণা পদ্ধতি ও ফলাফলের উপর নির্যাসের আয়তন নির্ভর করে। গবেষকদের কাছে নির্যাসের সাধারণভাবে স্বীকৃত আয়তন হচ্ছে মূল প্রতিবেদনের ২ থেকে ৫ শতাংশ। জার্ণালের প্রবন্ধের ক্ষেত্রে এই আয়তন ১৪০ থেকে ৩৫০ শব্দ পর্যন্ত হওয়া

উচিত। থিসিস বা গবেষণা প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে নির্যাসের আয়তন ৫০০ থেকে ১০০০ শব্দ পর্যন্ত হয়ে থাকে।

নির্যাস সাধারণত Single Space-এ প্যারাবিহীনভাবে বিন্যস্ত হয়ে থাকে। তবে একাধিক প্যারায় বিন্যস্ত নির্যাসও অপ্রচলিত নয়। প্রচলিত নিয়মানুযায়ী গবেষণা প্রতিবেদন, থিসিস অথবা অভিসন্দর্ভের শিরোনাম-পৃষ্ঠার অব্যবহিত পরের পৃষ্ঠায় নির্যাস উপস্থাপন করা হয়।

তথ্য সূত্র

1. Adams, Gerald R. and Jay D. Schvaneveldt. (1985). *Understanding Research Methods*. New York : Long man.
2. Anderson, C. R., Alta. Gwinn Sanders and Francis William's Weeks. (1957). *Report Writing*. New York: McGraw-Hill.
3. Douglas, Paul. (1957). *Communication Through Reports*. New Jersey : Prentice-Hall.
4. Dumont, R.A. and John M. Lannon. (1985). *Business Communication*. Boston:Little, Brown & Company.
5. Elahi, K.M. (1980). *Preparation of Abstract*. (Handout) Dhaka : Jahangirnagar University.
6. Gallagher, William J. (1969). *Report Writing For Management*. Massachusetts: Addition-Wesley Publishing Company.
7. Golden, Perch, and Figgins. (1985). *Report Writing For Business and Industry*. New York : John Wiley & Sons.
8. Haring, L. Lloyd, and John F. Lounsbury. (1971). *Introductions to Scientific Geographic Research*. Dubuque : W.M.C. Brown.
9. Mining, J. H., and C. W. Wilkinson. (1967). *Communicating Through Letters And Reports*. Ilinois : Rechard D. Irwin.
10. Murphy, H. A., and Charles E. Peak. (1976). *Effective Business Communications*. New Delhi : Tata McGraw-Hill.
11. Olsen, L. A., and Thomas N. Huchkin. (1983). *Principles of Communication For Science and Technology*. New York: McGraw-Hill.
12. Saklare, Armold B. (1964). *Creative Report Writing*. New York: McGraw-Hill.
13. Sharman, R. C. and Krishna Mohan. (1978). *Business Correspondence and Report Writing*. New Delhi: Tata McGraw-Hill.
14. Waldo, W. H. (1965). *Better Report Writing*. New York: Rein hold Publishing Corporations.

লোক প্রশাসন সাময়িকী
দশম সংখ্যা, ডিসেম্বর ৯৭, পৌষ ১৪০৪

শরীর সুস্থ রাখার জন্য কয়েকটি ব্যায়াম

মুহাম্মদ মসিউর রহমান *

ভূমিকা

'সুস্থ দেহে সুন্দর মন' এই গ্রীক প্রবাদটি আমরা জানি। সুন্দর জীবন যাপনের জন্য সুস্থ দেহের কোন বিকল্প নেই। শারীরিক সুস্থতার উপরই মানব জীবনের উন্নতি, সুখ ও ঐশ্বর্য্য নির্ভর করে। শরীরকে সুস্থ, সবল ও কর্মময় রাখতে হলে, ঘুম, বিশ্রাম, শারীরিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও খাবারসহ আরও কিছু নিয়ম কানুন মেনে চলতে হয়। রোগ, জরা এসে আমাদের শরীরকে যাতে বিকল না করতে পারে সেজন্য নিয়মিত পরিমিত মাত্রায় ব্যায়াম অনুশীলন করা প্রয়োজন। ব্যায়াম চর্চার সুফল রয়েছে এবং এটি নিয়মিতভাবে করতে হয়-এ বিষয়ে সকলেই একমত। কিন্তু নিয়মিত ব্যায়াম চর্চা করেন এমন লোকের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অনেক কম।

স্বাস্থ্য পরিচর্যার ব্যাপারে কোন বাঁধাধরা সহজ নিয়ম নেই। আমাদের জ্ঞান ও বিদ্যা অর্জনের জন্য যেমন নিরলস সাধনা করতে হয়, তেমনিভাবে স্বাস্থ্য অর্জনের ক্ষেত্রেও সাধনার প্রয়োজন। যে স্বাস্থ্যকে অবলম্বন করে আমাদের জীবনের সকল প্রয়োজন মিটিয়ে থাকি, তার সংরক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া একান্তভাবে আবশ্যক।

শরীর সুস্থ রাখার জন্য বহুপ্রকার ব্যায়াম আছে। এখানে কয়েকটি সহজ ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যায়াম অনুশীলনের নিয়মকানুন নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

ব্যায়ামের পূর্ব প্রস্তুতি

শরীর চর্চার সুবিধার্থে পায়ে কেড্স, গায়ে ঢিলেঢালা পায়জামা ও জামা বা গেঞ্জি পরতে হয়। এ ক্ষেত্রে ট্রাকস্যুট ব্যায়াম করার জন্য আরামদায়ক ও অত্যন্ত উপযোগী। কারণ

---

* সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

এগুলোর বুনোন নমনীয় থাকে এবং ঢিলেঢালা করে তৈরী করায় কসরতের সময় কাপড়ের দিক থেকে কোন বাধার সৃষ্টি হয় না।

ব্যায়ামের স্থান

ব্যায়ামের স্থান পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও খোলামেলা হওয়া দরকার। বাড়ির ছাদে অথবা ঘরের দরজা জানালা খোলা রেখে ব্যায়াম করা যেতে পারে। এ ছাড়া, খালি হাতে ব্যায়াম করার জন্য বাড়ীর বারান্দা, উঠান বা খোলা জায়গা ব্যবহার করা যেতে পারে।

ব্যায়ামের সময়

আপনার সুবিধা অনুসারে দিনের যে কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে ব্যায়াম অনুশীলন করতে পারেন। তবে, ভরা অথবা খালি পেটে ব্যায়াম করা অনুচিত। পরিবেশ ও অন্যান্য সুবিধা বিবেচনা করে সকাল বা বিকেলে অনুশীলনের উপযুক্ত সময় হিসেবে ধরে নিতে পারেন। উল্লেখ্য যে, ভোরে ব্যায়াম করার জন্য ঘুম থেকে ন্যূনতম ৩০/৪০মিনিট পূর্বে উঠতে হয়।

ব্যায়ামের পরিমাণ

স্বাস্থ্যকে সংরক্ষণের জন্য আলোচিত ব্যায়ামগুলির মধ্য থেকে ন্যূনতম ছ'টি ব্যায়াম যেমন ৬.৭,৯,১০,১৩ ও ১৪ নং এবং এর সাথে টো-টাচ (Toe Tuoch) ও সিট আপ (Sit up) এ দুটি ব্যায়াম অনুশীলনই যথেষ্ট। এক্ষেত্রে, নিয়মিত ১০-২৫ মিনিট সময় নিয়ে সপ্তাহে ৪-৬ দিন ব্যায়াম অনুশীলনের জন্য নির্দিষ্ট করা যেতে পারে।

ব্যায়াম অনুশীলনে সতর্কতা

ব্যায়াম অনূশীলনের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাই আমাদেরকে শুধু এটাই চিন্তা করলে চলবে না যে, ব্যায়াম আমাদের সকল অবস্থাতেই শরীরের উন্নতির জন্য সাহায্য করবে। অনুশীলনে সতর্কতা অবলম্বন প্রধানত দু'ভাবে বিবেচনা করা যেতে পারেঃ

ক) বয়স ঃ আমরা জানি যে, সকল বয়সে একই ধরনের ব্যায়াম প্রযোজ্য নয়। আলোচ্য প্রবন্ধে বুকডন (১৫নং ব্যায়াম) ব্যতিত অন্যান্য ব্যায়ামগুলো সকল বয়সী ব্যক্তি অনুশীলন করতে পারেন। প্রশিক্ষকের পরামর্শ ব্যতিরেকে ব্যায়াম অনুশীলন শরীরের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে।

খ) শারীরিক অসুস্থতা ঃ শারীরিক অসুস্থতার ক্ষেত্রে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে ব্যায়াম নির্ধারণ করে অনুশীলন করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, ডায়াবেটিক রোগের জন্য ব্যায়াম নিয়মিত অনুশীলন করা প্রয়োজন।

কিন্তু, এর সাথে এটাও জানা দরকার যে, রোগীর শরীরে ইন্সুলিনের ঘাটতি বেশি পরিমাণ থাকা অবস্থায় ব্যায়াম অনুশীলন জীবনের জন্য হুমকি স্বরূপ হতে পারে।

শরীর গরম করা (Warm Up) ঃ

ব্যায়াম আরম্ভ করার আগে কিছুটা হাটাহাটি করে, একটু ছুটাছুটি বা একটু লাফিয়ে ঝাপিয়ে শরীরটাকে প্রস্তুত করে নিতে হয়। শুধু হাত-পায়ের জড়তা কাটানোই ওয়ার্ম-আপের উদ্দেশ্য নয়, বরঞ্চ দেহকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করে তোলা। উদাহরণসরূপ বলা যায় যে, হঠাৎ করে একটা বড় সন্দেশ আপনার মুখে ঢুকিয়ে দিলে বা খেতে দিলে তা আপনার খেতে কষ্ট হবে, উপরন্তু সন্দেশ গলায় আটকে বা বেধে যাবে। কিন্তু যদি সন্দেশটি আপনাকে দেয়ার আগে বলা হয় যে এই অপূর্ব স্বাদের সন্দেশটি আপনাকে খেতে হবে। তাহলে দেখা যাবে যে, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সন্দেশটি খাওয়ার জন্য আপনার লালাগ্রন্থি কাজ করে প্রচুর রস মুখে নিসৃত হবে। এমনি অবস্থায় সন্দেশটি আপনাকে খেতে দিলে তা অনায়াসে খেয়ে ফেলতে পারবেন। অর্থাৎ এখানে আপনি মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন। ব্যায়াম বা খেলাধুলার ক্ষেত্রে পেশী ও অন্যান্য স্নায়ুবিধ ক্ষেত্রগুলোর প্রস্তুতির প্রয়োজন রয়েছে। এরই জন্য শরীর গরম বা ওয়ার্ম-আপ শরীর চর্চার জন্য অত্যন্ত জরুরী ও অত্যাবশকীয়।

ব্যায়াম অনুশীলনের সুবিধার জন্য আমরা শরীরকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি;

(১) বুক ও বাহুর ব্যায়াম।

(২) পেট ও কোমরের ব্যায়াম।

(৩) কোমরের নীচের অংশের ব্যায়াম।

এখানে প্রথম পর্যায়ে বুক ও বাহুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোর মোট ১৫টি মুক্ত হস্ত ব্যায়ামের নাম দিয়ে তার অনুশীলনের সম্ভাব্য উপায়গুলো বর্ণনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। এছাড়া, কোন বিশেষ অঙ্গের শক্তি বৃদ্ধি বা কোন নির্দিষ্ট এলাকার মেদ কমাতে হলে যে ব্যায়াম অনুশীলনের পরামর্শ দেয়া হয়েছে, তা তিন সেট (অনুশীলনের জন্য বর্ণিত সংখ্যা পূরণের পর বিশ্রাম নিয়ে পর পর তিনবার) করতে হবে।

অনুশীলনের বিষয় ও উপকারিতা	বিস্তারিত বিবরণ (মন্তব্যসহ)
১। ঘাড়ের ব্যায়াম (Neck Exercise)	
শরীরের অবস্থান ঃ শরীরের ভারসাম্য স্বাভাবিক রেখে আরামদায়কভাবে বসে বা দাঁড়িয়ে এ ব্যায়ামটি করা যায়।	(ক) দাঁড়িয়ে ব্যায়ামটি করার সময়ে দুই হাত কোমরে রাখুন অথবা সোজা (সহজভাবে) উরুর দুই পাশে ছেড়ে দিন। এ সময়ে দুই হাতের তালু স্বভাবত উরুর দিকে থাকবে। (খ) ব্যায়ামটি করার সময়ে মেরুদন্ড সোজা রাখতে হবে।
কসরৎ ঃ এ ব্যায়ামের কসরৎ তিনভাবে (ক, খ, গ) করা যেতে পারে	
ক. চিবুক উপর-নীচ করা	
স্বাভাবিক অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে চিবুক সম্মুখে বুকের দিকে অগ্রসর হবে এবং বুক স্পর্শ করবে।	চিবুক বুক স্পর্শ করে পাঁচ থেকে দশ সেকেন্ড স্থির রাখুন।
চিবুক ধীরে ধীরে সম্মুখে উপর দিকে যতদূর সম্ভব উঠবে এবং মাথা পিছনের দিকে হেলে পড়বে।	এ অবস্থায়, পাঁচ থেকে দশ সেকেন্ড স্থির রাখুন। উভয় দিকে তিন থেকে পাঁচবার এই ব্যায়ামটি করুন।
খ. মাথা ডানে বামে বাঁকা করাঃ	
(১) স্বাভাবিক অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে মাথা ডান/বাম কাঁধের দিকে কাত করুন।	(১) মাথা এতটুকু (ডান/বাম) কাত হবে যেন কান কাঁধ স্পর্শ করবে এবং ৫-১০ সেকেন্ড স্থির থাকবে। তারপর একই ছন্দে পূর্বাবস্থায় ফিরে আসবে। (২) মাথা হেলে ডান পাশের ন্যায় বিপরীত কাঁধে (বাম পার্শ্বে) কান স্পর্শ করবে এবং ৫-১০ সেকেন্ড স্থির রাখুন।

অনুশীলনের বিষয় ও উপকারিতা ঃ	বিস্তারিত বিবরণ (মন্তব্যসহ)
	(৩) ব্যায়ামটি উভয় পার্শ্বে (ডানে/বামে) ৩-৫ বার করুন।
(গ) মাথা ঘূর্ণন ঃ ঘড়ির কাঁটার দিকে এবং বিপরীত দিকে মাথা ঘুরাতে হবে উপকারিতা ঃ পরিমিত চর্চার মাধ্যমে হঠাৎ (পাওয়া) ঘাড়ের ব্যাথা থেকে উপশম পাওয়া যায়। ঘাড়ের পেশী পুষ্ট ও নমনীয় করার জন্য এটি একটি অন্যতম কার্যকর ব্যায়াম। এ ব্যায়াম গলার গ্রন্থিগুলোয় রক্তচলাচলের সুবিধা বাড়িয়ে সেগুলোকে অধিকতর সচল ও কর্মক্ষম রাখতে সাহায্য করে।	(১) ঘূর্ণনের সময়ে কান, কাঁধ স্পর্শ করে এবং চিবুক বুক স্পর্শ করে মাথাকে ঘুরাতে হবে। (২) ঘূর্ণনের গতি প্রথমত যতদূর সম্ভব ধীরে হবে। তারপর গতি কিছুটা বাড়তে পারে, কিন্তু দ্রুত ঘূর্ণন এই ব্যায়ামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। (৩) তিনবার ঘড়ির কাটার দিকে বৃত্তাকারে ঘূর্ণনের পর বিপরীত দিকে একইভাবে ঘূর্ণন সম্পন্ন করতে হবে। (৪) ব্যায়ামটি চর্চার সময়ে চোখ খোলা বা বন্ধ, যে কোন ভাবে থাকতে পারে। শ্বাস-প্রশ্বাস ঃ স্বাভাবিক ভাবে চলবে।
২। ঘাড় মোটা করণ (Neck Expansion) শরীরের অবস্থান ঃ আরামে দাঁড়ান। দুই হাতের আঙ্গুল পরস্পর পরস্পর আঙ্গুলের ফাঁকে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে শক্ত বাধন (লক) তৈরী করুন। এমনিভাবে লক তৈরী করে দুই হাতের তালু মাথার পিছনের দিকে স্থাপন করুন।	শরীরের ভর দুই পায়ের উপর সমানভাবে রেখে সোজা হয়ে দাঁড়ান
কসরৎ ঃ প্রথমে দুই হাতের কনুই মুখের সম্মুখে একত্রিত করুন এবং দুই হাতের তালু দিয়ে মাথাকে জোর করে সামনের দিকে টানুন।	(১) এ সময়ে ঘাড়ের পেশীগুলোকে টান টান (শক্ত) করে ঘাড় সোজা রাখার চেষ্টা করুন।

অনুশীলনের বিষয় ও উপকারিতা ঃ	বিস্তারিত বিবরণ (মন্তব্যসহ)
উপকারিতা ঃ এ ব্যায়ামে ঘাড় ও পিঠের উপরিভাগের পেশীগুলোতে টান পড়ে, যার ফলে ঘাড় ও পিঠের উপরের অংশের পেশীগুলো শক্তিশালী ও প্রশস্ত (মোটা) হওয়ার সুযোগ পেয়ে থাকে।	(২) ঘাড়ের পেশী শক্ত করা এবং দুই হাত দিয়ে মাথা সম্মুখে টেনে আনা, পরপর বিপরীত দিকে কাজ করবে। (৩) ঘাড়ের উপরের এই চাপকে ১০-১৫ সেকেন্ড বা এর চেয়ে বেশী সময় ধরে রাখার চেষ্টা করুন। (৪) কিছুটা বিশ্রাম নিয়ে ব্যায়ামটি পরপর তিনবার অনুশীলন করলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যেতে পারে। **শ্বাস-প্রশ্বাসঃ** স্বাভাবিকভাবে চলতে থাকবে।
৩। আঙ্গুলের ব্যায়াম (Finger Exercise) **শরীরের অবস্থান ঃ** এই ব্যায়ামটি আরামে বসে বা দাঁড়িয়ে করুন। হাতের অবস্থানের উপর নির্ভর করে ব্যায়ামটি বিভিন্নভাবে (কয়েকটি ভেরিয়েশনে) করা যায়।	(১) ব্যায়ামটি আঙ্গুলের, তাই শরীরের বিভিন্ন অবস্থান (বসে বা দাঁড়ানো) এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কোন প্রভাব রাখে না। (২) মেরুদন্ড সোজা রেখে ব্যায়ামটি করুন।
(১) এক হাত (ডান/বাম) সোজাভাবে শরীরের সামনে প্রসারিত করে।	(১) হাতের তালু মাটির দিকে থাকবে।
(২) দুই হাত এক সাথে কাঁধ বরাবর শরীরের সামনে (সোজা ভাবে) প্রসারিত করে।	(২) হাতের তালু মাটির দিকে থাকবে।
(৩) এক হাত (ডান/বাম) সোজাভাবে কাঁধ বরাবর শরীরের পাশে প্রসারিত করে।	(৩) হাতের তালু মাটির দিকে থাকবে।

অনুশীলনের বিষয় ও উপকারিতা ঃ	বিস্তারিত বিবরণ (মন্তব্যসহ)
(৪) দুই হাত সোজাভাবে একসাথে শরীরের দুই পাশে কাঁধ বরাবর (উড়ন্ত পাখীর পালকের মত) প্রসারিত করে।	(৪) হাতের তালু মাটির দিকে থাকবে।
(৫) এক বাহু (ডান/বাম) কান ছুঁয়ে মাথার পাশ দিয়ে আকাশের দিকে প্রসারিত করুন। এ সময় হাত সোজা রাখুন।	(৫) হাতের তালু সামনের দিকে থাকবে।
(৬) দুই বাহু কান ছুঁয়ে মাথার দুই পাশ দিয়ে আকাশের দিকে (হাত) সোজাভাবে প্রসারিত করুন।	(৬) হাতের তালু সামনের দিকে থাকবে।
কসরৎ ঃ উপরের বর্ণনা দেয়া ছয়টি ভেরিয়েশনে যে কোন একটি গ্রহণ করুন। হাতের কনুই ও কব্জি সোজা রেখে আঙ্গুল একত্রে মুষ্টিবদ্ধ করুন এবং খুলুন। উপকারিতা ঃ এ ব্যায়ামে কব্জি ও আঙ্গুলের জোর বাড়ে। এছাড়া আঙ্গুলের জোড়াগুলোর নমীনয়তা বাড়াতে সহায়তা করে।	(১) হাত খোলার সময় আঙ্গুলগুলো (থাবা) যতদূর সম্ভব বেশী প্রসারিত করার চেষ্টা করতে হবে এবং একই গতিতে মুষ্টিবদ্ধ করুন। (২) একবার মুষ্টিবদ্ধ করা একবার খোলা হলে, একবার ব্যায়ামটি করা হয়েছে হিসেবে গণনা করুন। (৩) ২০-২৫ বার বা তার চেয়ে বেশী সংখ্যক বা যতক্ষণ আঙ্গুল আড়ষ্ঠ না হয়, ততক্ষণ ব্যায়ামটি করুন। (৪) ধীরে ধীরে হাতের কব্জি নরম করে নেড়ে বিশ্রাম নিন। (৫) উপরের (শরীরের অবস্থানের) ভেরিয়েশন অনুসারে ডান ও বাম উভয় আঙ্গুলের কসরৎ একবার অনুশীলনই যথেষ্ট। অর্থাৎ ডান ও বাম হাতের আঙ্গুল একবার ব্যায়ামটিতে অংশ নিবে। শ্বাস-প্রশ্বাসঃ স্বাভাবিক চলতে থাকবে।

অনুশীলনের বিষয় ও উপকারিতা ঃ

৪। কব্জি ঘূর্ণন
(Wrist Rotation)

শরীরের অবস্থান ঃ

এই ব্যায়ামটি আরামে বসে বা দাঁড়িয়ে করুন। হাতের অবস্থানের উপর নির্ভর করে ব্যায়ামটি বিভিন্নভাবে (কয়েকটি ভেরিয়েশনে) করা যায়।

(১) এক হাত (ডান/বাম) সোজাভাবে শরীরের সামনে প্রসারিত করে।

(২) দুই হাত একসাথে কাঁধ বরাবর শরীরের সামনে (সোজাভাবে) প্রসারিত করে।

(৩) এক হাত (ডান/বাম) সোজাভাবে কাঁধ বরাবর শরীরের পাশে প্রসারিত করে।

(৪) দুই হাত সোজাভাবে একসাথে শরীরের দুষ্পাশে কাঁধ বরাবর (উড়ন্ত পাখীর পালকের মত) প্রসারিত করে।

(৫) এক বাহু (ডান/বাম) কান ছুঁয়ে মাথার পাশদিয়ে আকাশের দিকে প্রসারিত করুন। এসময়ে হাত সোজা থাকবে।

(৬) দুইবাহু কান ছুঁয়ে মাথার দু'পাশ দিয়ে আকাশের দিকে হাত সোজাভাবে প্রসারিত করুন।

বিস্তারিত বিবরণ (মন্তব্যসহ)

(১) যেহেতু ব্যায়ামটি কব্জির তাই শরীরের বিভিন্ন অবস্থান (বসা বা দাঁড়ানো) এ ক্ষেত্রে তেমন কোন প্রভাব রাখে না।

(২) মেরুদন্ড সোজা রেখে ব্যায়ামটি করুন।

(১) হাতের তালু মাটির দিকে থাকবে

(২) হাতের তালু মাটির দিকে থাকবে

(৩) হাতের তালু মাটির দিকে থাকবে

(৪) হাতের তালু মাটির দিকে থাকবে

(৫) হাতের তালু সামনের দিকে থাকবে।

(৬) হাতের তালু সামনের দিকে থাকবে

অনুশীলনের বিষয় ও উপকারিতা ঃ	বিস্তারিত বিবরণ (মন্তব্যসহ)
কসরৎ ঃ উপরের বর্ণনা দেয়া ছয়টি ভেরিয়েশনের যে কোন একটি গ্রহণ করুন। হাতের কনুই সোজা রেখে বৃত্তাকারে কব্জি ঘুরাতে আরম্ভ করুন।	(১) ঘড়ির কাঁটার দিকে কব্জি ১৫-২০ বার বৃত্তাকারে ঘুরান। তারপর, স্বল্প বিশ্রাম নিয়ে ঘড়ির কাঁটার উল্টো দিকে একই সংখ্যক বার ঘুরান। (২) ঘূর্ণনের গতি প্রথমে ধীরে হবে এবং ক্রমে বাড়তে থাকবে। যে লয়ে গতি বাড়বে সেই লয়ে সেই গতি কমবে। এমনিভাবে ঘূর্ণন চলবে। অর্থাৎ হঠাৎ করে দ্রুতগতিতে ঘূর্ণন আরম্ভ হবে না এবং হঠাৎ করে থেমেও যাবেন না।
উপকারিতা ঃ এ ব্যায়ামে কব্জির জোর এবং নমনীয়তা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। কোন কারণে কব্জিতে ব্যাথা পেয়ে থাকলে তা উপশমে ব্যায়ামটি নিয়মিত হালকা চর্চা করলে ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে।	(৩) ডান ও বাম উভয় হাতের কব্জির কসরৎ একবার অনুশীলনই যথেষ্ট। অর্থাৎ ডান ও বাম হাতের কব্জি একবার ব্যায়ামটিতে অংশ নিবে। শ্বাস-প্রশ্বাস ঃ স্বাভাবিক ভাবে চলতে থাকবে।

৫। একহাত ঘূর্ণন (Single Hand Rotation)

শরীরের অবস্থান ঃ সোজা হয়ে দাঁড়ান।	(১) এক পা থেকে অপর পায়ের দূরত্ব ১০-১২ ইঞ্চি হবে। (২) দেহের দৈর্ঘ্য অনুসারে দুই পায়ের দূরত্ব কমাতে বা বাড়াতে পারেন। (৩) দুই হাত শরীরের সাথে মিশে থাকবে। (৪) এক হাতের ব্যায়ামটি আরম্ভ করার সময় অপর হাতের তালু আলতোভাবে যে হাতের ব্যায়াম হবে,সেই পাশে ঝুঁকে রাখুন।

অনুশীলনের বিষয় ও উপকারিতা ঃ	বিস্তারিত বিবরণ (মন্তব্যসহ)

কসরৎ ঃ

ডান ও বাম হাত একক ভাবে ঘড়ির কাঁটার দিকে এবং বিপরীত দিকে ঘুরান।

(১) ডান হাত (সোজা থেকে) ধীরে সম্মুখের দিকে উঠতে থাকবে এবং বাহু কান স্পর্শ করে যতদূর সম্ভব পিছন দিক দিয়ে নিয়ে এসে উরুর পাশ ঘেষে ঘুরাতে থাকুন।

(২) এভাবে শূন্যে যতদুর সম্ভব বড় বৃত্ত তৈরী করে ঘুরাতে থাকুন।

(৩) ধীরে ধীরে গতি বাড়বে এবং সহনীয় দ্রুততম পর্যায়ে পৌছে আবার একইভাবে গতি কমাতে কমাতে ঘূর্ণন থামিয়ে দিন।

(৫) অল্প কয়েক সেকেন্ড বিশ্রাম নিন। ডান হাত ঘড়ির দিকে ঘূর্ণনের একই ভঙ্গিতে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে হাত ঘুরিয়ে ব্যায়ামটি করুন।

(৬) প্রতিটি ক্ষেত্রে ঘূর্ণনের সংখ্যা হবে ১৫-২০ বার। কিছু বিশ্রাম নিয়ে একইভাবে অপর হাতটির (বাম হাত) কসরৎ করুন।

শ্বাস-প্রশ্বাসঃ স্বাভাবিক ভাবে চলতে থাকবে

উপকারিতা ঃ

এ ব্যায়ামটি কাঁধ, বুক ও বাহুর পেশী দৃঢ় ও শক্তিশালী করে। বুক, পিঠ ও কাঁধে জমে থাকা অতিরিক্ত মেদ কমাতে সাহায্য করে।

৬। দুই হাত একত্রে ঘূর্ণন (Double Hand Rotation)

শরীরের অবস্থান ঃ

সোজা হয়ে দাঁড়ান।

(১) এক পা থেকে অপর পায়ের দূরত্ব ১৫-২০ ইঞ্চি হবে।

(২) দেহের দৈর্ঘ্য অনুসারে দুই পায়ের দূরত্ব কমিয়ে বা বাড়িয়ে দিন।

অনুশীলনের বিষয় ও উপকারিতা ঃ

বিস্তারিত বিবরণ (মন্তব্যসহ)

(৩) দুই হাত সোজা করে (হাতের তালু) শরীরের ডান ও বাম পাশে মিশিয়ে রাখুন।

কসরৎ ঃ

দুই হাত একত্রে শরীরের সম্মুখে কাঁধ বরাবর উপরের দিকে তুলে বৃত্তাকারে ঘুরান।

(১) ঘূর্ণনের সময়ে দুই বাহু কান ছুঁয়ে শরীরের পিছনের দিকে যতটুকু সম্ভব নিয়ে এসে উরুর পাশ ঘেষে ঘুরাতে থাকুন।

(২) ঘূর্ণন প্রথমত ধীর গতিতে এবং ক্রমে গতি বাড়িয়ে দিতে হবে। সহনীয়ভাবে কয়েক সেকেন্ড দ্রুততম পর্যায়ে রাখুন।

(৩) যেভাবে গতি বাড়ানো হয়েছিল, সেই একই লয়ে বা রিদমে ঘূর্ণনের গতি কমবে এবং স্থির অবস্থায় ফিরিয়ে আনুন।

(৫) ঘূর্ণনের সময় দুই হাত শরীরের (উরুর) যতটুকু কাছ ঘেষে যাওয়া সম্ভব তা অনুসরণের চেষ্টা করতে হবে। অর্থাৎ উভয় হাত দিয়ে সর্বোচ্চ বৃহৎ বৃত্তগুলো (শূন্যে) আঁকার চেষ্টা করুন।

(৬) ঘূর্ণনের সংখ্যা-উভয় দিকে ১৫/২০ বার করুন।

তারপর কিছুটা বিশ্রাম নিয়ে একই ভঙ্গিতে বিপরীত দিকে ঘূর্ণন সম্পন্ন করুন।

(১) ঘূর্ণনের ঢং উপরের বর্ণনার অনুরূপভাবে বিপরীত দিকে এবং একই সংখ্যক বার ঘুরান।

শ্বাস-প্রশ্বাসঃ স্বাভাবিকভাবে চলতে থাকবে।

অনুশীলনের বিষয় ও উপকারিতা ঃ	বিস্তারিত বিবরণ (মন্তব্যসহ)

উপকারিতা ঃ

এ ব্যায়াম কাঁধ, বাহুর পেশী দৃঢ় ও শক্তিশালী করে। বাহু, বুক, পিঠ ও কাঁধে জমে থাকা অতিরিক্ত মেদ কমাতে সাহায্য করে।

৭। কাঁধের ব্যায়াম (Shoulder Exercise)

শরীরের অবস্থান ঃ

সোজা হয়ে আরামে দাঁড়ান।

(১) দুই পায়ের অবস্থান কাঁধ বরাবর দূরত্বে রাখুন।

(২) দুই হাত কাঁধ বরাবর ভূমি সমান্তরালে দু'পাশে সোজাভাবে (উড়ন্ত পাখীর ডানার মত) ছড়িয়ে রাখুন।

(৩) হাতের আঙ্গুলগুলো সোজা হয়ে পাশাপাশি মিশে থাকবে এবং উভয় হাতের তালু আকাশমুখি রাখুন।

(৪) ব্যায়ামের সময়ে হাত ভূমি সমান্তরাল থেকে যেন উপরের দিকে উঠে না যায় বা নীচের দিকে নেমে না যায়।

(৫) যদি হাত বেশী উপরে বা নীচে নেমে যায়, তবে যে পেশীগুলোর ব্যায়ামটিতে অংশ নেয়ার কথা, সেই উদ্দেশ্য পরিপূর্ণভাবে কার্যকর হবে না।

কসরৎ ঃ

দুই হাত দিয়ে একত্রে ৬ ইঞ্চি বৃত্ত (শূন্যে) তৈরী করে ঘুরাতে আরম্ভ করুন।

(১) দুই হাত একত্রে ঘুরানোর জন্য স্বভাবত ডান হাত ঘড়ির কাঁটার দিকে এবং বাম হাত ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘুরান।

অনুশীলনের বিষয় ও উপকারিতা ঃ	বিস্তারিত বিবরণ (মন্তব্যসহ)

(২) ঘূর্ণনের গতি ধীরে ধীরে বাড়াতে হবে এবং কিছুক্ষণ দ্রুততার সাথে চলবে। তারপর গতি বৃদ্ধির অনুরূপ লয়ে কমতে থাকবে এবং স্থির অবস্থায় আনুন।

(৩) ঘূর্ণনের সংখ্যা ২৫/৩০ বা ততোধিক বার করুন।

কিছুটা বিশ্রাম নিন। তারপর, দুই হাত দিয়ে একত্রে ৬ ইঞ্চি বৃত্তের শূন্য তৈরী করে বিপরীত দিকে ঘুরাতে আরম্ভ করুন।

ঘূর্ণনের ঢং উপরের বর্ণনার বিপরীত দিকে একই ভাবে একই সংখ্যক বার করুন।

শ্বাস-প্রশ্বাসঃ স্বাভাবিকভাবে চলতে থাকবে।

উপকারিতা ঃ

কাঁধ এবং তৎসংলগ্ন মাংশপেশীগুলোর শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। কাঁধ, পিঠ ও বাহুতে জমে থাকা অতিরিক্ত মেদ দূর করার জন্য এ একটি উৎকৃষ্ট ব্যায়াম।

৮। দোল ছাড়া পাশে বাঁকা
(Side Bending without Swing)

শরীরের অবস্থান ঃ

সোজা হয়ে দাঁড়ান।

(১) দুই পা কাঁধ বরাবর অপেক্ষা কিছুটা বেশী দূরে রাখুন।

(২) এক পা থেকে অপর পায়ের দূরত্ব ২০-২৫ ইঞ্চি হবে। দেহের দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে দুই পায়ের দূরত্ব কমিয়ে বা বাড়িয়ে দিন।

(৩) হাতের তালু উরু স্পর্শ করে শরীরের দুই (ডান ও বাম) পাশে মিলিয়ে রাখুন।

(৪) মাথা, ঘাড় ও মেরুদন্ড সোজা রাখুন।

অনুশীলনের বিষয় ও উপকারিতা ঃ

কসরৎ ঃ

উপর্যুক্ত অবস্থা গ্রহণের পর শরীর ধীরে ধীরে ডান পাশে হেলতে থাকবে। একই সাথে ডান ও বাম হাতের উঠা নামা(শরীর ঘেষে) একটি রিদম হবে।

তারপর, না থেমে অনুরূপভাবে বিপরীতে দিকে ব্যায়ামটি করুন।

বিস্তারিত বিবরণ (মন্তব্যসহ)

ডান হাত ঃ

(১) এসময়ে ডান হাত সোজা হয়ে (ডান পাশে) শরীর ঘেষে ক্রমশ হাঁটুর দিকে অগ্রসর হতে থাকবে।

(২) স্বভাবত ডান হাতটি ডান উরু (ডান পাশ) ঘেষে অগ্রসর হবে।

(৩) এমনিভাবে শরীর বাঁকা হয়ে ডান হাত হাঁটু অতিক্রম করে যাবেএবং এ্যাঙ্কেল স্পর্শ করার চেষ্টা করুন।

বাম হাত ঃ

(১) শরীর ডানে হেলার সাথে সাথে বাম হাত শরীর ঘেষে ক্রমশ কনুই ভাজ করে বগলের দিকে উঠাতে থাকুন।

(২) হাত উরু থেকে কোমরের (বাম) পাশ ঘেষে সোজা স্পর্শ করুন।

তেমন কোন বিরতি ছাড়াই শরীর বাম পাশে হেলে ব্যায়ামটি একই ভঙ্গিতে (ডান পাশের ন্যায়) করুন এবং পরপর (ডানে-বামে) অনুশীলন চালিয়ে যান।

কয়েকটি বিশেষ লক্ষ্যণীয় বিষয় ঃ

(১) কসরতের সময়ে মেরুদন্ড সম্মুখে বা পিছনে বাঁকা রাখবেন।

(২) উভয় পা মাটিতে স্থিরভাবে লাগানো রাখুন।

(৩) ব্যায়ামের গতি প্রথমে ধীর হবে এবং তারপর কিছুটা গতি বাড়াতে হবে।

অনুশীলনের বিষয় ও উপকারিতা ঃ

উপকারিতা ঃ

এ ব্যায়াম মেরুদন্ড এবং দেহের (উপরিভাগের) ডান বাম উভয় পাশের মাংশপেশীগুলোকে শক্তিশালী এবং নমনীয় করে থাকে। এছাড়া বাহু ও কাঁধ সংলগ্ন এলাকা এবং কোমরের (পেটের ডান-বাম পাশের) অতিরিক্ত মেদ কমাতে সাহায্য করে।

৯। দোল দিয়ে পাশে বাঁকা (Side Bending with Swing)

শরীরের অবস্থান ঃ

সোজা হয়ে দাঁড়ান।

কসরৎ ঃ

শরীর ধীরে ধীরে ডান পাশে বাঁক করুন। কোমরের উপরের অংশে অর্থাৎ মাথা, ঘাড় ও ধড় ইত্যাদি অঙ্গ একত্রে বাঁকা করুন।

বিস্তারিত বিবরণ (মন্তব্যসহ)

ব্যায়ামের সংখ্যা গণনাঃ

একবার বামে এবং একবার ডানে হেলে ব্যায়ামটি করা হলে একবার হয়েছে বলে ধরা হবে। এমনিভাবে ১০-১৫ বার করুন।

শ্বাস-প্রশ্বাসঃ স্বাভাবিকভাবে চলতে থাকবে।

(১) দুই পা কাঁধ বরাবর অপেক্ষা কিছুটা বেশী দূরে রাখুন।

(২) মাঝারি উচ্চতা সম্পন্ন ব্যক্তির জন্য এক পা হতে অপর পায়ের দূরত্ব ২০-২৫ ইঞ্চি হবে। অপেক্ষাকৃত খাটো বা উঁচু ব্যক্তির উচ্চতা অনুপাতে দূরত্ব কম বা বেশী দূরত্বে রাখুন।

(৩) দুই হাতে কোমর ধরে রাখুন। এ সময়ে হাতের তালু মেঝের দিকে এবং উভয় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি পিছনের (পিঠের) দিকে রাখুন।

(৪) এ ব্যায়ামের সময় মেরুদন্ড সম্মুখে বা পিছনে বাঁকা হবে না।

বাম হাত ঃ

(১) শরীর বাঁকা হওয়ার সাথে তাল রেখে বাম হাত কোমর থেকে অবমুক্ত করা যাবে। হাত সোজা হয়ে কান বরাবর উঠে কানের পাশে অবস্থান নিবে বা কান স্পর্শ করবে।

অনুশীলনের বিষয় ও উপকারিতা ঃ

শরীর পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনুন এবং বাম পাশে ও ডান পাশে একই ভঙ্গিতে বাঁকা করে ব্যায়ামটি সম্পন্ন করুন।

সংখ্যা গণনা ঃ

একবার ডানে এবং একবার বামে বাঁকা হওয়া সম্পন্ন হলে ব্যায়ামটি একবার হয়েছে বলে গণনা করা হবে। এমনিভাবে ব্যায়ামটি ১৫-২০ বার করুন।

উপকারিতা ঃ

এ ব্যায়াম মেরুদন্ড এবং দেহের (উপরিভাগের) ডান-বাম উভয় পাশের

বিস্তারিত বিবরণ (মন্তব্যসহ)

(২) শরীর ডান পাশে বাঁকা হওয়ার সাথে ছন্দে রেখে মাথা ও হাত (সোজাভাবে) একই সাথে অংশ নেবে।

ডান হাত ঃ

(১) শরীর ডানে বাঁকা হওয়ার সময় ডান হাত দিয়ে কোমরকে বিপরীত দিকে বাঁকা করার জন কিছুটা চাপ দিন।

(২) খুব জোরে চাপ প্রয়োগ না করে ব্যায়ামটি করার সময় সহনীয় চাপ প্রয়োগই যথাযথ।

(১) ঠিক যেভাবে ডানে বাঁকা হওয়ার জন্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো পরস্পরায় কাজ করেছে, ঐ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোর একই বিপরীত ভঙ্গি অনুসরণ করুন।

(২) কোন ছেদ বা বিরতি না দিয়ে বাম পাশে বাঁকা হয়ে ব্যায়ামটি করুন।

(৩) বাম পাশে বাঁকা হওয়া ডান পাশে বাঁকা হওয়ার (সকল অঙ্গের কাজ) অনুরূপভাবে বিপরীত দিকে করুন।

(৪) ডানে ও বামে বাঁকা হওয়া কোন ধরনের ছেদ না দিয়ে চালাতে থাকুন।

কয়েকটি লক্ষ্যণীয় বিষয়ঃ

(১) মেরুদন্ড সামনে বা পিছনের দিকে বাঁকা না রেখে ব্যায়ামটি করার সময়ে ডান এবং বাম পাশে বাঁকা হয়ে অনুশীলন করুন।

(২) উভয় পা মাটিতে স্থিরভাবে লাগানো রাখুন।

অনুশীলনের বিষয় ও উপকারিতা ঃ

মাংসপেশীগুলোকে শক্তিশালী এবং নমনীয় করে থাকে। এছাড়া কাধ সংলগ্ন এলাকা ও কোমরের (পেটের ডান-বাম পাশের) অতিরিক্ত মেদ কমাতে সাহায্য করে।

১০। হাত ছড়িয়ে বুকের ব্যায়াম (Spread Hand Chest Exercise)

শরীরের অবস্থান ঃ

সোজা হয়ে দাঁড়ান এবং দুই হাত উরুর উপর রাখুন।

কসরৎ ঃ

দুই হাত একই সাথে শরীরের সম্মুখের দিকে উঠবে এবং কান পর্যন্ত পৌঁছুবে। একই সাথে পায়ের গোড়ালী মাটি থেকে উপরের দিকে উঠতে থাকবে।

বিস্তারিত বিবরণ (মন্তব্যসহ)

(৩) ব্যায়ামটি অনুশীলনের গতি প্রথমত ধীর হবে এবং গতি ক্রমশ কিছুটা বাড়িয়ে দিন।

শ্বাস-প্রশ্বাস ঃ স্বাভাবিকভাবে শ্বাস প্রশ্বাস চলতে থাকবে।

পা ঃ (১) এই ব্যায়াম অনুশীলনে জন্য দুই পায়ের দূরত্ব খুব কাছাকাছি বা দূরে থাকবে, এমন নয়। অর্থাৎ স্বাভাবিকভাবে আরামে দাঁড়ানোর জন্য পা দুটো যে দূরত্বে রাখতে হয়, এমনি দূরত্বে রাখুন।

হাত ঃ (২) এ অবস্থায় দুই হাত সোজাভাবে দুই উরুর উপরে (হাতের তালু) মিলে থাকবে। হাতের আঙ্গুলগুলো সোজাভাবে এবং পরস্পর পাশাপাশি মিশে মেঝের দিকে নির্দিষ্ট রাখুন।

(৩) দুই হাতের তালু উরুর দুই পাশে (ডানে-বামে) না থেকে শরীরের সামনের দিকে উরুর উপর অবস্থান নেবে। অর্থাৎ ডান হাত ডান উরুর উপর এবং বাম হাত বাম উরুর উপর রাখুন।

হাত ঃ (১) দুই হাত সোজাভাবে ধীরে ধীরে শরীরের সামনের দিকে একত্রে কাঁধ বরাবর উপরের দিকে উঠাতে থাকুন।

অনুশীলনের বিষয় ও উপকারিতা ঃ

সম্পূর্ণ পায়ের পাতার উপর ভর করে পিছনের দিকে বাঁকা হবে। একই ছন্দ ও ভঙ্গিতে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনুন।

বিস্তারিত বিবরণ (মন্তব্যসহ)

(২) হাতদ্বয় কাঁধ সমতল অতিক্রম করে আকাশমুখি হয়ে যাবে। এক পর্যায়ে মাথার দুই পাশে এসে পৌঁছুন।

(৩) হাত উঠানোর গতির সাথে তাল রেখে (উপর্যুক্ত পর্যায়ের পর) মেরুদন্ড পিছনের দিকে যতদূর সম্ভব বাঁকিয়ে দিন। এ সময়ে মাথা অবশ্যই দুই বাহুর

পাঃ (১) হাত উপরের দিকে উঠার সাথে সাথে পায়ের গোড়ালী ধীরে ধীরে মাটি থেকে উপরের দিকে উঠাতে থাকুন। অর্থাৎ, হাত ও পা উপরের দিকে উঠাতে একই ছন্দ বজায় রাখুন।

(২) শেষ পর্যায়ে পায়ের পাতার উপর সম্পূর্ণ শরীরের ভর চলে যাবে। হাত ও পায়ের কাজ একই ছন্দে সম্পন্ন হবে। এ সময়ে শরীরের আকার বা অবস্থা কিছুটা (পিছনের দিকে বাঁকা হয়ে) ধনুকের মত আকার ধারণ করবে।

কয়েকটি বিশেষ লক্ষ্যণীয় বিষয়ঃ

(১) শরীর পায়ের পাতার উপর অবস্থান নেয়ার সময় কোমর যতদূর সম্ভব সামনের দিকে বাঁকা করার চেষ্টা করুন।

(২) হাত উঠানামা করার সময়ে ডান ও বাম হাতের মধ্যবর্তী ফাঁক বা দূরত্ব সর্বত্র সমান রাখুন।

(৩) যখন শরীর চূড়ান্তভাবে পিছনে বাঁকা হবে, তখন আকাশমুখি হয়ে আকাশ দেখুন।

শ্বাস-প্রশ্বাসঃ এই ব্যায়ামের সময় শ্বাস-প্রশ্বাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বহন করে।

অনুশীলনের বিষয় ও উপকারিতা ঃ

সংখ্যা গণনা ঃ

দুই হাত (উপর্যুক্ত বর্ণনার ন্যায়) প্রসারিত হয়ে পূর্বাবস্থায় ফিরে আসলে একবার ব্যায়ামটি হয়েছে বলে গণনা করা হবে। এভাবে বিরতি না দিয়ে ১০-১৫ বার বা সম্ভব হলে তার চেয়ে বেশী সংখ্যক বার অনুশীলন করুন।

উপকারিতা ঃ

ফুসফুসে অক্সিজেন ধারণ ক্ষমতা ও গ্রহণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। বুকের বিভিন্ন মাংস-পেশীর সাথে সাথে কাঁধ বাহু ও পেটের পেশীগুলো শক্তিশালী করে। এছাড়া উল্লিখিত এলাকায় জমে থাকা অতিরিক্ত মেদ কমাতে সাহায্য করে। ফুসফুসের জোর বাড়ে এবং বুকের আয়তন বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

বিস্তারিত বিবরণ (মন্তব্যসহ)

শ্বাস-গ্রহণ ঃ দুই হাত উপরের দিকে প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নাক দিয়ে বুক ভরে শ্বাস নিন।

শ্বাস ত্যাগ ঃ হাত প্রসারিত অবস্থা থেকে পূর্বাবস্থায় ফিরে আসার সময়ে শ্বাস ত্যাগ করতে হবে। শ্বাস ছাড়ার সময়ে মুখ কিছুটা চঞ্চুর মত করে, ঠোটের মাথা দিয়ে বাতাস ছাড়ুন। মুখ হা করে দম ছাড়লে বাতাস বের হওয়ার সময়ে গলা শুকিয়ে যায়। যার ফলে শারীরিক অসুবিধা ও ব্যায়াম অনুশীলনে অসুবিধার সৃষ্টি করে। তাই, এমনিভাবে দম ছাড়া অত্যন্ত সঙ্গত মনে করা হয়ে থাকে।

১১। হাত ভাঁজ করে বুকের ব্যায়াম (Bend Hand Chest Exercise)

শরীরের অবস্থান ঃ

সোজা হয়ে দাঁড়ান এবং হাত ভাঁজ করে বুকের সামনে রাখুন।

(১) স্বাভাবিকভাবে আরামে দাঁড়ানোর জন্য পা দুটো যে দূরত্বে রাখতে হয় এমনি দূরত্বে পা স্থাপন করুন।

(২) দুই হাত ভাঁজ করে বুকের সামনে মিলিত করুন। উভয় হাতের আঙ্গুলগুলো সোজা হয়ে পরস্পর বিপরীতমুখি ভাবে এবং ডান ও বাম মধ্যমা পরস্পর ছুঁয়ে বা কিছুটা দূরে রাখুন।

(৩) উভয় হাতের তালু মাটির দিকে রাখুন।

অনুশীলনের বিষয় ও উপকারিতা ঃ

কসরৎ ঃ

বুকের সম্মুখে ভাঁজ করে রাখা হাত একই সাথে কাঁধ বরাবর দুই (ডান ও বাম) পাশে ছড়িয়ে যাবে এর সাথে ছন্দ রেখে পায়ের গোড়ালী ক্রমান্বয়ে মাটি থেকে উপরের দিকে উঠবেএবং বিরতি না দিয়ে পূর্বের অবস্থায় (হাত ও পা) ফিরিয়ে আনুন।

বিস্তারিত বিবরণ (মন্তব্যসহ)

(৪) মেরুদন্ড সোজা রাখুন।

হাতঃ (১) বুকের সম্মুখে রাখা উভয় হাতের (ভাজ করে রাখ) কনুই ধীরে ধীরে সোজা হয়ে শরীরের দুই পাশে কাঁধ বরাবর ছড়িয়ে দিন।

(২) হাত ছড়িয়ে যাওয়ার গতি না থামিয়ে যতদূর পিছনের দিকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব তা চেষ্টা করতে হবে। এ সময়ে উভয় হাত সোজা রাখুন।

পা ঃ (১) শরীরের দুই পাশে হাত ছড়িয়ে যাওয়ার সাথে সাথে পায়ের গোড়ালী ধীরে ধীরে মাটি থেকে উপরের দিকে উঠাতে থাকুন। অর্থাৎ হাত পাশে ছড়িয়ে যাওয়া এবং গোড়ালী মাটি থেকে উপরের দিকে উঠা, একই ছন্দে হবে।

(২) শেষ পর্যায়ে, পায়ের পাতার উপর সম্পূর্ণ শরীরের ভর রাখুন।

কয়েকটি বিশেষ লক্ষ্যণীয় বিষয় ঃ

(১) যখন দুই হাত প্রসারিত হয়ে পেছনের দিকে ছড়িয়ে গেল, এর সাথে সমস্ত শরীরটিও পায়ের পাতার উপর চলে আসলো, ঠিক সে মুহূর্তে ব্যায়ামটি ছন্দের সাথে তাল রেখে বুকটা সম্মুখের দিকে যতদূর সম্ভব প্রসারিত করে দিন।

(২) বুক ফুলিয়ে, যত বেশী পরিমাণে বাতাস গ্রহণ করুন।

(৩) উভয় হাত দুই পাশে প্রসারণের সময় কাঁধ বরাবর উচ্চতা বজায় রাখুন। অর্থাৎ হাত কাঁধ বরাবর উচ্চতা থেকে উপরে উঠবে না বা তার নীচুতেও নামবে না।

অনুশীলনের বিষয় ও উপকারিতা ঃ

সংখ্যা গণনা ঃ

দুই হাত (উপর্যুক্ত বর্ণনার ন্যায়) প্রসারিত হয়ে পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসলে একবার ব্যায়ামটি করা হয়েছে বলে গণনা করা হবে। এভাবে বিরতি না দিয়ে ১০-১৫ বার বা সম্ভব হলে তার চেয়ে বেশী সংখ্যক বার অনুশীলন করুন।

১২। ফুসফুসের ব্যায়াম (Lung Exercise)

শরীরের অবস্থান ঃ

এ ব্যায়ামটি বসে বা আরামে দাঁড়িয়ে করুন।

কসরৎ ঃ

নাকের যে কোন একটি ছিদ্রপথ চেপে বন্ধ করুন এবং নাকের অপর খোলা ছিদ্র পথ দিয়ে যতক্ষণ সম্ভব শ্বাস নিন। যখন দম ধরে রাখতে অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি হতে যাবে, তখন পূর্বের চেপে ধরা ছিদ্র পথ ছেড়ে অপর ছিদ্র পথ চেপে ধরতে হবে এবং খোলা ছিদ্র পথ দিয়ে ধীরে ধীরে দম ছাড়ুন।

উপকারিতা ঃ

এই ব্যায়ামটি, ফুসফুসের আয়তন এবং অক্সিজেন ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত উপযোগী। এছাড়া বুকের (রিপস) অস্থিসংলগ্ন মাংসপেশীগুলো শক্তিশালী করতে সাহায্য করে থাকে। ফুসফুসের রোগের জন্য এটি একটি উপকারী (চিকিৎসা) ব্যায়াম।

বিস্তারিত বিবরণ (মন্তব্যসহ)

শ্বাস-প্রশ্বাস ঃ

হাত ছড়িয়ে ফুসফুস ও বুকের ব্যায়ামের অনুরূপ।

মেরদন্ড সোজা রেখে ব্যায়ামটি করুন।

দম ধরে রাখার ক্ষমতা বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন হয়ে থাকে। তাই দমধরে রাখার সময়কে নির্দিষ্ট করে দেয়া যাচ্ছে না। তাই যত বেশী সময় দম ধরে রাখা যায় তার চেষ্টা করুন। কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে তিন বার ব্যায়ামটি করুন।

অনুশীলনের বিষয় ও উপকারিতা ঃ	বিস্তারিত বিবরণ (মন্তব্যসহ)

১৩। হাত দুলিয়ে ধড় ঘুরানো (Trunk Twisting with Swing)

শরীরের অবস্থান ঃ

সোজা হয়ে আরামে দাঁড়ান। দুই হাত শরীরের দুই পাশে প্রসারিত করুন।

কসরৎ ঃ

কোমরের উপরের অংশ (ধড়) ক্রমশ যতদূর সম্ভব শরীর ডান পাশে ঘুরান। ডানে ঘুরা (মোচড়) শেষে শরীরের আরম্ভ অবস্থায় পুনরায় ফিরে আসুন এবং এ অবস্থায় কোন ছেদ বা বিরতি না দিয়ে বাম পাশে একইভাবে অনুশীলন করুন।

পা ঃ (১) দুই পা যে দূরত্বে থাকলে শরীর আরামে দাঁড়ানো অবস্থান গ্রহণ করে এমনিভাবে দাঁড়ান। এর চেয়ে একটু বেশী প্রসারিত করেও দাঁড়াতে পারেন।

হাত ঃ (২) দুই হাত কাঁধ সমতলে শরীরের ডান ও বাম পাশে সোজাভাবে (উড়ন্ত পাখীর পালকের মত) ছড়িয়ে দিন। হাত (মুষ্ঠি) খোলাভাবে তালু শরীরের সামনের দিকে রাখুন।

(১) উপর্যুক্ত শরীরের অবস্থান নেয়ার পর ছড়িয়ে থাকা উভয় হাত সহ ধড় ডানে মুচড়ে ঘুরাতে হবে। অর্থাৎ মেরুদন্ড অর্ধবৃত্তাকারে মুচড়ে ব্যায়ামটি করতে হবে। এখানে প্রধানত কোমরের উপরের অংশ অনুশীলন করবে।

(২) ডানে ধড় ঘুরানোর সময়ে শরীরের সম্পূর্ণ ভর ডান পায়ের উপর চলে আসবে এবং বাম পায়ের গোড়ালী মাটি থেকে উপরে উঠে, আঙ্গুলের উপর হালকাভাবে (ভরদিয়ে) অবস্থান নিবে। শরীর ডানে ঘুরার শেষ সীমানায় পোঁছানো পর্যন্ত পায়ের অবস্থান এমনিভাবে রাখুন।

(৩) তার পর ধড় আরম্ভ অবস্থায় ফেরার সময়ে শরীরের সম্পূর্ণ ভর ক্রমে ডান পা থেকে সরে দুই পায়ের উপর চলে আসবে এবং এই সময় (গতিকে) না থামিয়ে বাম পাশে (ডান পাশের) অনরূপ ঢঙে ব্যায়ামটি করুন। এভাবে বিরতিহীনভাবে উভয় পাশে পরপর করতে থাকুন।

অনুশীলনের বিষয় ও উপকারিতা ঃ

কয়েকটি বিশেষ লক্ষ্যণীয় বিষয় ঃ

সংখ্যা গণনা ঃ

একবার ডানে এবং একবার বামে ধড় ঘুরানো হলে একবার ব্যায়ামটি করা হয়েছে বলে গণনা করা হবে। এভাবে ১০-১৫ বার করুন।

উপকারিতা ঃ

এ ব্যায়াম ঘাড় ও বাহু, কোমর ও মেরুদন্ড ইত্যাদির পেশী নমনীয় ও শক্তিশালী করতে সাহায্য করে। কাঁধ, পিঠ ও পেটের মেদ কমাতে এটি একটি অন্যতম প্রধান ব্যায়াম হিসেবে পরিচিত।

বিস্তারিত বিবরণ (মন্তব্যসহ)

(১) চর্চার সময়ে মেরুদন্ড, ঘাড় ও মাথা সোজা রাখুন।

(২) ধড় ডানে ঘুরার সময়ে ডান হাত কাঁধ বরাবর সোজা থাকবে এবং বাম হাতের কনুই ভাঁজ হয়ে ডান বুকের উপর আলতোভাবে থাকবে। বিপরীত (বামে) পাশে ঘুরার সময় হাতের ঢঙ বিপরীত-ভাবে হবে। অর্থাৎ ডান বুকের উপর ভাজ হয়ে থাকা বাম হাতের কনুই (কাঁধ বরাবরে) ক্রমশ সোজা হয়ে থাকবে এবং ধড় বাম পাশে ঘুরবে। এ সময়ে ডান হাত ক্রমশ ভাঁজ হয়ে বাম বুকের উপর আলতোভাবে রাখুন।

(৩) ডানে-বামে ঘুরার ছন্দময় গতি ধীরে ধীরে বাড়াতে হবে। সহনীয় পর্যায় পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে গতি বাড়বে। আবার একইভাবে কমতে থাকবে এবং স্থির অবস্থায় চলে আসুন।

(৪) এই ব্যায়ামে মাথা, ঘাড় ও চোখের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। তাই ঘাড় ডানে ঘুরার সময়ে (ঘাড় ও মাথা একত্রে ঘুরে) দৃষ্টি থাকবে ডান হাতের দিকে এবং বামে ঘুরার সময়ে দৃষ্টি বাম হাতের দিকে রাখুন।

শ্বাস-প্রশ্বাসঃ স্বাভাবিকভাবে চলতে থাকবে।

অনুশীলনের বিষয় ও উপকারিতা ঃ	বিস্তারিত বিবরণ (মন্তব্যসহ)

১৪। বিপরীত হাত-পা স্পর্শ (Alternate Leg Touch)

শরীরের অবস্থান ঃ

দুই পা ফাঁক করে দাঁড়ান

একজন মাঝারী উচ্চতা সম্পন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে দুই পায়ের দূরত্ব ৩৬-৪০ ইঞ্চি হতে পারে। স্বাভাবিকভাবে বলা যায় যে, অপেক্ষাকৃত লম্বা ব্যক্তির দু'পায়ের দূরত্ব বেশী এবং খাট ব্যক্তির জন্য দূরত্ব কম হবে। তবে, একজন নিয়মিত অনুশীলনকারী নিজের অবস্থা বুঝে যতটুকু পারেন, বেশী পা-ছড়ানোর চেষ্টা করুন।

কোমরের উপরের অংশ সম্মুখে ঝুকান ও হাত ছড়িয়ে দিন।

(১) এমনভাবে সম্মুখে ঝুকাতে হবে যার ফলে শরীরের উপরের অংশ (মাথা, ঘাড়, ও মেরুদন্ড) মাটির সমান্তরালে থাকে।

(২) মেরুদন্ড ও মাথা বাঁকা হয়ে মাটির দিকে (বেশী) নুয়ে যাবে না বা কোমরের উচ্চতা থেকে উঁচুতে উঠেও যাবে না। এমনি অবস্থায় ডান হাত এবং বাম হাত (কাঁধ বরাবরে) দুই পাশে (উড়ন্ত পাখীর পালকের মত) সোজা করে ছড়িয়ে দিন, হাত (মুষ্ঠি) খোলা ও তালু মাটির দিকে রাখুন।

(৩) উভয় হাঁটুকে সোজা রাখুন।

কসরৎ ঃ

মেরুদন্ড ও কোমরের উপরের অংশ মোচড় দিয়ে ঘুরিয়ে ডান ও বাম পায়ের পাতা স্পর্শের চেষ্টা করুন।

(১) উভয় হাত সোজা রেখে কোমরের উপরের অংশ ধীরে ধীরে (শরীর মোচড় দিয়ে) বাম পাশে ঘুরান। যখন, ডান হাত বাম পায়ের কাছাকাছি এসে যাবে, তখন (বাম পায়ের পাতা) স্পর্শ করার

অনুশীলনের বিষয় ও উপকারিতা ঃ	বিস্তারিত বিবরণ (মন্তব্যসহ)
সংখ্যা গণনা ঃ প্রতিবার বাম পা স্পর্শকে একবার গণনা করে ২০-৩০ বার ব্যায়ামটি করুন।	চেষ্টা করতে হবে। এমনি অবস্থায় বাম হাত (সোজা হয়ে) আকাশের দিকে থাকবে। অনুরূপভাবে বিপরীত হাত ও পায়ে স্পর্শ করুন। (২) ধড় বামে ঘুরানোর সময়ে বাম হাতের তালুর দিকে দৃষ্টি রাখুন। বিপরীত (ডান) পাশে ব্যায়ামটি করার সময় অপর হাতের দিকে লক্ষ্য রাখুন। (৩) ব্যায়ামে ছন্দ বজায় রেখে প্রথমত ধীরে এবং ক্রমে লয় বাড়িয়ে যতটুকু সম্ভব দ্রুতভাবে অনুশীলনের চেষ্টা করুন।
উপকারিতা ঃ এ ব্যায়াম ঘাড়, বাহু, কাঁধ, বুক, পিঠ, পেট ও কোমরের মেদ কমাবে। এছাড়া বাহু, পিট, বুক ও ঘাড়ের পেশী পুষ্ট হয় এবং শরীরের নমনীয়তা বাড়ায়। এ ব্যায়ামটির বিশেষ উপকার হচ্ছে যে, মেরুদন্ডের হাড়ের জোড়া নমনীয় ও শক্তিশালী করতে সাহায্য করে।	(৪) ডান হাতে বাম পা স্পর্শ করার পর কোন বিরতি না দিয়ে পূর্বাবস্থায় ফিরে যেতে হবে এবং এখানে কোন বিরতি বা ছেদ না দিয়ে বিপরীত পাশে (বাম হাতে ডান পা স্পর্শ) একইভাবে চর্চা করুন। **শ্বাস-প্রশ্বাসঃ** স্বাভাবিকভাবে চলতে থাকবে।
১৫। বুকডন বা পুশ-আপ (Push-up Exercise) **শরীরের অবস্থান ঃ** সমতল মেঝের উপড়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ুন। দুই পা একত্রে (একসাথে মিশে) বা কাঁধ বরাবর দূরত্ব রাখুন।	পাঃ (১) এ সময়ে শরীর সোজা রাখুন। (২) হাঁটু সোজা হয়ে পায়ের আঙ্গুল গুলো মাটির দিকে এবং মাটি স্পর্শ করে

অনুশীলনের বিষয় ও উপকারিতা ঃ	বিস্তারিত বিবরণ (মন্তব্যসহ)

থাকবে। পায়ের গোড়ালী আকাশের দিকে রাখুন।

(৩) এ অবস্থায় মুখ শরীরের ডান অথবা বাম পাশে ঘুরে মেঝের উপর রাখুন।

হাত ঃ (১) দুই হাতের কনুই ভাঁজ করে বাহু বরাবরে মেঝের উপর (হাতের তালু) স্থাপন করুন।

(২) হাতের আঙ্গুলগুলো সোজা হয়ে পাশাপাশি মিশে সামনের (মাথার) দিকে নির্দিষ্ট থাকবে।

(৩) ভাঁজ করা উভয় হাতের কনুই পাঁজরের (শরীরের) সাথে মিশে বা সামান্য ফাঁকে রাখুন।

কসরৎ ঃ

ভাঁজ হয়ে থাকা দুই হাতের কনুই একত্রে ক্রমশ (শরীরকে উপরের দিকে উঠিয়ে) সোজা হবে। এবং এ অবস্থা থেকে হাত ভাঁজ হয়ে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনুন।

(১) এ সময়ে মাথা, মেরুদন্ড ও পা একই সমতলে সোজা রাখুন। সমস্ত শরীরের ভর দুই হাত এবং দুই পায়ের আঙ্গুলের উপর রাখুন।

(২) দুই হাতের কনুই সোজা হতে শরীর মেঝে হতে যতটুকু উঁচুতে উঠতে পারে, ঠিক ততটুকুই উপরে তুলুন।

(৩) তারপর এখান থেকে হাত ভাঁজ হয়ে পূর্বাবস্থায় ফিরে আসবে। ফিরার সময়ে একইভাবে শরীর সোজা রাখুন।

(৪) এই অবস্থায় বিশ্রাম নেয়ার জন্য মেঝেতে শরীর স্পর্শ করা যাবে না। অর্থাৎ বিশ্রাম ছাড়া ব্যায়াম চালাতে থাকুন।

সংখ্যা গণনা ঃ

হাতের কনুই সোজা হয়ে শরীর উপরে তুলে এবং (কনুই ভাঁজ হয়ে) পূর্বাবস্থায় ফিরে আসলে, একবার ব্যায়ামটি করা হয়েছে বলে গণনা করা হবে। এভাবে ৮-১০ বার বা যতগুলো বেশী পারা যায় করুন।

অনুশীলনের বিষয় ও উপকারিতা ঃ	বিস্তারিত বিবরণ (মন্তব্যসহ)
উপকারিতা ঃ এ ব্যায়ামে বাহু ও বুকের আয়তন বাড়ে। বেশীর ভাগ বৃহৎ মাংসপেশী গুলোর উপর প্রভাব ফেলে শরীরের ক্ষমতা ও শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য এটি একটি অন্যতম ব্যায়াম হিসেবে সর্বজনবিদিত।	(৫) ব্যায়ামটি অনুশীলনের গতি প্রথমে ধীরে হবে এবং ক্রমশ যতটুকু সম্ভব গতি বাড়িয়ে দিন। শ্বাস-প্রশ্বাস ঃ কসরৎটি করার সময়ে শ্বাস প্রশ্বাসের একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। তাই, শরীর মাটি থেকে উপরে উঠার সময়ে শ্বাস নিতে নিতে উঠবে এবং পূর্বাবস্থায় যাওয়ার সময়ে শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে ফিরুন।

গ্রন্থপঞ্জি

১। আব্দুল আলীম, কাজী, (১৯৯৩), *সুস্থ দেহে দীর্ঘ জীবন*। ঢাকা ঃ সারোয়ার প্রিন্টিং হাউস।

২। রুস্তম আলী, শেখ, (১৯৭৯), *ব্যায়াম*। ঢাকা ঃ খলীলী প্রেস।

৩। Fox, Edward, L., (1984), *Sports Physiology*. Tokyo, Japan CBX College Publishers.

৪। Nation Coaching Federation, (1994). *The Body in Action*. Leeds : NCF..

৫। Rajan, Captain, M., (1985), *Yoga Straching and Relaxation for Sportsmen*. New Delhi, India : Allied Publishrs Pvt. Ltd..

পুস্তক পর্যালোচনা ঃ বাঙালী জীবনে রমণী

(লেখক ঃ নীরদ চন্দ্র চৌধুরী)

অলকা রাণী রায় *

ভূমিকা

'বাঙালী জীবনে রমণী' নীরদ চন্দ্র চৌধুরীর প্রথম প্রকাশিত বাংলা গ্রন্থ। ১৯৬৮ সালে কলিকাতা হতে বইটি প্রকাশিত হয়। প্রকাশক মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। বাংলাদেশে ২৬শে মার্চ, ১৯৯০ সালে পল্লব পাবলিশার্সের পক্ষে মোঃ গোলাম আলি কর্তৃক ৩১, মিরপুর রোড, ঢাকা-১২০৫ থেকে বাংলাদেশ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ভারতীয় সংস্করণে বইটির প্রচ্ছদ এঁকেছেন আশু বন্দোপাধ্যায় এবং বাংলাদেশ সংস্করণে প্রচ্ছদ এঁকেছেন সমর মজুমদার। দুটি ভিন্ন সংস্করণই বোর্ড বাঁধাই। প্রচ্ছদের চিত্রে রয়েছে ভিন্নতা, ভারতীয় সংস্করণে প্রচ্ছদে রয়েছে কালো মলাটের উপর গেলাপী রং এর একটি বৃত্ত এবং বাংলাদেশ সংস্করণে রয়েছে একটি নারী মূর্তি। তার হাতে একটি ফুল এবং একটি প্যাঁচানো রশির চিত্র। প্রচ্ছদের তাৎপর্যে নারী অবহেলিতা, সংস্কারে বন্দিনী এবং প্রতিবন্ধকতার আবর্তে নিমজ্জিত। চিত্রে এটি প্রকট হয়েছে।

বইটিতে ৬টি পরিচ্ছেদ রয়েছে এবং এক একটি পরিচ্ছেদের এক একটি নামকরণ করা হয়েছে। যথা ঃ প্রথম পরিচ্ছেদ- কাম ও প্রেম, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ-দেশাচার, তৃতীয় পরিচ্ছেদ-বাংলার দৃশ্য ও বাঙালীর ভালবাসা, চতুর্থ পরিচ্ছেদ-বাঙালী সমাজ ও নতুন ভালবাসা, পঞ্চম পরিচ্ছেদ-বাঙালীর মন ও ভালবাসা, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ-মন্ত্রদ্রষ্টা বঙ্কিম। এছাড়া রয়েছে লেখকের পাঠক পাঠিকাদের প্রতি নিবেদন, ভূমিকা-যার শিরোনাম লেখক দিয়েছেন বিষয়টা কি? উপসংহার এবং সূচি। বইটি একটি প্রবন্ধ সাহিত্যের আকারে লিখিত। চিরায়ত বাংলার জীবন যাত্রায় নারীর অবস্থান, প্রাচীন ও সমকালীন সাহিত্যে নারীর প্রকাশ ও সামাজিক জীবনে নারীর ভূমিকা ও তার অধিকারের পরিমাপ করার প্রয়াস পেয়েছেন লেখক বইটিতে। তীর্যক দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে নারীকে। পুরুষতান্ত্রিক বাঙালী সমাজে কতটুকু মর্যাদায় নারী আসীন, তার তুলমূল্য বিচার লেখক করতে চেয়েছেন। পুরুষ যে মানদন্ডে মূল্যায়িত হয়, নারীর

---

* ঊনবিংশ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পাঠক্রমের প্রশিক্ষণার্থী (ক্রমিক নং গ-৩১৬), বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

ক্ষেত্রে সে একই মানদন্ড যে ব্যবহৃত হয় না এটাকে প্রস্ফুটিত করা হয়েছে এখানে। বিংশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তে নারী স্বাধীনতার আন্দোলনের রৌদ্র করোজ্জ্বল প্রহরে নারী কি মানবী না কোন বস্তু সে প্রশ্নটাই লেখক এখানে পাঠক পাঠিকাদের প্রতি ছুড়ে দিয়েছেন।

বইটি প্রকাশের পর আজ দীর্ঘদিন গত হলেও এখনও নারী অবস্থানের খুব একটা পরিবর্তন হয়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। ব্যক্তি হিসেবে নর-নারীর মধ্যে যে নিবিড় ও বিশিষ্ট মানসিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় সে পরিধির মধ্যেই বইটির লেখা সীমাবদ্ধ। বইটির প্রধান বিষয় স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক। এ সম্পর্ক চির রহস্যময়। প্রেম বা ভালবাসা বোঝাবার বা বুঝবার কোন জিনিষ নয়,উপলব্ধির বিষয়, বইটিতে লেখক নীরদ চন্দ্র চৌধুরী এ কথাটিই বোঝাতে চেয়েছেন।

লেখক পরিচিতি

নীরদ চন্দ্র চৌধুরী ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তৎকালীন পূর্ববাংলার, অধুনা বাংলাদেশের ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা উপেন্দ্রনারায়ন, মা সুশীলা সুন্দরী। তের বছর বয়স পর্যন্ত ছিলেন জন্মভূমিতে, এরপর চলে যান কলিকাতায়। বি, এ পরীক্ষায় ইতিহাসে অনার্সে প্রথম শ্রেনীতে প্রথম, এম, এ পরীক্ষায় দুটি পেপার দিয়ে আর দেননি। আনুষ্ঠানিক লেখাপড়ার এখানেই অবসান। পরীক্ষা ও পাঠ্যপুস্তক সম্পর্কে বিতৃষ্ণা ছিল তাঁর, জ্ঞানতৃষ্ণা ছিল আশৈশব ও অতি প্রবল। একটানা বেশীদিন চাকরি করেননি কোথাও। ১৯২৮ সালে মডার্ন রিভিউতে সহকারী সম্পাদকের চাকরি। ১৯৩২ এ বিবাহ। স্ত্রী অমিয়া চৌধুরানী। বিয়ের পর মডার্ন রিভিউর চাকরি ছাড়েন। তিরিশের দশকের শেষে শরৎচন্দ্র বসুর সচিব নিযুক্ত হন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় কলিকাতা রেডিওতে যুদ্ধের ঘটনাবলীর ভাষ্যকার ছিলেন। পরে ১৯৪২ সালের মার্চ মাসে "অল ইন্ডিয়া রেডিও"তে চাকরি পেয়ে দিল্লী চলে যান। সেখান থেকেই অবসর। ১৯৭০ সাল থেকে বিলেতে আছেন। এখন ব্রিটিশ নাগরিক। ১৯৫১ সালে প্রথম বই- "The Autobiography of An Unknown Indian",১৯৫৯ সালে- "A Passage to England" ১৯৬৫ সালে- "The Continent of Circe". ১৯৬৭ সালে- "The Intelectual in India". ১৯৭০ সালে- "To live or Not to live", ১৯৭৪ সালে "Scholar Extraordinary" (ম্যাক্সমুলার জীবনী), ১৯৭৫ সালে "Clove of India." ১৯৭৬ সালে "Culture in the Vanity Bag" ১৯৭৯ সালে"Hinduism "১৯৮৭ সালে- "The hand, Great Anarch" (আনন্দ পুরস্কার প্রাপ্ত), ১৯৮৮ সালে দ্বিতীয় বাংলা বই- "আত্মঘাতী বাঙালী" (১ম খন্ড) ও ১৯৯২ সালে ২য় খন্ড, ১৯৯৪ সালে-"আমার দেবোত্তর সম্পত্তি" এবং ১৯৯৬ সালে "আত্মঘাতী বাঙালী" ৩য় খন্ড প্রকাশিত হয়। ১৯৮৯ সালে পেয়েছেন অক্সফোর্ডের সম্মানীত ডি, লিট ডিগ্রী। ১৯৯৩ সালে ইংল্যান্ডের রাণী তাঁকে C. B. E. উপাধি প্রদান করেন।

মূল বিষয়বস্তু

বইটির মূল বিষয়বস্তু ছয়টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করে লিখিত হয়েছে। প্রতিটি পরিচ্ছেদই একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ প্রবন্ধ। এখানে পরিচ্ছেদ-ওয়ারী প্রবন্ধগুলির সংক্ষিপ্তসার বর্ণনা করা হল ঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ কাম ও প্রেম

প্রেম ও কামনার পারস্পরিক সম্পর্ক এবং অবস্থান সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। প্রেমের প্রাচীন ও আধুনিক উদ্ধৃতি সহকারে আলোচনা করা হয়েছে। ভারতচন্দ্র, জয়দেব, কালিদাস সহ অনেক প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের উদ্ধৃতি লেখক ব্যবহার করেছেন প্রেমের ধারণা প্রকাশের নিমিত্তে। ইংরেজ কবি সাক্‌লিং এবং ডি, এইচ, লরেন্স এর ইংরেজি কোটেশানও ব্যবহার করা হয়েছে। প্রেম শুধুমাত্র মনোজাগতিক, অবস্তুগত, আবেগায়ত বিষয় নয় এর সঙ্গে জাগতিক সম্পর্কও বিদ্যমান থাকে। আবার কাম শুধুমাত্র জৈবিক তাড়না বা ইন্দ্রিয় সুখ প্রক্রিয়া নয় এর সঙ্গে মানসিক প্রস্তুতিসহ সমমানসিকতার সমন্বয় থাকতে হয়, আবেগ থাকতে হয়, পারস্পরিক আকর্ষণবোধ থাকতে হয়; নতুবা কাম শুধুমাত্র যান্ত্রিকতায় পর্যবসিত হয়। কামের অশ্লীল বহি:প্রকাশ হল লুচ্চামি যা প্রাচীন বাঙালী সমাজে বিস্তার লাভ করেছিল বর্তমানেও এর খুব একটা ব্যত্যয় ঘটেনি। প্রেম যতটা বাঙালী সমাজে প্রকাশিত, তার চেয়ে বেশীমাত্রায় প্রকটিত হয়েছে কামনা। তথাপি প্রেমকে বাদ দিয়ে কাম নেই। বিশুদ্ধতম, পবিত্রতম প্রেমেও কাম আছে। কামবর্জ্জিত প্রেম নেই। প্রেমের চরম আত্মসমর্পণ ঘটে কামনা তৃপ্তির মাধ্যমেই। প্রেম ও কাম নর-নারী জীবনে অবিচ্ছেদ্য ও পরিপূরক দু'টি আবশ্যকীয় ধারা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ দেশাচার

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে উনবিংশ শতাব্দির প্রথমে বাংলার বাঙালী সমাজে শুরু হয় অবাধ যৌনতা, কামের বিকৃত রূপ। এর সাথে প্রেমের কোন সংশ্রব ছিল না, ছিল না কোন আদর্শ। এক ইতরীকৃত লালসা মিটানোর প্রবৃত্তিতে তৎকালীন বাঙালী সমাজ মাতোয়ারা হয়ে ওঠে। এখানে প্রেমের কোন স্থান ছিল না। তৎকালীন বাঙালী ধনিক শ্রেণী, মধ্যবিত্ত শ্রেণী, ব্যবসায়ী শ্রেণী স্ত্রীর সংগে রাত কাটানোকে অমর্যাদাকর মনে করত। নিজেদের অভিজাত্য প্রদর্শনে জন্য রাখত রক্ষিতা, রাত কাটাত বারবণিতার ঘরে। স্ত্রীর থেকে রক্ষিতা বা বারবণিতার ছিল বেশী সামাজিক মর্যাদা। এ অবক্ষয় যুগের অবস্থা এ প্রবন্ধে লেখক অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। এ সময়ে সমাজে পত্নী উপেক্ষিতা, অন্তপুরবাসীনী, স্বামী সঙ্গসুখ বঞ্চিতা এমনকি স্বামী দর্শনলাভে হতেন ব্যর্থ। গণিকারাই ছিল তৎকালীন পুরুষের একমাত্র আকর্ষণ, এমনকি স্ত্রীর অলংকার বিক্রি করেও গণিকাগমন ছিল নিত্যকার ঘটনা।

প্রবন্ধটিতেও লেখক ব্যবহার করেছেন সে সময়কার বিভিন্ন বাঙালী লেখক ও কবিদের উক্তি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ বাংলার দৃশ্য ও বাঙালীর ভালবাসা

এ প্রবন্ধটিতে লেখক বাঙালীদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য প্রীতির পরিচয় তুলে ধরেছেন। এটাকে লেখক ভালবাসার এক নতুন রূপ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সম্পর্কে অনেক বাঙালী কখনই সচেতন হয় নাই বরং রয়েছেন নিস্পৃহ। বাংলার জল, বায়ু, আকাশ, নদী এই শ্যামল শস্য-ক্ষেত্র যা লেখকের হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে, তা সম্পর্কে বাঙালী কত উদাসীন তা লেখক এখানে বুঝাতে চেয়েছেন। এখানে তিনি নিজেকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে এখনও গ্রাম্য লেখক বালক হিসেবে ভাবতে ভালবাসেন বলে প্রকাশ করেছেন। বাঙলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বোঝাতে তিনি জ্ঞানদাস, ভারতচন্দ্রের 'বরষার বর্ণনা' ব্যবহার করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকেও এখানে বিভিন্ন উক্তি তিনি ব্যবহার করেছেন। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী কত মোহনীয় তা লেখক এখানে বোঝাতে চেয়েছেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ বাঙালী সমাজ ও নতুন ভালবাসা

এ পরিচ্ছেদে বাঙালী সমাজে একটা রুচিশীল পরিবর্তনের দিক বর্ণনা করা হয়েছে। বাঙালীর জীবনে একদিকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যবোধ অন্যদিকে সামাজিক ও পারিবারিক জীবনেও অভ্যুদয় ঘটে। কামে নিয়োজিত রিপু নির্বাপিত হয়ে সূক্ষ্ম মার্জিত প্রেমানুভূতি পারিবারিক জীবনে বিকাশ লাভ করে। পত্নীগণ তাদের মর্যাদা পেতে শুরু করেন, গণিকাবৃত্তি সংকুচিত হয়ে আসে। এ সময় দু'ধরনের সমাজব্যবস্থা দেখা যায়। শহুরে ও গ্রামীণ। পল্লী পরিবেশে প্রেম ভালবাসার প্রকাশ পায় সারল্য, শহুরে প্রেমে প্রকাশ পায় পাশ্চাত্য রীতি। বাংলা সাহিত্যে আবির্ভাব ঘটে রোমান্টিক প্রেমের, সমাজে শৃঙ্খলা বোধ প্রবাহিত হয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ বাঙালীর মন ও ভালাবাসা

এক সময় বাঙালী জীবন কাম পঙ্কিলতায় আচ্ছন্ন ছিল, তা দূরীভূত হয়ে শুরু হয় প্রেমের প্লাবণ। নারী শুধু ভোগ্যসামগ্রী নয় প্রেমের দেবীও বটে, এ কথাটি বাঙালীরা ভাবতে শুরু করেন। এ প্রবন্ধে লেখক এ কথাটি বর্ণনা করেছেন। ইংরেজি সাহিত্য ও পাশ্চাত্য জীবন হতে প্রেমের নতুন রূপের সন্ধান লাভ করার পর উনবিংশ শতাব্দির শেষের দিকে বাঙালী এর আকর্ষণে হয়েছিল বিভোর। বাঙালী মেয়েদের মনেও প্রেমের বিকাশ লাভ করে পূর্ণভাবে যা এতদিন ছিল প্রচ্ছন্ন অবস্থায়। রবীন্দ্রনাথের রচনাতেও এ সময়কার প্রেমের ব্যাপক বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়। লেখক রবীন্দ্র সাহিত্য থেকে ব্যাপক উদ্ধৃতি এখানে ব্যবহার করেছেন।

স্বাতন্ত্র এখানে বিদ্যমান রয়েছে। মুদ্রণগত সামান্য ক্রটিই এখানে ধরা পড়ে। বাক্যবাণ ও ভাষাগত ব্যত্যয় ঘটেনি কোথাও। সমস্ত বইটিই সাধু ভাষায় লিখিত, ফলে অনেক জায়গায় লেখক জটিল বাক্য ব্যবহার করেছেন। বইটিতে কোন ছন্দপতন দেখা যায় না। সার্বিক বিচারে কাঠামোগত ক্রটি বইটিতে নেই।

সার্বিক আলোচনা

নীরদ চন্দ্র চৌধুরী বাংলা সাহিত্যে ধ্রুপদী কোন লেখক নন। তিনি উপন্যাসিক নন, কবি নন, গল্পকার নন, সমালোচকও নন, তথাপিও তিনি লেখক। তীর্যক দৃষ্টিসম্পন্ন ক্ষুরধার লেখনী শক্তির অধিকারী সমাজবিক্ষণী লেখক। তাঁর দৃষ্টিতে রাষ্ট্র, সমাজ, পরিবার, ব্যক্তি, প্রাচ্য-পাশচাত্য তীক্ষ্ণভাবে পর্যালোচিত হয়েছে। তিনি নিজেকেও সমালোচনা করেছেন। বর্তমান গ্রন্থটি নীরদ চন্দ্র চৌধুরীর তেমনি একটি সমাজবীক্ষণধর্মী রচনা। এ রচনায় তাঁর দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা, বাংলা সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি, বাঙালী সমাজ পরিবর্তনের রীতি, নারীদের অবস্থান প্রভৃতি সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। বইটিতে অত্যন্ত অকপটে লেখক নারী সম্পর্কে বাঙালী পুরুষ সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী বর্ণনা করেছেন। লেখককে একদিকে নৃতাত্ত্বিক ও ইতিহাসবেত্তা বলে মনে হয়েছে। পাঠকের চোখে আঙ্গুল দিয়ে নারী বঞ্চনার দৃশ্য দেখিয়ে দিয়েছেন। প্রেম জীবনে সৌন্দর্য আনে। নারী ও বাংলার প্রকৃতি যে প্রেমের চিরায়ত উৎস, তা লেখক বর্ণনা করার প্রয়াস পেয়েছেন। কাম বিচ্ছিন্ন কোন প্রেম থাকতে পারে না, কামেই প্রেমের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি ঘটে, এসত্যটি লেখক সুন্দরভাবে প্রস্ফুটিত করেছেন। বইটিতে প্রবন্ধগুলি সুন্দর ও ধারাবাহিকভাবে সাজানো হয়েছে। বিভিন্ন লেখক ও কবির উক্তি তিনি বিষয়ের প্রয়োজনে যথাস্থানে ব্যবহার করেছেন। শব্দচয়ন ও বাক্যগঠন রীতি ব্যতিক্রমী ও আকর্ষক।

বইটিতে লেখক উদ্ধৃতি ব্যবহারে বিশেষ পক্ষপাতিত্বের দোষে দুষ্ট হয়েছেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথকে প্রাধান্য দিয়েছেন। সমাজ পরিবর্তনে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে পথিকৃৎ হিসেবে হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এক্ষেত্রে লেখক কিছুটা একপেশে চিন্তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তৎসময়কার সমাজ পরিবর্তন আন্দোলনের পুরোধা ঈশ্বরচন্দ্র, রাজা রামহোন রায়, কালী প্রসন্ন সিংহ এদেরকে লেখক এড়িয়ে গেছেন। তিনি ইংরেজি সাহিত্য এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতি আমাদের সমাজের ক্লেদাক্ত পরিবেশ পরিবর্তনের উৎস বর্ণনা করে আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে কিছুটা হেয় করেছেন। বইটিতে তিনি হিন্দু সমাজ ব্যবস্থায় নারীর অবস্থান বর্ণনা করেছেন কিন্তু বাঙালী সমাজে মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে নারীর অবস্থান কি তা বর্ণনা করেননি। বাঙালী সমাজ বলতে তিনি উচ্চবিত্ত, উচ্চবর্ণের হিন্দুদের বুঝিয়েছেন, অন্য বর্ণের বা সাধারণ মানুষ তাঁর আলোচনায় আসেনি। কিছু অশ্লীল ও আঞ্চলিক শব্দ বইটিতে ব্যবহার করা হয়েছে যা লেখক ইচ্ছে করলে পরিহার করতে পারতেন। শৃঙ্গাররস ও আদিরসাত্মক উদ্ধৃতি ব্যবহার অনেক সময় অশ্লীল মনে হয়েছে। তবে লেখক

বিষয়ের প্রয়োজনে ব্যবহার করেছেন বলে কৈফিয়ৎ দিয়েছেন। বইটিতে লেখক কোন অসত্য ভাষণ প্রদান করেন নাই। পাঠককে তিনি বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন পরিবেশের সাথে সহজে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। এখানেই লেখকের কৃতিত্ব।

উপসংহার

বইটি একটি ব্যতিক্রমী সাহিত্য সৃষ্টি নিঃসন্দেহে। পঠনে কখনও একঘেয়েমী বোধ জাগ্রত হয় না। নারীদের প্রতি মূল্যায়নের নতুন ভাবনা এনে দেয় যে কাম ও প্রেম জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এ সত্যটি পাঠকের কাছে প্রকট হয়ে উঠে, এখানেই লেখকের সাফল্য। বাঙালী সমাজ বলতে তিনি শুধু উচ্চবর্ণের হিন্দু দ্বারা গঠিত সমাজ বোঝাতে চেয়ে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। পাশ্চাত্য ও ইংরেজির প্রতি আসক্তি এটাও লেখকের ব্যর্থতা। তাঁর মত সব্যসাচী লেখকের কাছে এ ধরনের মামুলী পক্ষপাত আশা করা যায় না। বইটি সাহিত্যের বিচারে উন্নত গুণগত মানের অধিকারী। যদিও সাহিত্যের নন্দনতত্ত্ব এখানে বিধৃত হয়নি, তথাপি প্রবন্ধগুলি গীতিধর্মী ও নান্দনিক। বইটিতে লেখক প্রেমবর্জিত জীবন ক্লেদাক্ত, প্রেমপূর্ণ জীবন সৌন্দর্যমন্ডিত, নারী এই প্রেম ও সৌন্দর্যের পাত্রী, এ কথাটি বোঝাতে চেয়েছেন এবং তিনি এক্ষেত্রে সর্বাত্মক সফলতার দাবীদার। প্রবন্ধ সাহিত্য মানুষকে/পাঠককে এমন আকর্ষণ করতে পারে "বাঙালী জীবনে রমণী" বইটি তার জলন্ত উদাহরণ। বাংলা সাহিত্যে এ ধরনের গ্রন্থ দ্বিতীয়টি নেই। তবে কালীপ্রসন্নের "হুতোম প্যাঁচার নক্শা" (যা আধুনিক কালের নয়), হুমায়ুন আজাদের 'নারী'(বইটি ধারণা থেকে অনেক দূরে) তুলনামূলক আলোচনায় 'বাঙালী জীবনে রমণী'র সমকক্ষ নয়। বইটি একটি ব্যতিক্রমী সাহিত্য প্রয়াস। পাঠক সমাজে বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

লোক প্রশাসন সাময়িকী
দশম সংখ্যা, ডিসেম্বর ৯৭, পৌষ ১৪০৪

বাংলাদেশ সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি

মোঃ হাসিবুর রহমান *

ভূমিকা

'দারিদ্র্য বিমোচন' চিন্তাটির উদ্ভব হয় প্রাক্তন রাশিয়া (বর্তমান সি, আই, এস) এর 'দারিদ্র্য ভাগাভাগি' Poverty sharing তত্ত্ব থেকে। ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের পরে লেনিন নিউ ইকোনোমিক পলিসি বা নয়া অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণের (১৯২১ সালে) আগের সময়টিতে "Work according to ability and take according to necessity" বা "সামর্থ অনুসারে কাজ কর এবং দরকারমত নাও" নীতির ভিত্তিতে দেশ চালান। তিনি খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, যাতায়াত ভাড়া, বাসস্থানের ভাড়া, বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানির বিল, স্বাভাবিক আমোদ প্রমোদের (বর্তমানের রেডিও টিভির মত) খরচের মত মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর পর যা উদ্বৃত্ত থাকতো তা ব্যক্তিবিশেষের সঞ্চয় বা ব্যাংক-ব্যালান্স গঠনের মত স্বাধীনতা না দিয়ে জোরপূর্বক সরকারী খাতে পুঁজি গঠনের জন্য অস্ত্র, ভারী যন্ত্রপাতি, ন্যূনতম খাদ্য ইত্যাদি এবং কারখানার উন্নতি ও উৎপাদনের জন্য সংগ্রহ করতে থাকেন। ব্যক্তি উদ্যোগের অভাবে উৎপাদন হ্রাস পেলে ১৯২১ সালে তিনি 'New Economic Policy' নেন।

১৯২৪ সালে লেনিনের মৃত্যুর পরও ১৯২৬ সাল পর্যন্ত 'ব্যক্তিমালিকানা' চলতে থাকে। কিন্তু স্তালিন ক্ষমতায় এলে সবই আবার সরকারী মালিকানায় নিয়ে আসেন। এই কারণে আবার ধীরে ধীরে উৎপাদন কমতে থাকে এবং আয়ের বৈষম্য বাড়তে থাকে। গর্বাচেভ ক্ষমতায় এসে আবার উৎপাদনের ব্যক্তিমালিকানা কায়েম করেন এবং আমলাদের ক্ষমতা হ্রাস করায় হাত দেওয়াতে ক্ষমতাচ্যুত হন। বর্তমানে কৃষিতে Collective বা যৌথ মালিকানা এবং অন্যত্র ব্যক্তিমালিকানা স্থাপিত হলেও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে আয়ের বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়ে অনেকের জন্য নতুনভাবে দারিদ্র্যের সৃষ্টি হয়েছে। খাদ্যের অভাব দেখা দিয়েছে। ফলে রাশিয়া বর্তমানে আই এম এফ এর সদস্য পদ লাভ করে ধনতান্ত্রিক দেশের সাহায্য গ্রহণের জন্য হাত

---

* পরিচালক, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

বাড়িয়েছে এবং 'New Classical Price Paradigm' বা নয়া ক্লাসিক্যাল মূল্য প্রভাব ছাড়াও ব্যাংকিং, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, আন্তর্জাতিক মূল্য বিবেচনা করে দেশীয় উৎপাদন পরিকল্পনা ইত্যাদির সংশোধনমূলক ব্যবস্থায় হাত দিয়েছে। আয়ের বৈষম্য দূর করে, জাতীয় আয়ের বৈষম্য কমিয়ে দারিদ্র্য দুরীকরণের মাধ্যমে ভোক্তা সম্প্রদায়ের জন্য সমান 'Effective Demand' বা কার্যকর চাহিদা তৈরী করে ভোগ্যপণ্যের বাজার উন্নয়নের জন্যও প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

উন্নয়নশীল দেশের বাজার ও উন্নয়নশীল দেশ

সমাজতান্ত্রিক ও তাদের অনুসারী পূর্ব ইউরোপীয়, ল্যাটীন আমেরিকান দেশ, ভারত,বাংলাদেশ, নেপালের সঙ্গে সঙ্গে ধনতান্ত্রিক দেশের সাহায্যদাতা সংস্থাসমূহও এই দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচিতে সাহায্য প্রদানের জন্য চিন্তাভাবনা শুরু করেছে। কারণ বর্তমান বিশ্বে মানবতা এবং বাজার উন্নয়ন ধনতান্ত্রিক দেশের দুটি মুখ্য শ্লোগান। বাংলাদেশ ও ভারতসহ পূর্ব ইউরোপীয়দেশসমূহ ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। বাংলাদেশ আয়তনে ছোট হলেও জনসংখ্যার দিক দিয়ে এটি একটি প্রথম সারির দেশ। এখানকার সকল গরীব মানুষকে যদি ধনী বানানো যায়; তাহলে এটি হবে পশ্চিমা দেশগুলোর জন্য ভোগ্যপণ্য, হালকা শিল্প সামগ্রী, ভারী যন্ত্রপাতি ও অস্ত্র বিক্রয়ের জন্য একটি উত্তম বাজার। এতগুলো লোকের আয় বাড়ার সাথে সাথে বাড়বে তাদের কার্যকর চাহিদা এবং সেই সঙ্গে বাড়বে ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন ও আমদানী। এই উৎপাদন ও আমদানীতে কমবে বেকার সমস্যা এবং এই ভাবে ধীরে ধীরে আসবে অর্থনীতির 'Multiplier Acceleration Effect' এবং বাড়বে 'Growth rate' বা প্রবৃদ্ধির হার এবং ধীরে ধীরে 'Reduction in the dependence on foreign aid' অর্জিত হবে, বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা কমবে, এইভাবে আন্তর্জাতিক বাজারেও ' Hicks Allen curve' এর শর্ত পূরণ হবে।

বিগত চতুর্থ পরিকল্পনায় দারিদ্র্য বিমোচন

Hicks Allen curve তত্ত্ব বাস্তবায়ন ঘটবে এবং বাণিজ্যিক ভারসাম্যও ফিরে আসবে এবং Minimum cost (comparative cost বা সবচেয়ে কম খরচ) দ্বারা দেশীয় উৎপাদন হবে এবং বিশ্ব উৎপাদনও বেড়ে সারাবিশ্বের অভাব কমাবে। আমাদের চতুর্থ পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার উদ্দেশ্য (১) দারিদ্র্য দুরীকরণ (২) উন্নয়নের হার বৃদ্ধি (প্রবৃদ্ধি) (৩) বৈদেশিক সাহায্যের উপর 'নির্ভরশীলতা কমানো'র লক্ষ্যমাত্রার বাস্তবায়ন ঘটবে। সেই সঙ্গে পঞ্চম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার উন্নয়নের প্রবৃদ্ধি ৫.৭% অর্জিত হবে।

বিশ্বব্যাংক ও দারিদ্র্য বিমোচন

বিশ্ব ব্যাংকের ম্যাকনামারা কিছুদিন পূর্বে 'Trickle Down Effect' এর বাস্তব Experiment (পরীক্ষা নিরীক্ষা) করেছিলেন। বাংলাদেশ, মোজাম্বিক, আপার

ভোল্টা সহ (প্রাক্তন ফরাসী উপনিবেশ, যা আফ্রিকাতে অবস্থিত) বিভিন্ন এলডিসিতে; অর্থাৎ এশিয়া ও আফ্রিকার ঘনবসতিপূর্ণ বিভিন্ন সাহায্য গ্রহণকারী উন্নয়নশীল দেশে। তার Experiment ব্যর্থ হয়েছে। বংশের একজন লোককে ধনী বানিয়ে তারই মাধ্যমে মোম্বাইয়া ও ইস্পাহানী বা আগাখানী গ্রুপের মত সবাইকে ধনী বানানোর প্রচেষ্টা ছিল এটি। দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর জনগণ খুবই হিংসুক। নিজেরটি হলেই হয়, বন্ধু বা আত্মীয়ের মঙ্গল চিন্তা তারা করে খুবই কম। এটাই যদি অবস্থা হয় তবে Trickle Down Experiment সম্পূর্ণ ব্যর্থ। তাই বর্তমানে VGD (Vulnerable group Development Programme) কর্মসূচির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের চিন্তাভাবনা চলছে।

দারিদ্র্যের প্রকার ভেদ

গরীব দুই ধরনের। এক ধরনের হচ্ছে 'Relative Poverty' বা তুলনামূলক দারিদ্র্যের শিকার এবং অন্য ধরনের হচ্ছে 'Absolute Poverty'র শিকার। অর্থাৎ এক ধরনের গরীব সত্যিকার গরীব এবং অন্য ধরনের গরীব মনের গরীব। অর্থনীতির কাম্যতার তত্ত্ব অনুযায়ী যে যতবেশী টাকার মালিক, তার নিকট টাকার কাম্যতা তত কম। যার এক কোটি টাকা আছে তার নিকট হতে ১০০ টাকা দেশের ও দশের জন্য ত্যাগ স্বীকার হিসেবে আদায় করলে তার যতটা মনের অসন্তুষ্টি আসবে (হাতে হাতে কিছু না পাবার জন্য), যে ভদ্রলোক ১ হাজার টাকার মালিক তার নিকট হতে মাত্র ১০ টাকা আদায় করলেই তার অসন্তুষ্টি আরো বেশী হবে। টাকা দিয়ে কাউকে চিরদিনের জন্য খুশী করা যায় না। ফুরালে সে আবারও চায়। কিন্তু সরাসরি কিছু না দিয়ে কারো নিকট থেকে টাকা আদায় করলে সে খুবই অসন্তুষ্ট হয় এবং এর প্রমাণ হচ্ছে অর্থনীতির ট্যাক্সের 'Diffusion' তত্ত্বে। এটা তার শরীরের রক্ত বের করার মত ব্যাপার টাকার কাম্যতা যত পায়, ততই চায়। খাদ্য বস্ত্র এবং ব্যবসায়ীর পুঁজির অভাবসহ যাবতীয় অভাব মেটার পরও শুধু টাকার স্তুপ বড় বানাবার জন্যও মানুষের টাকার চাহিদা আছে তা কোন রকম দরকারে না লাগলেও। এই ধরনের লোক মনের গরীব।

আমরা কোন ধরনের দারিদ্র বিমোচনে আগ্রহী

দারিদ্র্য বিমোচন বলতে এই ধরনের 'Relative Poverty' দূর করাকে বুঝানো হয় না, Absolute Povertyকে বুঝানো হয়েছে। দারিদ্র্য সীমার নীচে যে ৫০% বা ৬০% লোক বাস করে, যাদের দৈনন্দিন কিলো ক্যালরী ২১১২ প্রয়োজন হলেও সর্বনিম্ন ১৮০০ও পাচ্ছে না; শুধু পান্তাভাত লবণ দিয়ে বাচ্চাকে খাইয়ে অন্যের নিকট থেকে টাকা ধার করে ধান কিনে তা ছাটাই করে চাল বানিয়ে, নারকেল তেল বানিয়ে, চিড়া, মুড়ি তৈরি করে, চাগল পুষে সংসার চালায়, তাদের বুঝানো হয়েছে। তাদের অভাব কম, তারা অল্পে খুশী। এদের Efficiency বা কর্মক্ষমতা আছে

কিন্তু সচেতনতা নাই। দেশের সঞ্চিত ব্যাংকের টাকা গুলোর মালিক যে এই দেশেরই সাধারণ জনগণ, এটা তারা বুঝেনা।

Supervised Credit ও দারিদ্র্য বিমোচন

কিন্তু দারিদ্র্য সীমার নীচের এই লোকগুলোকে ২০০ টাকা হতে ৫০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ দিলে তারা স্বল্প মেয়াদেই মাথাপিছু আয় বাড়াতে পারবে। এই বৃদ্ধি হবে দেশের জিডিপির প্রবৃদ্ধির চাইতে অনেকগুণে বেশী। বর্তমানে মহাজনের নিকট থেকে বেশী সুদে ধার করা টাকায় এটা সম্ভব হচ্ছে না। ঋণের সদব্যবহারে গ্রামীণ ব্যাংকের মত Supervision বা তদারকি না পাওয়ায় ঋণ পরিশোধ হচ্ছেনা এবং ঋণের বোঝা বেড়ে যাবার জন্য একদিন ভিটামাটি হতে উচ্ছেদ হয়ে বিপথে নেমে পয়সা কামাতে হচ্ছে শহরে যেয়ে। দারিদ্র বিমোচনের নিমিত্তে শিক্ষার জন্য খাদ্য, রুরাল মেইনটেন্যান্স প্রোগ্রাম, পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি আন্তর্জাতিক আইনের বাস্তবায়ন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও প্রশাসকদের ভূমিকা ইত্যাদিও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিষয়গুলির কাঠামো এবং বাস্তবায়ন সম্পর্কে নীচে বর্ণনা করা হলো ঃ

আর এম পি (Rural Maintenance Programme)

এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে ৬৪টি জেলায় প্রায় প্রতিটি ইউনিয়নের দরিদ্র মহিলারা কাজ করছে। ডিআরআরও (District Relief and Rehabilitation Officer) প্রথম শ্রেণীর পদ এবং জেলা প্রশাসকের অফিসে তিনি বসেন। সিএআরই নিজে সরাসরি কোন কাজ করেনা। ১০০% টাকাই ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে দেওয়া হয়। ইউপি চেয়ারম্যানের নামে ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে ১০০% টাকারই চেক আসে। মহিলারা সোনালী ব্যাংক বা অন্য ব্যাংক হতে তাদের দিনপ্রতি পঁচিশ টাকা মজুরী এই টাকা থেকে গ্রহণ করেন। শুষ্ক মওসুমে (অভাবের সময়) গরুর গাড়ী, রিক্সা, মহিষের গাড়ী, ট্রাক, জীপ, টেক্সী চলার সময় রাস্তায় খাদ সৃষ্টি এবং বৃষ্টিতে বর্ষায় মাটি ভেঙ্গে পড়লে তারা তা মেরামত করে ও চেয়ারম্যানের নিকট থেকে টাকা গ্রহণ করে। ইউনিয়ন পরিষদের ট্যাক্স থেকে ১০% টাকা এই প্রোগ্রামে দেয়া হয়। বাকী ৯০% ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের কাছে জমা দেওয়া হয়। এই অর্থের যোগান সাধারণত US AID দিয়ে থাকে। মহিলারা কাছের ব্যাংকে মাসিক পঁচিশ টাকা করে বাধ্যতামূলকভাবে জমা রাখবে আর এম পি প্রোগ্রাম হতে পাওয়া টাকা হতে। বৎসর শেষে টি এন ও-র অনুমতিক্রমে তারা টাকা তুলে এবং হাঁসমুরগী বা গুরু ছাগল কিনে তা পুষে আয় করতে পারে। ডিআরআরও জেলা প্রশাসকের ষ্টাফ অফিসার হিসাবে কাজ করেন।

ভিজিডি (Vulnerable Group Development)

প্রতি ২ বছর পর পর ইউপি চেয়ারম্যান দুঃস্থ মহিলাদের বাছাই করে থানা ভিজিডি (Vulnerable Group Development) কমিটিতে নাম পাঠায়। থানার ঐ

কমিটি যাচাই করে দেখে সত্যি গরীব নামে পরিচিতা মহিলাদের নাম ঐ তালিকায় এসেছে কিনা। থানা কমিটি গম বিতরণের অনুমোদনের জন্য তালিকাটি জেলা ভিজিডি কমিটিতে পাঠায়। ডব্লিউএফপি এর গম এল এস ডি বা স্থানীয় খাদ্য গুদাম থেকে চেয়ারম্যানের মাধ্যমে বিতরণ করা হয়।

কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি

থানা পরিষদ সভা করে কোন ইউনিয়নে কত গম দিবেন তা ঠিক করেন। জেলা থেকে থানা নির্বাহী অফিসের নামে উপ-বরাদ্ধ দেয়া হয়। ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর থেকে যাচাই ও বাছাই করার পর টি এন ও র নামে গমের বরাদ্ধ আদেশ জারী করা হয়। টি এন ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প চেয়ারম্যানের নামে (খাল বা রাস্তা নির্মাণ) ডি ও (Delivary Order) জারী করেন। প্রকল্প চেয়ারম্যান যে কোন ইউপি সদস্য বা সরকারী সার্কুলার মোতাবেক বাইরের লোকও হতে পারে। প্রতি হাজার মাটিতে ৪৫/৫৫ সের গম প্রদান করা হয়।১০×১০×১০ ফুট সমান ১০০০ ঘনফুট মাটিই ১০০০ মাটির পরিমাপ।

টি আর প্রকল্প

খরা, বন্যা, ঝড় ইত্যাদির সময় এই প্রকল্প ত্রাণরূপে প্রদান করা হয়। এটা সাময়িক দান। প্রকৃতিসৃষ্ট বা মানব সৃষ্ট বিশেষ দুর্যোগ অবস্থার সময় এই প্রকল্পের রিলিফ নির্ধাতি সরকারী কর্মকর্তা বা কমিটির হাত দিয়ে পৌছানো হয়।

বিশেষ টি আর প্রকল্প

এটা সরাসরি মন্ত্রণালয় থেকে দেয়া হয়। জেলা প্রশাসকও সরাসরি মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব পাঠান। এটা থেকে প্রবল ঝড়, বন্যা ইত্যাদির সময় সরাসরি মন্ত্রী বা এম পি সাহেবরা সাহায্য দেন। এর জন্য কোন কমিটি করা হয় না। থানা পরিষদ, ইউনিয়ন প্রকল্প কমিটি থেকে মাষ্টার রোল সংগ্রহ করে পি আই ও (Project Implementation Officer) এর নিকট জমা রাখে। এটা বিশেষ ধরনের প্রয়োজন ও দুরবস্থার সময় দেয়া হয়, যা খুবই সাময়িক।

অর্পিত সম্পত্তি ঃ

মালিক বিহীন হিন্দুর সম্পত্তি স্বাধীনতা যুদ্ধের পরে অর্পিত সম্পত্তি এবং পাকিস্তানীদের সম্পত্তি পরিত্যক্ত সম্পত্তি নামে পরিচিত। অর্পিত সম্পত্তির মালিক হিন্দুরাই কিন্তু সরকার তা তত্ত্বাবধানের মালিক। এটা বর্তমানে আর লীজ দেওয়া হয় না। যেটি যেভাবে আছে সেভাবেই থাকবে। বিষয়টি খুবই কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশেই স্থায়ী বাড়ীঘর আছে এবং প্রার্থীও বসবাস রত, তার সম্পত্তি ভুলক্রমে অন্যের দখলে গেলে বা নামে রেকর্ড হলে বা লীজ হিসেবে গেলে তা সত্যিকার মালিককে

ফেরৎ দেয়ার ব্যবস্থা আছে। এভাবেও দারিদ্র্য বিমোচনের ব্যবস্থা রয়েছে। শহরের সমস্ত অর্পিত সম্পত্তি অবমুক্তির চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেওয়ার এখতিয়ার বিভাগীয় কমিশনারগণের উপর ন্যস্ত আছে। জেলা প্রশাসক মহোদয়ের অফিসের অর্পিত সম্পত্তি শাখায় আবেদন করলে তা এডিসি (রাজস্ব) পরীক্ষান্তে জেলা প্রশাসক বরাবরে পেশ করেন। অবমুক্তির যোগ্য সম্পত্তি সত্যিকার মালিকের নিকট ফেরৎ দেয়া হয়।

শিক্ষার জন্য খাদ্য

District Coordinator বা জেলা সমন্বয়ক নামে নতুন একটি পদ সৃষ্টি করা হয়েছে শিক্ষার জন্য খাদ্য কার্যক্রমে। একটি সন্তান বিশিষ্ট পরিবারে মাসে ১৫ কেজি এবং একাধিক সন্তান বিশিষ্ট পরিবারে মাসে ২০ কেজি করে গম দেয়া হয়। এটি বাংলাদেশের অনেক থানায় ১টি বা ২টি করে ইউনিয়নে চালু হয়েছে। নির্বাহী অফিসারের মাধ্যমে সরাসরি স্কুলে এটি দেয়া হয় এবং কার্ড ধারী ছাত্র ছাত্রীরা তা ভোগ করে। এক্ষেত্রে উচ্চ শিক্ষার জন্য শিক্ষা ঋণ চালু করা যেতে পারে। তা হলে চাকুরী জীবনে মাসের বেতন হতে সে টাকা পরিশোধ করা সম্ভবপর হবে এবং ছাত্র জীবনে মহাজনী ঋণের মত ক্ষতিকর ও অপমানকর সাহায্য তাকে গ্রহণ করতে হবে না।

দারিদ্র্য বিমোচনে সুপারিশ

একচেটিয়া বাজার বা একচেটিয়া ব্যবসা এবং শ্রমের একচেটিয়া বাজার, সরকারকে প্রশাসকদের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশে টাকাওয়ালাদের অত্যাচার হতে সাধারণ জনগণকে রেহাই দেওয়া সম্ভব এবং বেকার সমস্যারও সমাধান সম্ভব, যতটা সম্ভব প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি করে ও বেশী উদ্যোক্তাকে শিল্প ঋণ প্রদান করে। শিল্প ঋণ গ্রহণ করে তার আসল ও সুদ পরিশোধ না করা অর্থনীতির সংজ্ঞায় Rational Behaviour বা স্বাভাবিক আচরণ নয়। ঋণের টাকায় লাভজনক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে সরকারকে ঠিকমত টাকা এবং ঋণদানকারী ব্যাংক বা সংস্থাকে ঋণের টাকা ঠিকমত পরিশোধ করলেই বেশী পরিমাণে উন্নয়ন অবকাঠামো এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে এবং তাতে বেকার শিক্ষিত যুবকেরও হাতের কাজ শেখা টেকনিশিয়ানের চাকুরী হয়ে দেশের দারিদ্র্য কমাবে। বর্তমানে লোকসান দেওয়া মিল-কারাখানার মালিক হয়ে জনগণ লোকসানেরই মালিক হয়েছে এবং দারিদ্র্য তাতে দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে। একচেটিয়া কারবার নিয়ন্ত্রণ করে সম্পদের সুষম বন্টন না করলে একই মালিকের অনেকগুলো কল-কারখানা গাড়ী, ইটখোলা, সিনেমা হল থাকবে, অথচ তারই অন্য আত্মীয় প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য ও লেখাপড়া করার মত অভাবের পয়সাও জুটাতে পারবেনা। রিক্সার মালিক যদি তিনটার বেশী না হওয়া যায়, তাহলে বাসের মালিকও তেমনি ১টার বেশী হতে দেওয়া ঠিক নয়। সবই সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন এবং সরকার ইচ্ছে করলেই সম্পদের

নিয়ন্ত্রণের দ্বারা দারিদ্র্য বিমোচন করতে সক্ষম, যদি সরকার জনগণের জন্য নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করে এবং সম্পদের সুষম বন্টন করে। ফলে উৎপাদন অনেক বাড়বে, বিদেশী ঋণও আসবে। শুধু যে হাতে বিতরণ হবে সেই হাতের সুষ্ঠু বাছাইয়ের অভাবেও দারিদ্র্যসীমার নীচের জনগণ না খেয়ে মরতে পারে। এজন্যই দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। বেকারত্ব দূর করে সবার হাতে টাকা ছড়ালেই অধিক সংখ্যক দেশী ও বিদেশী পণ্যের-বাজার হতে পারে। শিল্পায়নের প্রাথমিক পর্যায়ে শিল্পায়ন ও অবকাঠামো গঠনের সম্ভাবনা আছে এমন ভবিষ্যতময় শিল্পে ঋণ মওকুফ, সুদ মওকুফ ও ভর্তুকী সাময়িকভাবে দেওয়া যুক্তসঙ্গত হলেও তা সব সময়ের জন্য যুক্তি সঙ্গত নাও হতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জি ঃ

১। M. Marvyn. (1986). *Poverty in the Soviet Union.* U.K. : Cambridge University Press.

২। M. Raymond. (1971). *Poverty in Newyork-1783-1825.* U. K. : Oxford University Press.

৩। Atkinson. (1969). *Poverty in Britain and the Reform. U. K. :* Cambridge University Press.

৪। হাসিনা, শেখ, (১৯৯৫), *দারিদ্র দূরীকরণ।*

৫। সামাদ, মুহাম্মদ, (১৯৯৪), *বাংলাদেশে গ্রামীণ দারিদ্র্য মোচনে এন,জি,ওর ভূমিকা।* ঢাকা।

বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের চাহিদা ও কার্যকারিতা বিশ্লেষণ ঃ উন্নয়ন অর্থনীতি প্রসঙ্গ

মোঃ সিরাজুল ইসলাম *

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

লোক প্রশাসন সাময়িকীর অষ্টম ও নবম সংখ্যায় (মার্চ, ১৯৯৭ এবং জুন ১৯৯৭)। 'বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের চাহিদা ও কার্যকারিতা বিশ্লেষণ' শীর্ষক দু'টি প্রবন্ধ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম প্রবন্ধে সিভিল সার্ভিস প্রশিক্ষণের ঐতিহাসিক পটভূমি, প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরুপণ প্রক্রিয়া, প্রবন্ধের উদ্দেশ্যাবলী, তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতিসহ প্রবন্ধ প্রণয়নের অন্যান্য কাঠামোগত বিষয় এবং বাংলাদেশে চর্চা বিষয়ের উপ-অবয়বসমূহ পর্যালোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় প্রবন্ধে লোক প্রশাসন বিষয়ের উপ-অবয়বসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়ছে। এ প্রবন্ধে উন্নয়ন অর্থনীতি বিষয়ের উপ-অবয়বসমূহ পর্যালোচনা করা হলো এবং প্রবন্ধের সুপারিশমালা ও উপসংহারসহ ইত:পূর্বে প্রকাশিত সকল উপ-অবয়বসমূহের সামগ্রিক বিশ্লেষণও পরিবেশিত হলো। এ প্রবন্ধে উন্নয়ন অর্থনীতি বিষয়ের অধিবেশনসমূহের মডিউল-ভিত্তিক তালিকা সংযোজনী 'ক' তে উপস্থাপিত হয়েছে।

৯.১ উন্নয়ন অর্থনীতি

৯.১.১ উপ-অবয়ব ঃ পরিমাণগত বিশ্লেষণ

উন্নয়ন অর্থনীতি বিষয়ের "পরিমাণগত বিশ্লেষণ" উপ-অবয়বটি সিভিল সার্ভিসে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের কর্মজীবনের জন্য প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণিত হয়েছে। প্রশিক্ষণপূর্ব এবং প্রশিক্ষণোত্তর পর্বে যথাক্রমে শতকরা ৮১.৭ এবং ৯৩.২ ভাগ কর্মকর্তা এর সপক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন (সারণী-৫০)। প্রশিক্ষণপূর্ব অপেক্ষা প্রশিক্ষণোত্তর পর্বে উপ-অবয়বটির গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা শতকরা ১১.৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে বিশেষজ্ঞ অনুষদ সদস্য কর্তৃক প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরুপণ এবং উপ-অবয়ব প্রণয়ন যথার্থ ও লাগসই হয়েছে।

---

* উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ।

সারণী-৫০

কর্মজীবনে পরিমাণগত বিশ্লেষণ উপ-অবয়বের গুরুত্ব/প্রাসঙ্গিকতা

মতামত	কর্মজীবনে উপ-অবয়বের গুরুত্ব/প্রাসঙ্গিকতা				
	মোটেও না	সামান্য	যথেষ্ট	অনেক	সর্বমোট
ক) প্রশিক্ষণ পূর্ব	১১৫ (১৮.৩)	২১৬ (৩৪.৫)	২২২ (৩৫.৫)	৭৩ (১১.৭)	৬২৬ (১০০)
খ) প্রশিক্ষণোত্তর	– ৪৭(৭.৮)	১৮৫ (৩০.৬)	২৭৭ (৪৫.৮)	৯৬ (১৫.৮)	৬০৫ (১০০)
তারতম্য (হ্রাস/বৃদ্ধি)	৬৮ (হ্রাস) (১০.৫) (হ্রাস)	৩১ (হ্রাস) (৩.৯)(হ্রাস)	৫৫(বৃদ্ধি) (১০.৩) (বৃদ্ধি)	২৩(বৃদ্ধি) (৪.১) (বৃদ্ধি)	২১(হ্রাস) (০)

পরিমাণগত বিশ্লেষণ উপ-অবয়বের নির্ধারিত অধিবেশন/আলোচ্য বিষয় (উঅ-১-১২) সম্পর্কে উত্তরদাতা কর্মকর্তাদের জ্ঞান ও দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে কিনা এবং এ ঘাটতি পূরণ/হ্রাসে তারা নির্ধারিত আলোচ্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণের প্রয়োজন অনুভব করেন কিনা সে সম্পর্কে তাঁদের অভিমত গ্রহণ করা হয়। এ অভিমতে (সারণী-৫১) প্রতীয়মান হয় যে, গড়ে শতকরা ৯৩.৫ ভাগ প্রশিক্ষণার্থী সংশ্লিষ্ট উপ-অবয়বে প্রশিক্ষণ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। প্রশিক্ষণ গ্রহণের পূর্বে এ হার ছিল শতকরা ৮৪ ভাগ এবং প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর এ হার শতকরা ৭৭.৫ ভাগে হ্রাস পায়। অর্থাৎ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের প্রকৃত প্রয়োজনীয়তা শতকরা ৬.৫ ভাগ হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে। যথেষ্ট এবং তার অধিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা প্রশিক্ষণোত্তর পর্বে শতকরা ১৩.৪ ভাগ হ্রাস পেয়েছে। এ হ্রাসের মধ্যে শতকরা ৬.৯ ভাগ সামান্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তায় স্থানান্তরিত হয়েছে। ফলে প্রকৃত হ্রাস শতকরা ৬.৫ ভাগ। তবে যথেষ্ট ও অনেক প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা প্রশিক্ষণোত্তর পর্বে হ্রাস পাওয়ায় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তার তীব্রতা হ্রাস পেয়েছে। প্রশিক্ষণ গ্রহণের পরও শতকরা ৭৭.৫ ভাগ প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান রয়েছে। কার্যকরভাবে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা হ্রাসকল্পে অধিবেশনের সময়সীমা বৃদ্ধি করা দরকার। প্রয়োজনে চাহিদা ভিত্তিক মডিউল প্রণয়ন করা প্রয়োজন এবং তদনুযায়ী প্রশিক্ষণ পদ্ধতির পুনর্বিন্যাস করা প্রয়োজন।

সারণী-৫১

পরিমাণগত বিশ্লেষণ উপ-অবয়বে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

মতামত	প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা				
	মোটেও না	সামান্য	যথেষ্ট	অনেক	সর্বমোট
ক) প্রশিক্ষণ পূর্ব	১০৩	২১৯	২২৮	৯২	৬৪২
	(১৬)	(৩৪.১)	(৩৫.৫)	(১৪.৪)	(১০০)
খ) প্রশিক্ষণোত্তর	১৩৯	২৫৩	১৮৯	৩৭	৬১৮
	(২২.৫)	(৪১)	(৩০.৫)	(৬)	(১০০)
তারতম্য (হ্রাস/বৃদ্ধি)	৩৬(বৃদ্ধি)	৩৪(বৃদ্ধি)	৩৯(হ্রাস)		২৪(হ্রাস)
	(৬.৫) (বৃদ্ধি)	(৬.৯)(বৃদ্ধি)	(৫)(হ্রাস)	(৮.৪)(হ্রাস)	(০)

পরিমাণগত বিশ্লেষণ উপ-অবয়বে সার্বিকভাবে উঅ-৫ (উপাত্ত উপস্থাপনের কৌশল-২) এবং উঅ-৪ (উপাত্ত উপস্থাপনের কৌশল-১) অধিবেশন দুটি যথাক্রমে সর্বাধিক এবং দ্বিতীয় সর্বাধিক কার্যকর হিসেবে বিবেচিত হয়েছে (সারণী-৫২)। উঅ-৫ অধিবেশনে শতকরা ২০.৭ ভাগ এবং উঅ-৪ অধিবেশনে শতকরা ১৮.৪ ভাগ প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পেয়েছে। এ হার উঅ-৬ (উপাত্ত বিশ্লেষণ) এর ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন (৫.৮%)। প্রশিক্ষণের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা হ্রাসেও উঅ-৫ এবং উঅ-৪ যথাক্রমে সর্বাধিক (১৭.৬%) এবং দ্বিতীয় সর্বাধিক (১৩.৭%)। এ ক্ষেত্রে উঅ-৬ এর স্থান সর্বনিম্ন (০.৫%)।

উঅ-১১(জাতীয় আয় পরিমাপ পদ্ধতি) অধিবেশনে প্রশিক্ষণের অনেক প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক (২২%) হ্রাস পেয়েছে। এ হার উঅ-৫ এর ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন (৩.১%)। প্রশিক্ষণের যথেষ্ট ও অনেক প্রয়োজনীয়তার মধ্যে আন্তঃস্থান পরিবর্তনের ফলে এ ধরনের ফলাফল প্রতীয়মান হয়। তবে সার্বিকভাবে উঅ-৫ অধিবেশনটি সর্বাধিক এবং উঅ-৬ অধিবেশনটি সর্বনিম্ন কার্যকর বিবেচিত হয়েছে।

সারণী-৫২

পরিমাণগত বিশ্লেষণ উপ-অবয়বে অধিবেশন ভিত্তিক (প্রশিক্ষণ-পূর্ব ও প্রশিক্ষণোত্তর) প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

মতামত (প্রশিক্ষণ চাহিদা)	প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা										
	অধিবেশনের কোড (উঅ)										
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
ক) যথেষ্ট চাহিদা প্রশিক্ষণপূর্ব	২১ (৩৫)	১৯ (৩২.২)	২১ (৩৫)	২২ (৩৭.৩)	২৩ (৩৯)	২২ (৩৭.৩)	২০ (৩৫)	১৯ (৩৩.৯)	২২ (৩৮.৬)	২১ (৩৬.২)	১৮ (৩১)
প্রশিক্ষণোত্তর	১৮ (৩৩.৪)	১৬ (২৯)	১৫ (২৬.৮)	১৩ (২৩.৬)	১২ (২১.৪)	২১ (৩৬.৮)	১৭ (২৯.৩)	১৮ (৩১)	১৭ (৩০.৪)	২২ (৩৮.৬)	২০ (৩৫.৭)
তারতম্য (হ্রাস)(বৃদ্ধি)	৩হ্রাস (১৬)(হ্রাস)	৩হ্রাস (৩.২)(হ্রাস)	৬হ্রাস (৮.২)(হ্রাস)	৯হ্রাস (১৩.৭)(হ্রাস)	১১হ্রাস (১৭.৬)(হ্রাস)	১হ্রাস (০.৫)(হ্রাস)	৩হ্রাস (৫.৭)(হ্রাস)	৫হ্রাস (২.৯)(হ্রাস)	১হ্রাস (৮.২)(হ্রাস)	১ (বৃদ্ধি) (২.৪)(বৃদ্ধি)	২ (বৃদ্ধি) (৪.৭)(বৃদ্ধি)
খ) অনেক চাহিদা প্রশিক্ষণ পূর্ব	৭ (১১.৭)	৯ (১৫.৭)	৮ (১৩.৩)	৬ (১০.২)	৫ (৮.৫)	৬ (১০.৬)	৫ (৮.৮)	৫ (৯)	৪ (৭.৪)	১৭ (২৯.৩)	২০ (৩৪.৫)
প্রশিক্ষণোত্তর	২ (৩.৭)	১ (১.৯)	৩ (৫.৪)	৩ (৫.৫)	৩ (৫.৪)	৩ (৫.৩)	৩ (৫.১)	৩ (৫.২)	৩ (৫.৩)	৬ (১০.৫)	৭ (১২.৫)
তারতম্য (হ্রাস)	৫ (৮)	৮ (১৩.৩)	৫ (৭.৯)	৩ (৪.৭)	২ (৩.১)	৩ (৫.৩)	২ (৩.৭)	২ (৩.৮)	১ (২.১)	১১ (১৮.৮)	১৩ (২২)
প্রকৃত (Net) তারতম্য (হ্রাস)	৮ (৯.৬)	১১ (১৬.৫)	১১ (১৬.১)	১২ (১৮.৪)	১৩ (২০.৭)	৪ (৫.৮)	৫ (৯.৪)	৩ (৬.৭)	৬ (১০.৩)	১০ (১৬)	১১ (১৭.৩)

প্রশিক্ষণ চাহিদা মূলত কর্মজীবনে সংশ্লিষ্ট অধিবেশনের প্রাসঙ্গিকতা, সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ক্ষেত্রে জ্ঞান ও দক্ষতার ঘাটতি এবং এ ঘাটতি পুরণে প্রশিক্ষণার্থীর আগ্রহের সমষ্টিকে বোঝানো হয়ে থাকে। সারণী-৫৩ অনুযায়ী বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পরিমাণগত বিশ্লেষণ উপ-অবয়বে প্রশিক্ষণ চাহিদা হ্রাস করা সম্ভব হয়নি। বরং এ চাহিদা শতকরা ৮২.৮ ভাগ থেকে ৮৪.৪ ভাগে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রশিক্ষণোত্তর পর্বে প্রশিক্ষণের অনেক চাহিদা শতকরা ২.১ ভাগ হ্রাস পেলেও প্রশিক্ষণের সামান্য ও যথেষ্ট চাহিদা যথাক্রমে শতকরা ১.৫ ভাগ এবং ২.৬ ভাগ (মোট ৪.১ ভাগ) বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে প্রকৃতপক্ষে প্রশিক্ষণ চাহিদা শতকরা ২ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণী-৫৩

পরিমাণগত বিশ্লেষণ উপ-অবয়বে প্রশিক্ষণ চাহিদার পবিরর্তন

মতামত	প্রশিক্ষণের চাহিদা				
	মোটেও না	সামান্য	যথেষ্ট	অনেক	সর্বমোট
ক) প্রশিক্ষণ পূর্ব	২১৮	৪৩৫	৪৫০	১৬৫	১২৬৮
	(১৭.২)	(৩৪.৩০	(৩৫.৫)	(১৩)	(১০০)
খ) প্রশিক্ষণোত্তর	১৮৬	৪৩৮	৪৬৬	১৩৩	১২২৩
	(১৫.২)	(৩৫.৮)	(৩৮.১)	(১০.৯)	(১০০)
তারতম্য (হ্রাস/বৃদ্ধি)	৩২(হ্রাস)	৩(বৃদ্ধি)	৬(বৃদ্ধি)	৩২(হ্রাস)	৪৫(হ্রাস)
	(২) (হ্রাস)	(১.৫)(বৃদ্ধি)	(২.৬)(বৃদ্ধি)	(২.১)(হ্রাস)	(০)

সারণী-৫৪তে পরিমাণগত বিশ্লেষণ উপ-অবয়বের অধিবেশন-ভিত্তিক প্রশিক্ষণ চাহিদার খতিয়ান প্রদর্শিত হয়েছে। খতিয়ান অনুযায়ী উঅ-৮ (সংখ্যাতাত্ত্বিক সুচক বিশ্লেষণ-১) অধিবেশনে সর্বাধিক (৫.৮%) প্রশিক্ষণ চাহিদা (যথেষ্ট ও অনেক) হ্রাস পেয়েছে। উঅ-৫ (উপাত্ত উপস্থাপনের কৌশল-২) অধিবেশনে এ হ্রাস দ্বিতীয় সর্বাধিক (৪.১%)।

পরিমাণগত বিশ্লেষণ উপ-অবয়বের কয়েকটি অধিবেশনে (উঅ-১,২,৬,৯ এবং ১০) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যথেষ্ট ও অনেক প্রশিক্ষণ চাহিদা (যথেষ্ট ও অনেক) হ্রাস পেয়েছে। উঅ-৫ (উপাত্ত উপস্থাপনের কৌশল-২) অধিবেশনে এ হ্রাস দ্বিতীয় সর্বাধিক (৪.১%)।

পরিমাণগত বিশ্লেষণ উপ-অবয়বের কয়েকটি অধিবেশনে (উঅ-১,২,৬,৮ এবং ১০) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যথেষ্ট ও অনেক প্রশিক্ষণ চাহিদা হ্রাস না পেয়ে বরং বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই এ উপ-অবয়বকে আরো কার্যকর করার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে।

সারণী-৫৪

পরিমাণগত বিশ্লেষণ উপ-অবয়বে অধিবেশন ভিত্তিক প্রশিক্ষণ চাহিদার পরিবর্তন

মতামত (প্রশিক্ষণ চাহিদা)	প্রশিক্ষণ চাহিদা — অধিবেশনের কোড (উঅ)										
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
ক) যথেষ্ট চাহিদা প্রশিক্ষণপূর্ব	৪১ (৩৪.৭)	৩৭ (৩১.৬)	৩৯ (৩৩.৩)	৪১ (৩৫.৩)	৪৪ (৩৭.৯)	৪৩ (৩৭)	৪১ (৩৬.৩)	৪১ (৩৬.৬)	৪৫ (৩৯.৮)	৪২ (৩৬.৮)	৩৬ (৩১)
প্রশিক্ষণোত্তর	৪৪ (৪০.৪)	৪২ (৩৮.৩)	৩৯ (৩৫.২)	৩৮ (৩৬.৫)	৩৮ (৩৪.২)	৪৮ (৪২.১)	৩৯ (৩৪.৮)	৩৯ (৩৪.২)	৪০ (৩৫)	৫৩ (৪৭.৩)	৪৬ (৪১)
তারতম্য (হ্রাস)(বৃদ্ধি)	৩ বৃদ্ধি (৫.৯) বৃদ্ধি	৫ বৃদ্ধি (৫.৭) বৃদ্ধি	০ (১.৯) বৃদ্ধি	৩ বৃদ্ধি (১.২) বৃদ্ধি	৬.হ্রাস (৩.৭).হ্রাস	৫ বৃদ্ধি (৫.১) বৃদ্ধি	২.হ্রাস (১.৫) হ্রাস	২.হ্রাস (২.৪).হ্রাস	১৫.হ্রাস (৪.৮).হ্রাস	১১ বৃদ্ধি (১০.৫) বৃদ্ধি	১০ বৃদ্ধি (১০) বৃদ্ধি
খ) অনেক চাহিদা প্রশিক্ষণ পূর্ব	১২ (১০.২)	১৬ (১৩.৭)	১৫ (১২.৯)	১৩ (১১.৩)	১০ (৮.৬)	১১ (৯.৫)	৭ (৬.১)	৭ (৬.৩)	৬ (৫.৩)	৩২ (২৮.১)	৩৬ (৩১)
প্রশিক্ষণোত্তর	৯ (৮.২)	১০ (৯.১)	১২ (১০.৮)	৮ (৭.৭)	৯ (৮.২)	১০ (৮.৮)	৯ (৮.১)	১১ (৯.৭)	১২ (১০.৬)	২০ (১৭.৯)	২৩ (২০.৬)
তারতম্য (হ্রাস)	৩ (২)	৬ (৪.৬)	৩ (২.১)	৫ (৩.৬)	১ (০.৪)	১ (০.৭)	২ বৃদ্ধি (২) বৃদ্ধি	৪ (৩.৪)	৬ বৃদ্ধি (৫.৩) বৃদ্ধি	১২.হ্রাস (১০.২).হ্রাস	১৩.হ্রাস (১০.৪).হ্রাস
প্রকৃত (Net) তারতম্য (হ্রাস)	০ (৩.৭) বৃদ্ধি	১ (২.১) বৃদ্ধি	৩.হ্রাস (০.২).হ্রাস	৮.হ্রাস (২.৪).হ্রাস	৭.হ্রাস (৪.১).হ্রাস	৪ বৃদ্ধি (৪.৪) বৃদ্ধি	০ (০.৫).হ্রাস	৬.হ্রাস (৫.৮).হ্রাস	১ বৃদ্ধি (০.৫) বৃদ্ধি	১.হ্রাস (০.৩) বৃদ্ধি	৩ (০.৫)

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞ অনুষদ সদস্য কর্তৃক প্রণীত অর্থনৈতিক উন্নয়নের পটভূমি ও কৌশল উপ-অবয়বটি প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাদের কর্মজীবনের জন্য প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। গড়ে শতকরা ৯১.৯ ভাগ উত্তর দাতা (৯০.৬% প্রশিক্ষণ পূর্বে এবং ৯৩.৩% প্রশিক্ষণোত্তর পর্বে) এর সপক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন (সারণী-৫৫)। যথেষ্ট ও অনেক প্রাসঙ্গিকতার হারও গড়ে শতকরা ৭০.২ ভাগ (প্রশিক্ষণ পূর্বে ৬৫.৮% এবং প্রশিক্ষণোত্তর পর্বে ৭৪.৫%)। প্রশিক্ষণোত্তর পর্বে এ প্রয়োজনীয়তা শতকরা ৮.৭ ভাগ বেশী। এ ফলাফল বিশেষজ্ঞ অনুষদ কর্তৃক প্রণীত উপ-অবয়ব এবং উপ-অবয়ব প্রণয়ন প্রক্রিয়াকে সমর্থন করে।

সারণী-৫৫

কর্মজীবনে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পটভূমি ও কৌশল উপ-অবয়বের গুরুত্ব/প্রাসঙ্গিকতা

মতামত	কর্মজীবনে উপ-অবয়বের গুরুত্ব/প্রাসঙ্গিকতা				
	মোটেও না	সামান্য	যথেষ্ট	অনেক	সর্বমোট
ক) প্রশিক্ষণ পূর্ব	৭০ (৯.৪)	১৮৪ (২৪.৮)	২৯২ (৩৯.৪)	১৯৬ (২৬.৪)	৭৪২ (১০০)
খ) প্রশিক্ষণোত্তর	৪৫ (৬.৭)	১২৫ (১৮.৮)	৩২২ (৪৮.৫)	১৭২ (২৬)	৬৬৪ (১০০)
তারতম্য (হ্রাস/বৃদ্ধি)	২৫(হ্রাস) (২.৭) (হ্রাস)	৫৯(হ্রাস) (৬) (হ্রাস)	৩০(বৃদ্ধি) (৯.১) (বৃদ্ধি)	২৪(হ্রাস) (০.৪) (হ্রাস)	৭৮(হ্রাস) (০)

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পটভূমি ও কৌশল উপ-অবয়বে সার্বিকভাবে শতকরা ১৩ ভাগ প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে (সারণী-৫৬)। যথেষ্ট এবং তার অধিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শতকরা ১৯.২ ভাগ হ্রাস পেয়েছে। প্রশিক্ষণ গ্রহণের পরও যথেষ্ট ও অনেক প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা শতকরা ৪৮.৩ ভাগ বিদ্যমান রয়েছে। শ্রবণধর্মী বক্তৃতা পদ্ধতির পরিবর্তে অংশগ্রহণমূলক প্রশিক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে প্রশিক্ষণের কার্যকারিতা বিশেষ করে শিক্ষণ কার্যকারিতা (Learning effectiveness) বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

সারণী-৫৬

অর্থনৈতিক উন্নয়নের পটভূমি ও কৌশল উপ-অবয়বে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

মতামত	প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা				
	মোটেও না	সামান্য	যথেষ্ট	অনেক	সর্বমোট
ক) প্রশিক্ষণ পূর্ব	৫৭ (৭.৭)	১৮৫ (২৪.৮)	৩০৫ (৪১)	১৯৭ (২৬.৫)	৭৪৪ (১০০)
খ) প্রশিক্ষণোত্তর	১৩৮ (২০.৭)	২০৭ (৩১)	২৪৩ (৩৬.৫)	৭৮ (১১.৮)	৬৬৬ (১০০)
তারতম্য (হ্রাস/বৃদ্ধি)	৮১(বৃদ্ধি) (১৩)(বৃদ্ধি)	২২(বৃদ্ধি) (৬.২)(বৃদ্ধি)	৬২(হ্রাস) (৪.৫)(হ্রাস)	১১৯(হ্রাস) (১৪.৭)(হ্রাস)	৭৮(হ্রাস) (০)

সার্বিকভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পটভূমি ও কৌশল উপ-অবয়বে উঅ-২২ (অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারী কর্মকর্তাদের ভূমিকা) এবং উঅ-১২(অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারণা ঃ পটভূমি, বিবর্তন ও গতিশীলতা) অধিবেশন দু'টিতে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা যথাক্রমে সর্বাধিক (২৯.৭%) এবং দ্বিতীয় সর্বাধিক (২৮.৪%) হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে (সারণী-৫৭)। এ হার উঅ-১৫(বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাসের রূপরেখা) এর ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন (১%)।

অধিকাংশ অধিবেশনে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা শতকরা ২০ ভাগের কম হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে। সুতরাং বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে অধিকতর কার্যকর করার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে।

সারণী-৫৭

অর্থনৈতিক উন্নয়নের পটভূমি ও কৌশল উপ-অবয়বে অধিবেশন ভিত্তিক (প্রশিক্ষণ পূর্ব ও প্রশিক্ষণোত্তর) প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা	প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা												
	অধিবেশনের কোড (উঅ)												
	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
ক) যথেষ্ট চাহিদা প্রশিক্ষণপূর্ব	২০ (৩৫)	১৯ (৩২.৮)	১৭ (৩০.৯)	২১ (৩৬.৮)	২১ (৩৬.৩)	২১ (৩৬.২)	২৪ (৪২.৯)	২৫ (৪৩.৯)	২৭ (৪৮.২)	৩০ (৫২.৬)	২৯ (৫০)	৩১ (৫২.৫)	২০ (৩৪.৫)
প্রশিক্ষণোত্তর	১৩ (২৮.৯)	১২ (২৭.৪)	১৫ (৩৩.৩)	১৮ (৩৪)	২৪ (৪৫.৩)	১৮ (৩৪)	১৭ (৩১.৫)	২১ (৩৮.৯)	২২ (৪০)	২১ (৩৯.৬)	২০ (৩৭.৭)	২১ (৪১.২)	২১ (৩৯.৬)
তারতম্য (হ্রাস)(বৃদ্ধি)	৭.হ্রাস (৬.১).হ্রাস	৭.হ্রাস (৫.৪).হ্রাস	২.হ্রাস (২.৪) বৃদ্ধি	৩.হ্রাস (২.৮).হ্রাস	৩ বৃদ্ধি (৯) বৃদ্ধি	৩.হ্রাস (২.২).হ্রাস	৭.হ্রাস (১১.৪).হ্রাস	৪.হ্রাস (৫).হ্রাস	৫ বৃদ্ধি (৮.২) বৃদ্ধি	৯ বৃদ্ধি (১৩) বৃদ্ধি	৯.হ্রাস (১২.৩).হ্রাস	১০.হ্রাস (১১.৩).হ্রাস	১ বৃদ্ধি (৫.১) বৃদ্ধি
খ) অনেক চাহিদা প্রশিক্ষণ পূর্ব	১৯ (৩৩.৪)	১৮ (৩১)	১৭ (৩০.৯)	১২ (২)	১৪ (২৪.২)	১৫ (২৫.৯)	১০ (১৭.৮)	১৫ (২৬.২)	৭ (১২.৫)	১৪ (২৪.৬)	২১ (৩৬.৩)	১৪ (২৩.৭)	২১ (৩৬.২)
প্রশিক্ষণোত্তর	৫ (১১.১)	৬ (১৩.৮)	৫ (১১.১)	২ (৩.৮)	২ (৩.৭)	৬ (১১.৪)	৬ (১১.১)	৭ (১২.৯)	৭ (১২.৭)	৭ (১৩.৩)	১০ (১৮.৯)	৫ (৯.৮)	১০ (১৮.৯)
তারতম্য (হ্রাস)	১৪.হ্রাস (২২.৩).হ্রাস	১২.হ্রাস (১৭.২).হ্রাস	১২.হ্রাস (১৯.৮).হ্রাস	১০.হ্রাস (১.৮) বৃদ্ধি	১২.হ্রাস (২০.৫).হ্রাস	৯.হ্রাস (১৪.৫).হ্রাস	৪.হ্রাস (৬.৭).হ্রাস	৮.হ্রাস (১৩.৩).হ্রাস	০ (০.২) বৃদ্ধি	৭.হ্রাস (১১.৩).হ্রাস	১১.হ্রাস (১৭.৪).হ্রাস	৯.হ্রাস (১০.৯).হ্রাস	১১.হ্রাস (১৭.৩).হ্রাস
প্রকৃত (Net) তারতম্য (হ্রাস)	২১ (২৮.৪)	১৯ (২২.৬)	১৪ (১৭.৪)	১৩ (১)	৯ (১১.৫).হ্রাস	১২ (১৬.৭)	১১ (১৮.১)	১২ (১৮.৩)	৫ (৮)	১৬ (২৪.৩)	২০ (২৯.৭)	১৯ (২৫.২)	১০ (১২.২)

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পটভূমি ও কৌশল উপ-অবয়বে সার্বিকভাবে শতকরা ৫.৩ ভাগ চাহিদা হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে (সারণী-৫৮)। অন্য কথায় সংশ্লিষ্ট উপ-অবয়বে প্রশিক্ষণ গ্রহণের পরও শতকরা ৯৪.৭ ভাগ চাহিদা বিদ্যমান রয়েছে।

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ চাহিদার তীব্রতা কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। প্রশিক্ষণ পূর্বে প্রশিক্ষণের অনেক চাহিদা শতকরা ২৬.৫ ভাগ থেকে শতকরা ১৮.৮ ভাগ হ্রাস পেয়েছে। তবে প্রশিক্ষণের যথেষ্ট চাহিদা প্রশিক্ষণোত্তর পর্বে শতকরা ২.২ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে প্রশিক্ষণের যথেষ্ট ও অনেক প্রশিক্ষণ চাহিদা শতকরা ৫.৫ হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে।

সারণী-৫৮

অর্থনৈতিক উন্নয়নের পটভূমি ও কৌশল উপ-অবয়বে প্রশিক্ষণ চাহিদার পরিবর্তন

মতামত	প্রশিক্ষণ চাহিদা				
	মোটেও না	সামান্য	যথেষ্ট	অনেক	সর্বমোট
ক) প্রশিক্ষণ পূর্ব	১২৭ (৮.৫)	৩৬৯ (২৪.৮)	৫৯৭ (৪০.২)	৩৯৩ (২৬.৫)	১৪৮৬ (১০০)
খ) প্রশিক্ষণোত্তর	১৮৩ (১৩.৮)	৩৩২ (২৫)	৫৬৫ (৪২.৪)	২৫০ (১৮.৮)	১৩৩০ (১০০)
তারতম্য (হ্রাস/বৃদ্ধি)	৫৬(বৃদ্ধি) (৫.৩) (বৃদ্ধি)	৩৭(বৃদ্ধি) (০.২) (বৃদ্ধি)	৩২(হ্রাস) (২.২) (বৃদ্ধি)	১৪৩(হ্রাস) (৭.৭) (হ্রাস)	১৫৬(হ্রাস) (০)

সারণী-৫৯ অনুযায়ী উঅ-২১ (বাংলাদেশের বেকারত্ব সমস্যা উত্তরণের সম্ভাবনা) অধিবেশনে যথেষ্ট ও অনেক প্রশিক্ষণ চাহিদা সর্বাধিক (১৪.৫%) হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে। উঅ-২২ (অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারী কর্মকর্তাদের ভূমিকা) অধিবেশনে এ হ্রাস দ্বিতীয় সর্বাধিক (১১.১%)।

উঅ-১৩,২০ এবং ২৪ অধিবেশনসমূহে প্রশিক্ষণের যথেষ্ট ও অনেক চাহিদা প্রশিক্ষণোত্তর পর্বে হ্রাস না পেয়ে বরং বৃদ্ধি পেয়েছে। সার্বিকভাবে বৃদ্ধির হার যথাক্রমে শতকরা ০.৯, ৮.২ এবং ২.৫ ভাগ।

সারণী-৫৯

অর্থনৈতিক উন্নয়নের পটভূমি ও কৌশল উপ-অবয়বে অধিবেশন ভিত্তিক প্রশিক্ষণ চাহিদার পরিবর্তন

প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা	প্রশিক্ষণের চাহিদা												
	অধিবেশনের কোড (উঅ)												
	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
ক) যথেষ্ট চাহিদা প্রশিক্ষণপূর্ব	৪২ (৩৬.৫)	৪১ (৩৫.৪)	৩৮ (৩৩.৯)	৩৭ (৩৫.৫)	৪২ (৩৬.৮)	৪২ (৩৬.৫)	৪৭ (৪২.৩)	৫৩ (৪৬.৫)	৪৬ (৪০.৭)	৫৯ (৫১.৩)	৫২ (৪৪)	৫৯ (৫০)	৩৯ (৩৫.১)
প্রশিক্ষণোত্তর	৩৬ (৪০)	৩৪ (৩৮.২)	৩৪ (৩৭.৮)	৪১ (৩৯)	৫০ (৪৭.২)	৪০ (৩৭.৭)	৪১ (৩৮)	৪৭ (৪৩.৯)	৫১ (৪৭.২)	৪৪ (৪১.৯)	৫২ (৪৯)	৪৯ (৪৭.৬)	৪৬ (৪৩)
তারতম্য (হ্রাস)(বৃদ্ধি)	৬.হ্রাস (৩.৫) বৃদ্ধি	৭.হ্রাস (৫.৮) বৃদ্ধি	৪.হ্রাস (৩.৯) বৃদ্ধি	৪ বৃদ্ধি (৩.৫) বৃদ্ধি	৮ বৃদ্ধি (১০) বৃদ্ধি	২.হ্রাস (১.২) বৃদ্ধি	৬.হ্রাস (৪.৩).হ্রাস	৬.হ্রাস (২.৬).হ্রাস	৫ বৃদ্ধি (৬.৫) বৃদ্ধি	১৫.হ্রাস (৯.৪).হ্রাস	০ (০) বৃদ্ধি	১০.হ্রাস (২.৪).হ্রাস	৭ বৃদ্ধি (৭.৯) বৃদ্ধি
খ) অনেক চাহিদা প্রশিক্ষণ পূর্ব	৩৫ (৩০.৫)	৩২ (২৭.৬)	৩২ (২৮.৫)	২৫ (২২)	২৬ (২২.৮)	২৯ (২৫.২)	২১ (১৯)	২৮ (২৪.৬)	১৮ (১৫.৯)	৩১ (২৭)	৪৯ (৪১.৬)	২৯ (২৪.৬)	৩৮ (৩৪.৩)
প্রশিক্ষণোত্তর	১৫ (১৬.৭)	১৬ (১৮)	১৫ (১৬.৭)	৯ (৮.৭)	১২ (১৩.৩)	২১ (১৯.৯)	১৯ (১৭.৬)	২৪ (২২.৫)	১৯ (১৭.৬)	২৩ (২১.৯)	২৭ (২৫.৫)	১৯ (১৮.৪)	৩১ (২৮.৯)
তারতম্য হ্রাস/বৃদ্ধি	২০.হ্রাস (১৩.৮).হ্রাস	১৬.হ্রাস (৯.৬).হ্রাস	১৭.হ্রাস (১১.৮).হ্রাস	১৬.হ্রাস (১৩.৩).হ্রাস	১৪.হ্রাস (৯.৫).হ্রাস	৮.হ্রাস (৫.৩).হ্রাস	২.হ্রাস (১.৪).হ্রাস	৪.হ্রাস (২.১).হ্রাস	১ বৃদ্ধি (১.৭) বৃদ্ধি	৮.হ্রাস (৫.১).হ্রাস	২২.হ্রাস (১৬.১).হ্রাস	১০.হ্রাস (৬.২).হ্রাস	৭.হ্রাস (৫.৪).হ্রাস
প্রকৃত (Net) তারতম্য (হ্রাস)	২৬.হ্রাস (১০.৩).হ্রাস	২৩.হ্রাস (৬.৮).হ্রাস	২১.হ্রাস (৭.৯).হ্রাস	১২.হ্রাস (.৮).হ্রাস	৬.হ্রাস (০.৯) বৃদ্ধি	১০.হ্রাস (৪.১).হ্রাস	৮.হ্রাস (৫.৭).হ্রাস	১০.হ্রাস (৪.৭).হ্রাস	৬ বৃদ্ধি (৮.২) বৃদ্ধি	২৩.হ্রাস (১৪.৫).হ্রাস	২২.হ্রাস (১১.১).হ্রাস	২০.হ্রাস (৮.৬).হ্রাস	০ (২.৫) বৃদ্ধি

সারণী-৬০তে কর্মজীবনে বাংলাদেশের 'অর্থনৈতিক পরিকল্পনা' উপ-অবয়বের গুরুত্ব/প্রাসঙ্গিকতা প্রদর্শিত হয়েছে। সারণীতে উপস্থাপিত পরিসংখ্যান কর্মজীবনে উপ-অবয়বটির প্রাসঙ্গিকতা প্রমাণ করে। সার্বিকভাবে গড়ে শতকরা ৯৩.৮ ভাগ। প্রশিক্ষণ পূর্বে এ হার ছিল শতকরা ৯১.২ ভাগ এবং প্রশিক্ষণোত্তর পর্বে তা শতকরা ৫.২ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৯৬.৪ ভাগে উপনীত হয়। অর্থাৎ প্রশিক্ষণ গ্রহণের পরও উপ-অবয়বটির গুরুত্বহ্রাস পায়নি। এ ফলাফল বিপিএটিসির বিশেষজ্ঞ অনুষদ সদস্য কর্তৃক পাঠক্রম প্রণয়ন কার্যক্রমের যথার্থতা প্রমাণ করে।

সারণী-৬০

কর্মজীবনে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা উপ-অবয়বের গুরুত্ব/প্রাসঙ্গিকতা

মতামত	প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা				
	মোটেও না	সামান্য	যথেষ্ট	অনেক	সর্বমোট
ক) প্রশিক্ষণ পূর্ব	৩৬ (৮.৮)	৯৩ (২২.৮)	১৮৬ (৪৫.৬)	৯৩ (২২.৮)	৪০৮ (১০০)
খ) প্রশিক্ষণোত্তর	১৭ (৩.৬)	৭১ (১৫)	২৭৫ (৫৮.৪)	১০৮ (২৩)	৪৭১ (১০০)
তারতম্য (হ্রাস/বৃদ্ধি)	১৯(হ্রাস) (৫.২)(হ্রাস)	২২(হ্রাস) (৭.৮)(হ্রাস)	৮৯(বৃদ্ধি) (১২.৮)(বৃদ্ধি)	১৫(বৃদ্ধি) (০.২)(বৃদ্ধি)	৬৩(বৃদ্ধি) (০)

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা উপ-অবয়বের প্রয়োজনীয়তা শতকরা ১৫.৮ ভাগহ্রাস করা সম্ভব হয়েছে (সারণী-৬)। অর্থাৎ এখনো সংশ্লিষ্ট উপ-অবয়বে শতকরা ৮৪.২ ভাগ প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান (৪১.২% সামান্য, ২৬.৮% যথেষ্ট এবং ৮.২% অনেক)। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যথেষ্ট ও অনেক প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা শতকরা ৩৫ ভাগহ্রাস পেয়েছে এবং সামান্য প্রয়োজনীয়তা শতকরা ১৯.২ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা এ পরিবর্তন প্রশিক্ষণের ইতিবাচক অবদান প্রমাণ করে। অর্থাৎ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তার তীব্রতাহ্রাস করা সম্ভব হয়েছে।

সারণী-৬১

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা উপ-অবয়বে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

মতামত	প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা				
	মোটেও না	সামান্য	যথেষ্ট	অনেক	সর্বমোট
ক) প্রশিক্ষণ পূর্ব	৩১ (৮)	৮৬ (২২)	১৯১ (৪৮.৬)	৮৪ (২১.৪)	৩৯২ (১০০)
খ) প্রশিক্ষণোত্তর	১১৪ (২৩.৮)	১৯৭ (৪১.২)	১২৮ (২৬.৮)	৩৯ (৮.২)	৪৭৮ (১০০)
তারতম্য (হ্রাস/বৃদ্ধি)	৮৩ (বৃদ্ধি) (১৫.৮)(বৃদ্ধি)	১১(বৃদ্ধি) (১৯.২)(বৃদ্ধি)	৬৩(হ্রাস) (২১.৮)(হ্রাস)	৪৫(হ্রাস) (১৩.২)(হ্রাস)	৮৬(বৃদ্ধি) (০)

প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা হ্রাসে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা উপ-অবয়বটি অধিকতর কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। উপ-অবয়বটির সকল অধিবেশনেই শতকরা ২৫ ভাগের অধিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে (সারণী-৬২)। উঅ-২৯(বাংলাদেশে দারিদ্র্য স্তর, বিন্যাস ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা) অধিবেশনে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক (৪২.৬%) এবং উঅ-৩০ (উন্নয়নের জন্য সম্পদ আহরণ-সমষ্টিগত) অধিবেশনে সর্বনিম্ন (২৬.১%) হ্রাস পেয়েছে।

সারণী-৬২

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা উপ-অবয়বে অধিবেশন ভিত্তিক (প্রশিক্ষণ পূর্ব ও প্রশিক্ষণোত্তর) প্রশিক্ষণের প্রযোজনীয়তা

মতামত (প্রশিক্ষণ চাহিদা)	প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা									
	অধিবেশনের কোড (উঅ)									
	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪
ক) যথেষ্ট চাহিদা প্রশিক্ষণপূর্ব	২২ (৫৫)	১৯ (৪৮.৭)	২২ (৫৫)	২২ (৫৫)	২০ (৫১.৩)	১৬ (৪১)	১৯ (৫০)	১৮ (৪৬.২)	১৯ (৪৮.৭)	১৪ (৩৫.৯)
প্রশিক্ষণোত্তর	১৮ (৩৭.৫)	১৬ (৩৩.৩)	১৩ (২৭)	১৪ (২৯.২)	১০ (২০.৮)	১২ (২৫)	১০ (২১.৩)	১৩ (২৭)	১১ (২২.৯)	১১ (২৩.৪)
তারতম্য (হ্রাস)	৪ (১৮)	৩ (১৫.৪)	৯ (২৮)	৮ (২৫.৮)	(৩০.৫)	৪ (১৬)	৯ (২৮.৭)	৫ (১৯.২)	৮ (২৫.৮)	৩ (১২.৫)
খ) অনেক চাহিদা প্রশিক্ষণ পূর্ব	৬ (১৫)	১১ (২৮.৩)	৮ (২০)	৮ (২০)	৮ (২০.৫)	৮ (২০.৫)	১০ (২৬.৩)	৭ (১৭.৯)	৯ (২৩.১)	৯ (২৩.১)
প্রশিক্ষণোত্তর	২ (৪.২)	৪ (৮.৪)	৪ (৮.৪)	৩ (৬.২)	৪ (৮.৪)	৫ (১০.৪)	৬ (১২.৮)	৪ (৮.৪)	৪ (৮.৪)	৩ (৬.৪)
তারতম্য (হ্রাস)	৪ (১০.৮)	৭ (১৯.৯)	৪ (১১.৬)	৫ (১৩.৮)	৪ (১২.১)	৩ (১০.১)	৪ (১৩.৫)	৩ (৯.৫)	৫ (১৪.৭)	৬ (১৬.৭)
প্রকৃত (Net) তারতম্য (হ্রাস)	৮ (২৮.৮)	১০ (৩৫.৩)	১৩ (৩৯.৬)	১৩ (৩৯.৬)	১৪ (৪২.৬)	৭ (২৬.১)	১৩ (৪২.২)	৮ (২৮.৭)	১৩ (৪০.৫)	৯ (২৯.২)

বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে প্রশিক্ষণার্থী উত্তরদাতাদের জ্ঞান ও দক্ষতার উন্নয়নে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা উপ-অবয়বের সামান্য ইতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট উপ-অবয়বে প্রশিক্ষণের চাহিদা সার্বিকভাবে শতকরা ৫.৫ ভাগ হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে (সারণী-৬৩)। প্রশিক্ষণের যথেষ্ট ও অনেক চাহিদা শতকরা ১১.৩ ভাগ হ্রাস পেয়েছে এবং সামান্য চাহিদা শতকরা ৫.৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রশিক্ষণের ফলে প্রশিক্ষণ চাহিদায় এ ধরনের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

সারণী-৬৩

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা উপ-অবয়বে প্রশিক্ষণ চাহিদার পরিবর্তন

মতামত	প্রশিক্ষণ চাহিদা				
	মোটেও না	সামান্য	যথেষ্ট	অনেক	সর্বমোট
ক) প্রশিক্ষণ পূর্ব	৬৭ (৮.৩)	১৭৯ (২২.৪)	৩৭৭ (৪৭.১')	১৭৭ (২২.২)	৮০০ (১০০)
খ) প্রশিক্ষণোত্তর	১৩১ (১৩.৮)	২৬৮ (২৮.২)	৪০৩ (৪২.৫)	১৪৭ (১৫.৫)	৯৪৯ (১০০)
তারতম্য (হ্রাস/বৃদ্ধি)	৬৫ (বৃদ্ধি) (৫.৫)(বৃদ্ধি)	৮৯(বৃদ্ধি) (৫.৮)(বৃদ্ধি)	২৬(হ্রাস) (৪.৬)(হ্রাস)	৩০(হ্রাস) (৬.৭)(হ্রাস)	১৪৯(হ্রাস) (০)

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যথেষ্ট ও অনেক প্রশিক্ষণ চাহিদা উঅ-২৮ (বাংলাদেশের পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সমষ্টিগত কাঠামো-২) এর ক্ষেত্রে সর্বাধিক (১৬.৮%) হ্রাস পেয়েছে (সারণী-৬৪)। এ হ্রাস উঅ-২৯ (বাংলাদেশের দারিদ্র্য স্তর, বিন্যাস ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা) এর ক্ষেত্রে দ্বিতীয় সর্বাধিক (১৬.৭%) এবং উঅ-৩২ (বিনিয়োগযোগ্য সম্পদের ব্যবহার) এর ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন (৩.৫%)।

প্রশিক্ষণের চাহিদার তীব্রতা হ্রাস কল্পে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণকে অধিকতর কার্যকর করার প্রয়োজন রয়েছে।

সারণী-৬৪

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা উপ-অবয়বে অধিবেশন ভিত্তিক প্রশিক্ষণ চাহিদার পরিবর্তন

প্রশিক্ষণ চাহিদা	প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা									
	অধিবেশনের কোড (উঅ)									
	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪
ক) যথেষ্ট চাহিদা প্রশিক্ষণপূর্ব	৪১ (৪৯.৫)	৩৯ (৫০.৬)	৪১ (৪৯.৫)	৪১ (৫১.৩)	৩৮ (৪৮.৭)	৩৩ (৪২.৯)	৩৮ (৫১.৩)	৩৭ (৪২.৫)	৩৬ (৪৫)	৩৩ (৪০.৭)
প্রশিক্ষণোত্তর	৫০ (৫২)	৪৫ (৪৭.৪)	৪১ (৪৩.২)	৪০ (৪২.১)	৩৫ (৩৬.৮)	৪০ (৪১.৭)	৩৭ (৩৯.৪)	৪২ (৪৪.২)	৩৭ (৩৮.৯)	৩৬ (৩৮.৭)
তারতম্য (হ্রাস/বৃদ্ধি)	৯ বৃদ্ধি (২.৫) বৃদ্ধি	৬ বৃদ্ধি (৩.২)	০ (৬.৩)হ্রাস	১হ্রাস (৯.২)হ্রাস	৩হ্রাস (১১.৯)হ্রাস	৭ বৃদ্ধি (১.২)হ্রাস	১হ্রাস (১১.৯)হ্রাস	৫ বৃদ্ধি (১.৭) বৃদ্ধি	১ বৃদ্ধি (৬.১)হ্রাস	৩ বৃদ্ধি (২)হ্রাস
খ) অনেক প্রয়োজন প্রশিক্ষণ পূর্ব	১৭ (২০.৫)	১৯ (২৪.৭)	১৮ (২১.৭)	১৭ (২১.৩)	১৬ (২০.৬)	১৬ (২০.৭)	১৮ (২৪.৩)	১৯ (২১.৯)	১৮ (২২.৫)	১৯ (২৩.৫)
প্রশিক্ষণোত্তর	১০ (১০.৫)	১৪ (১৪.৭)	১২ (১২.৬)	১৩ (১৩.৭)	১৫ (১৫.৮)	১৭ (১৭.৭)	২০ (২১.৩)	১৬ (১৬.৮)	১৮ (১৯)	১২ (১২.৯)
তারতম্য (হ্রাস/বৃদ্ধি)	৭ (১০)	৫ (১০)	৬ (৯.১)	৪ (৭.৬)	১ (৪.৮)	১ বৃদ্ধি (৩)হ্রাস	২ বৃদ্ধি ৩হ্রাস	৩ (৫.১)	০ (৩.৫)	৭ (১০.৬)
প্রকৃত (Net) তারতম্য (হ্রাস/বৃদ্ধি)	২ বৃদ্ধি (৭.৫)হ্রাস	১ বৃদ্ধি (১৩.২)হ্রাস	৬ হ্রাস (৯.১)হ্রাস	৫হ্রাস (১৬.৮)হ্রাস	৪হ্রাস (১৬.৭)হ্রাস	৮ বৃদ্ধি (৪.২)হ্রাস	১ বৃদ্ধি (১৪.৯)হ্রাস	২ বৃদ্ধি (৩.৪)হ্রাস	১ বৃদ্ধি (৯.৬)হ্রাস	৪হ্রাস (১২.৬)হ্রাস

প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর 'প্রকল্প ব্যবস্থাপনা' উপ-অবয়বের গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রশিক্ষণ পূর্বে এ হার শতকরা ৯০.৪ ভাগ থেকে প্রশিক্ষণোত্তর পর্বে শতকরা ৯৫.৮ ভাগে উন্নীত হয়েছে (সারণী-৬৫)। উপ-অবয়বটির যথেষ্ট ও অনেক গুরুত্বও শতকরা ১৫.৩ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্য কথায় উপ-অবয়বটি প্রশিক্ষণার্থীদের কর্মজীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। তাই বিপিএটিসি কর্তৃক অনুসৃত পাঠক্রম প্রক্রিয়া যথার্থ প্রমাণিত হয়েছে।

সারণী-৬৫

প্রকল্প ব্যবস্থাপনা উপ-অবয়বে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

মতামত	প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা				
	মোটেও না	সামান্য	যথেষ্ট	অনেক	সর্বমোট
ক) প্রশিক্ষণ পূর্ব	২৮ (১০)	৯০ (৩২.৪)	৮৮ (৩১.৬)	৭২ (২৬)	২৭৮ (১০০)
খ) প্রশিক্ষণোত্তর	৯৬ (২৭.৬)	৯৯ (২৮.৪)	১২৫ (৩৬)	২৮ (৮)	৩৪৮ (১০০)
তারতম্য (হ্রাস/বৃদ্ধি)	৬৮(বৃদ্ধি) (১৭.৬)(বৃদ্ধি)	৯ (বৃদ্ধি) (৪)(হ্রাস)	৩৭ (বৃদ্ধি) (৪.৪)(বৃদ্ধি)	৪৪ (হ্রাস) (১৮) (হ্রাস)	৭০ (বৃদ্ধি) (০)

সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত কর্মকর্তাদের প্রকল্প ব্যবস্থাপনা উপ-অবয়বে প্রশিক্ষণ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সারণী-৬৬তে উপস্থাপিত পরিসংখ্যানে এ অণুকল্পটি সমর্থিত হয়েছে। প্রশিক্ষণ পূর্বে শতকরা ৯০ ভাগ কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট উপ-অবয়বে প্রশিক্ষণ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। প্রশিক্ষণোত্তর পর্বে এ হার শতকরা ১৭.৬ ভাগ হ্রাস পেয়েছে। প্রশিক্ষণোত্তর পর্বে সামান্য প্রয়োজনীয়তা শতকরা ৪ ভাগ এবং অনেক প্রয়োজনীয়তা শতকরা ১৮ ভাগ হ্রাস পেয়েছে। অপর দিকে যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা শতকরা ৪.৪ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে প্রকৃত প্রশিক্ষণ প্রয়োজনীয়তার হ্রাসের হার শতকরা ১৩.৬ ভাগে উপনীত হয়েছে। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট উপ-অবয়বে এখনো শতকরা ৮৬.৪ ভাগ প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান রয়েছে।

সারণী-৬৬

প্রকল্প ব্যবস্থাপনা উপ-অবয়বে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

মতামত	প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা				
	মোটেও না	সামান্য	যথেষ্ট	অনেক	সর্বমোট
ক) প্রশিক্ষণ পূর্ব	২৮ (১০)	৯০ (৩২.৪)	৮৮ (৩১.৬)	৭২ (২৬)	২৭৮ (১০০)
খ) প্রশিক্ষণোত্তর	৯৬ (২৭.৬)	৯৯ (২৮.৪)	১২৫ (৩৬)	২৮ (৮)	৩৪৮ (১০০)
তারতম্য(হ্রাস/বৃদ্ধি)	৬৮(বৃদ্ধি) (১৭.৬)(বৃদ্ধি)	৯(বৃদ্ধি) (৪) (হ্রাস)	৩৭(বৃদ্ধি) (৪.৪)(বৃদ্ধি)	৪৪(হ্রাস) (১৮)(হ্রাস)	৭০(বৃদ্ধি) (০)

সিভিল সার্ভিসে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের কর্মজীবনে প্রকল্পব্যবস্থাপনা উপ-অবয়বটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর এ উপ-অবয়বের গুরুত্ব শতকরা ৯০.৪ ভাগ থেকে ৯৫.৮ ভাগে উন্নীত হয়েছে (সারণী-৬৫)। অথচ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গড়ে শতকরা ১৭.৬ ভাগ প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পেয়েছে (সারণী-৬৬)। এ হ্রাস উঅ-৩৯ (প্রকল্প মূল্যায়ন) এর ক্ষেত্রে সর্বাধিক (১৭.৫%) এবং উঅ-৩৭(প্রকল্পের অনুমোদন প্রক্রিয়া) এর ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন (১২%)। সারণী-৬৭তে এ সম্পর্কে একটি অধিবেশন ভিত্তিক খতিয়ান উপস্থাপিত হয়েছে।

সারণী-৬৭

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা উপ-অবয়বে অধিবেশন ভিত্তিক প্রশিক্ষণ চাহিদার পরিবর্তন

মতামত প্রশিক্ষণ চাহিদা	প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা						
	অধিবেশনের কোড (উঅ)						
	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১
ক) যথেষ্ট চাহিদা প্রশিক্ষণপূর্ব	১৩ (৩৩.৩)	১৩ (৩২.৫)	১৩ (৩২.৫)	১৩ (৩২.৫)	১১ (২৮.২)	১৪ (৩৫)	১১ (২৭.৫)
প্রশিক্ষণোত্তর	১৯ (৩৮.৮)	১৭ (৩৪)	২১ (৪২)	২০ (৩৯.২)	১৮ (৩৬)	১৪ (২৮)	১৬ (৩৩.৩)
তারতম্য (হ্রাস/বৃদ্ধি)	৬ বৃদ্ধি (৫.৫) বৃদ্ধি	৪ বৃদ্ধি (১.৫) বৃদ্ধি	৮ বৃদ্ধি (৯.৫) বৃদ্ধি	৭ বৃদ্ধি (৬.৭) বৃদ্ধি	৭ বৃদ্ধি (৭.৮) বৃদ্ধি	০ (৭)হ্রাস	৫ বৃদ্ধি (৫.৮) বৃদ্ধি
খ) অনেক চাহিদা প্রশিক্ষণ পূর্ব	৯ (২৩.১)	৯ (২২.৫)	১১ (২৭.৫)	১০ (২৫)	১৩ (৩৩.৩)	৮ (২০)	১২ (৩০)
প্রশিক্ষণোত্তর	২ (৪)	৪ (৮)	৩ (৬)	৩ (৫.৮)	৪ (৮)	৭ (১৪)	৫ (১০.৫)
তারতম্য (হ্রাস)	৭ (১৯.১)	৫ (১৪.৫)	৮ (২১.৫)	৭ (১৯.২)	৯ (২৫.৩)	১ (৬)	৭ (১৯.৫)
প্রকৃত (Net) তারতম্য (হ্রাস)	১ (১৩.৬)	১ (১৩)	০ (১২)	০ (১২.৫)	২ (১৭.৫)	১ (১৩)	২ (১৩.৭)

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা উপ-অবয়বে সার্বিকভাবে শতকরা ৬.২ ভাগ চাহিদা হ্রাস পেয়েছে (সারণী-৬৮)। প্রশিক্ষণ পূর্বে শতকরা ৯০.১ ভাগ প্রশিক্ষণ চাহিদা প্রশিক্ষণোত্তর পর্বে শতকরা ৮৩.৯ ভাগে দাঁড়িয়েছে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের অনেক এবং সামান্য চাহিদা যথাক্রমে শতকরা ৯ ভাগ এবং ৬.৮ ভাগ হ্রাস পেলেও প্রশিক্ষণের যথেষ্ট চাহিদা শতকরা ৯.৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ চাহিদার তীব্রতার পরিবর্তন ঘটেছে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা উপ-অবয়বে প্রশিক্ষণ চাহিদা হ্রাসের হার সন্তোষজনক নয়।

সারণী-৬৮

প্রকল্প ব্যবস্থাপনা উপ-অবয়বে প্রশিক্ষণ চাহিদার পরিবর্তন

মতামত	প্রশিক্ষণ চাহিদা				
	মোটেও না	সামান্য	যথেষ্ট	অনেক	সর্বমোট
ক) প্রশিক্ষণ পূর্ব	৫৬ (৯.৯)	১৭৬ (৩১)	২০৪ (৩৫.৯)	১৩২ (২৩.২)	৫৬৮ (১০০)
খ) প্রশিক্ষণোত্তর	১১০ (১৬.১)	১৬৫ (২৪.২)	৩১১ (৪৫.৫)	৯৭ (১৪.২)	৬৮৩ (১০০)
তারতম্য (হ্রাস/বৃদ্ধি)	৫৪(বৃদ্ধি) (৬.২)(বৃদ্ধি)	১১(হ্রাস) (৬.৮)(হ্রাস)	১০৭(বৃদ্ধি) (৯.৬)(বৃদ্ধি)	৩৫(হ্রাস) (৯)(হ্রাস)	১১৫(বৃদ্ধি) (০)

প্রকল্প ব্যবস্থাপনা উপ-অবয়বে প্রশিক্ষণের যথেষ্ট ও অনেক চাহিদায় উল্লেখযোগ্য কোন ইতিবাচক প্রভাব পড়েনি। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে (উঅ-৩৫,৩৭,৩৯ এবং ৪০) এ চাহিদা প্রান্তিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে (সারণী-৬৯) এ। উপ-অবয়বে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যথেষ্ট ও অনেক প্রশিক্ষণ চাহিদা সর্বাধিক শতকরা ১.৩ ভাগ হ্রাস পেয়েছে। প্রশিক্ষণের এ ফলাফল সন্তোষজনক নয়।

সারণী-৬৯

প্রকল্প ব্যবস্থাপনা উপ-অবয়বে অধিবেশন ভিত্তিক প্রশিক্ষণ চাহিদার পরিবর্তন

মতামত প্রশিক্ষণ চাহিদা	অধিবেশন ভিত্তিক প্রশিক্ষণ চাহিদা অধিবেশনের কোড (উঅ)						
	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১
ক) যথেষ্ট চাহিদা প্রশিক্ষণপূর্ব	২৮ (৩৫.৪)	৩১ (৩৭.৮)	২৯ (৩৫.৮)	৩০ (৩৪.৫)	৩০ (৩৭.৫)	৩১ (৩৮.৭)	২৫ (৩১.৬)
প্রশিক্ষণোত্তর	৪৬ (৪৭.৪)	৪৩ (৪৩.৯)	৪৯ (৫০)	৪৩ (৪৩.৩)	৪৬ (৪৬.৯)	৪১ (৪১.৪)	৪৩ (৪৫.৭)
তারতম্য (হ্রাস/বৃদ্ধি)	১৮ (বৃদ্ধি) (১২) বৃদ্ধি	১২ (বৃদ্ধি) (৬১) বৃদ্ধি	২০ (বৃদ্ধি) (১৪.২) বৃদ্ধি	১০ (বৃদ্ধি) (৮.৮) বৃদ্ধি	১৬ (বৃদ্ধি) (৯.৪) বৃদ্ধি	১০ (বৃদ্ধি) (২.৭) বৃদ্ধি	১৮ (বৃদ্ধি) (১৪.১) বৃদ্ধি
খ) অনেক চাহিদা প্রশিক্ষণ পূর্ব	১৭ (২১.৬)	১৭ (২০.৭)	১৮ (২২.৩)	২১ (২৪.২)	২১ (২৬.২)	১৫ (১৮.৭)	২৩ (২৯.১)
প্রশিক্ষণোত্তর	১১ (১১.৪)	১৩ (১৩.৩)	১৪ (১৪.৩)	১৫ (১৫.২)	১৪ (১৪.৩)	১৭ (১৭.১)	১৩ (১৩.৯)
তারতম্য (হ্রাস)	৬হ্রাস (১০.২)হ্রাস	৪হ্রাস (৭.৪)হ্রাস	৪হ্রাস (৮)হ্রাস	৬হ্রাস (৯)হ্রাস	৭হ্রাস (১১.৯)হ্রাস	২ বৃদ্ধি (১.৬)হ্রাস	১০হ্রাস (১৫.২)হ্রাস
প্রকৃত (Net) তারতম্য (হ্রাস/বৃদ্ধি)	১২ (বৃদ্ধি) (১.৮) বৃদ্ধি	৮ (বৃদ্ধি) (১.৩)হ্রাস	১৬ (বৃদ্ধি) (৬.২) বৃদ্ধি	৭ (বৃদ্ধি) (০.২)হ্রাস	৯ (বৃদ্ধি) (২.৫) বৃদ্ধি	১২ (বৃদ্ধি) (১.১) বৃদ্ধি	৮ (বৃদ্ধি) (১.১)হ্রাস

সারণী-৭০ অনুযায়ী উন্নয়ন অর্থনীতি প্রশিক্ষণার্থীদের জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি উন্নয়নে ইতিবাচক অবদান রাখতে সমর্থ রয়েছে। গড়ে শতকরা ৯৮.৯ ভাগ প্রশিক্ষণার্থীর জ্ঞান ও দক্ষতার উন্নতি হয়েছে বলে তারা অনুভব করেন (১৮.৮% সামান্য, ৬৮.৫% যথেষ্ট এবং ১১.৬ অনেক)। দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়নে এ হার শতকরা ৯৯.৩ ভাগ (১৫.৬% সামান্য, ৬৯.৪% যথেষ্ট এবং ১৩.৩% অনেক)।

সারণী-৭০

জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি উন্নয়নে উন্নয়ন অর্থনীতির প্রভাব

উন্নয়ন অর্থনীতি উপ-অবয়ব	প্রশিক্ষণের মাধ্যমে									
	জ্ঞান ও দক্ষতার উন্নয়ন					দৃষ্টিভঙ্গির (Attitude) উন্নয়ন				
	মোটেও না	সামান্য	যথেষ্ট	অনেক	মোট	মোটেও না	সামান্য	যথেষ্ট	অনেক	মোট
উন্নয়ন অর্থনীতি উপ-অবয়ব-১	২ (০.৩)	১৫০ (২৫.৪)	৩৬৩ (৬১.৪)	৭৬ (১২.৯)	৫৯১ (১০০)	১ (০.২)	১৪১ (২৩.৯)	৩৯৬ (৬৬.৮)	৫৪ (৯.১)	৫৯৩ (১০০)
উপ-অবয়ব-২	৫ (০.৮)	১৩২ (২০.১)	৪৪৭ (৬৮.২)	৭২ (১০.৯)	৬৫৬ (১০০)	২ (০.৩)	১০৯ (১৬.৯)	৪২৭ (৬৬.১)	১০৮ (১৬.৭)	৬৪৬ (১০০)
উপ-অবয়ব-৩	৪ (০.৯)	৪৬ (৯.৮)	৩৫৬ (৭৫.৭)	৬৪ (১৩.৬)	৪৭০ (১০০)	৪ (০.৯)	৩১ (৭)	৩৪৫ (৭৮.৪)	৬০ (১৩.৭)	৪৪০ (১০০)
উপ-অবয়ব-৪	১১ (৩.১)	৬১ (১৭.৪)	২৪৯ (৭১.২)	২৯ (৮.৩)	৩৫০ (১০০)	৭ (২.১)	৫৩ (১৫.৮)	২২৯ (৬৮.৪)	৪৬ (১৩.৭)	৩৩৫ (১০০)
মোট	২২ (১.১)	৩৮৯ (১৮.৮)	১৪১৫ (৬৮.৫)	২৪১ (১১.৬)	২০৬৭ (১০০)	১৪ (০.৭)	৩৩৫ (১৬.৬)	১৩৯৭ (৬৯.৪)	২৬৮ (১৩.৩)	২০১৪ (১০০)

সামগ্রিক পর্যালোচনা

সমীক্ষাধীন বুনিয়াদি কোর্সে মোট তিনটি বিষয়ে (বাংলাদেশ চর্চা, প্রশাসন এবং উন্নয়ন অর্থনীতি) মোট ১৩টি উপ-অবয়ব অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ উপ-অবয়বে মোট ১৩৯টি তাত্ত্বিক অধিবেশন পরিচালিত হয়েছে। সমীক্ষায় সকল উপ-অবয়বই প্রশিক্ষণার্থীদের কর্মজীবনের জন্য প্রাসঙ্গিক এবং গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। প্রশিক্ষণপূর্ব মতামত অনুযায়ী সামগ্রিকভাবে গড়ে এ হার ছিল শতকরা ৯৭.৭ ভাগ (সারণী-৭১)। এ ক্ষেত্রে লোক প্রশাসনের স্থান সর্বাধিক (৯৬.৯%) এবং বাংলাদেশ চর্চা দ্বিতীয় সর্বাধিক (৯৪.৪%)। উন্নয়ন অর্থনীতি বিষয়ও প্রশিক্ষণার্থীদের কর্মজীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক বিবেচিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে শতকরা ৮৮.৫ ভাগ প্রশিক্ষণার্থী এর সপক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

বুনিয়াদি কোর্সের মোট ১৩টি উপ-অবয়বের মধ্যে লোপ্র-৩ (কর্মী ব্যবস্থাপনা) উপ-অবয়বটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক বিবেচিত হয়েছে। শতকরা ৯৯.২ ভাগ এর সপক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এ ক্ষেত্রে আর্থ-ব্যবস্থাপনা (লোপ্র-৪) উপ-অবয়বের স্থান দ্বিতীয় সর্বাধিক (৯৭.৩%) এবং উঅ-১ (পরিমাণগত বিশ্লেষণ) এর স্থান সর্বনিম্ন (৮১.৭%)। প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর এ উপ-অবয়বের (উঅ-১) গুরুত্ব শতকরা ১০.৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং উঅ-১ উপ-অয়বটিও প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাদের কর্মজীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক।

প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর বাংলাদেশ চর্চা ব্যতিরেকে সকল বিষয়ের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা প্রান্তিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ক্ষেত্রে লোক প্রশাসন বিষয়ে গড়ে শতকরা ০.৫ ভাগ এবং অর্থনীতি বিষয়ে গড়ে শতকরা ৬.০ ভাগ বৃদ্ধি ঘটেছে। এ হার লোপ্র-১ (প্রশাসনে নৈতিকতা) উপ-অবয়বে শতকরা ৩.১ ভাগ এবং বাংলাদেশ চর্চা বিষয়ে এ হার শতকরা ০.২ ভাগ হ্রাস পেয়েছে।

সার্বিকভাবে শতকরা ৯৪.৬ ভাগ কর্মকর্তা সকল উপ-অবয়বে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এ হার লোক প্রশাসন বিষয়ে সর্বাধিক (৯৭.৬%) এবং বাংলাদেশ চর্চা বিষয়ে দ্বিতীয় সর্বাধিক (৯৫.২%)। উন্নয়ন অর্থনীতি বিষয়েও প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা শতকরা ৮৯.৬ ভাগ। প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর প্রশিক্ষণের

প্রয়োজনীয়তা সার্বিকভাবে শতকরা ১৭.৬ ভাগ হ্রাস পেয়েছে। অন্যকথায় প্রশিক্ষণ গ্রহণের পরও শতকরা ৮২.৪ ভাগ প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান রয়েছে।

প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা হ্রাসে লোক প্রশাসন সর্বাধিক কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এ বিষয়ে শতকরা ২১.১ ভাগ প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পেয়েছে। বাংলাদেশ চর্চা এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় সর্বাধিক (১৬%)। উন্নয়ন অর্থনীতি বিষয়ে শতকরা ১৩.২ ভাগ প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে। লোপ্র-১ (প্রশাসনে নৈতিকতা) উপ-অবয়বে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক (২৮.৬%) হ্রাস পেয়েছে। এ হার লোপ্র-৫ (অফিস ব্যবস্থাপনা) এর ক্ষেত্রে দ্বিতীয় সর্বাধিক (২৪.১%) এবং উঅ-১(পরিমাণগত বিশ্লেষণ) এর ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন (৬.৫%)।

প্রশিক্ষণের চাহিদা হ্রাসেও লোক-প্রশাসনের স্থান সর্বোচ্চ। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এ বিষয়ে শতকরা ১০.২ ভাগ চাহিদা হ্রাস পেয়েছে। এ হার বাংলাদেশ চর্চার ক্ষেত্রে শতকরা ৮ ভাগ এবং উন্নয়ন অর্থনীতির ক্ষেত্রে শতকরা ৩.৭ ভাগ। লোপ্র-১ (প্রশাসনে নৈতিকতা) উপ-অবয়বে সর্বাধিক (১৫.৮%) চাহিদা হ্রাস করেছে। লোপ্র-৫ (অফিস ব্যবস্থাপনা) এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় সর্বাধিক (১০.৮%) এবং উঅ-১(পরিমাণগত বিশ্লেষণ) সর্বনিম্ন (২%)।

কর্মজীবনে বুনিয়াদি কোর্সের জন্য প্রণীত সকল উপ-অবয়বের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা এবং প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা শতকরা ৯০ ভাগের বেশী হওয়া সত্ত্বেও এ প্রয়োজনীয়তা কার্যকরভাবে হ্রাস করা সম্ভব হয়নি। প্রশিক্ষণ গ্রহণের পরও প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা এবং চাহিদা উল্লেখযোগ্য হারে বিদ্যমান। তাই বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সকে আরো কার্যকর করার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে।

শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটির কারণে প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাবৃন্দ সকল বিষয়েই প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এ ছাড়া নিয়োগ ও পদায়ন ব্যবস্থা বিশেষায়িত না হওয়ায় প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাদের প্রশাসন ও উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রেই কাজ করার প্রয়োজন হয়। ফলে তারা সকল বিষয়ই তাদের কর্মজীবনের জন্য প্রাসঙ্গিক মনে করেন এবং সকল বিষয়েই প্রশিক্ষণ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের পক্ষেও সার্বিক এবং সুনির্দিষ্টভাবে প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরুপণ করা সম্ভব হয় না।

সারণী-৭১ উপ-অবয়ব ভিত্তিক সামগ্রিক ফলাফল (শতকরায়)

বিষয় উপ-অবয়ব	কর্মজীবনে অধিবেশনের গুরুত্ব / প্রাসঙ্গিকতা			প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা			প্রশিক্ষণ চাহিদা		
	প্রশিক্ষণ পূর্ব	প্রশিক্ষণো ত্তর	তারতম্য (+/-)	প্রশিক্ষণ পূর্ব	প্রশিক্ষণো ত্তর	তারতম্য (+/-)	প্রশিক্ষণ পূর্ব	প্রশিক্ষণো ত্তর	তারতম্য (+/-)
বাংলাদেশ চর্চা									
উপ-অবয়ব									
বাচ-১	৯৫.২	৯৪.৩	(-)১.৫	৯৫.২	৭৮.৪	(-) ১৬৮	৯৫.২	৮৬.০	৯৯.২
বাচ-২	৯১.২	৯৩.৬	২.৪	৯২.৬	৭৪.০	(-) ১৮.৬	৯১.৯	৮৩.৭	(-) ৮.২
বাচ-৩	৯৬.৮	৯৬.৫	(-) ০.৩	৯৭.৬	৮৫.০	(-) ১২.৬	৯৭.২	৯০.৭	(-) ৬.৫
মোট ঃ	২৮৩.২	২৮৩.২	(-) ০.৬	২৮৫.৪	(২৩৭.৪	(-) ৪৮	২৮৪.৩	২৬০.৪	(-) ২৩.৯
গড় ঃ	৯৪.৪	৯৪.৬	(-) ০.২	৯৫.২	৭৯.২	১৬	৯৪.৮	৮৬.৪	৮
লোক প্রশাসন									
উপ-অবয়ব									
লোপ্র-১	৯৭.৪	৯৪.৩	(-) ৩.১	৯৭.২	৬৮.৬	(-) ২৮.৬	৯৭.৩	৮১.৫	(-) ১৫.৮
লোপ্র-২	৯৪.৭	৯৫.৪	০.৭	৯৭.৭	৭৬.২	৯-) ২১.৫	৯৬.২	৮৫.৭	(-) ১০.৫
লোপ্র-৩	৯৯.২	৯৯.২	০	৯৯.১	৮০.০	(-) ১৯.১	৯৯.২	৮৯.৭	(-) ৯.৫
লোপ্র-৪	৯৭.৩	৯৯.২	১.৯	৯৮.৪	৭৬.৪	৯-) ২২.০	৯৭.৮	৮৮.০	(-) ৯.৮
লোপ্র-৫	৯৫.৫	৯৮.০	২.৫	৯৭.১	৭৩.০	(-) ২৪.১	৯৬.৩	৮৫.৫	(-) ১০.৮
লোপ্র-৬	৯৭.০	৯৮.০	১.০	৯৬.০	৮৪.৬	৯-) ১১.৪	৯৬.৫	(৯১.৩	(-) ৫.২
মোট ঃ	৫৮১.১	৫৮৪.১	৩.০	৫৮৫.৫	৪৫৮.৮	(-)১২৬.৭	৫৮৩.৩	৫২১.৭	(-) ৬১.৬
গড় ঃ	৯৬.৯	৯৭.৪	৯.৫	৯৭.৬	৭৬.৫	(-) ২১.১	৯৭.২	৮৭	(-) ১০.১
উন্নয়ন অর্থনীতি									
উপ-অবয়ব									
উঅ-১	৮১.৭	৯২.২	১০.৫	৮৪.০	৭৭.৫	(-) ৬.৫	৮২.৮	৮৪.৮	২.৩
উঅ-২	৯০.৬	৯৩.৩	২.৭	৯২.৩	৭৯.৩	(-) ১৩.০	৯১.৫	৮৬.২	(-) ৫.৩
উঅ-৩	৯১.২	৯৬.৪	৫.২	৯২.০	৭৬.২	(-) ১৫.৮	৯১.৭	৮৬.২	(-) ৫.৫
উঅ-৪	৯০.৪	৯৫.৮	৫.৪	৯০.০	৭২.৪	৯-) ১৭.২	৯০.১	৮৩.৯	(-) ৬.২
মোট ঃ	৩৫৩.৯	৩৭৭.৭	২৩.৮	৩৫৮.৩	৩০৫.৪	(-) ৫২.৫	৩৫৬.১	৩৪১.১	(-) ১৫.০
গড় ঃ	৮৮.৫	৯৪.৪	৬	৮৯.৬	৭৬.৪	৯-) ১৩.০	৮৯.০	৮৫.৩	৯-) ৩.৭
সর্বমোট ঃ	১২১৮.২	১২৪৫.৬	২৬.২	১২২৯.২	১০০১.৬	(-) ২২৭.২	১২২৩.৬	১১২৩.২	(-) ১০০.৫
গড় ঃ	৯৩.৭	৯৫.৮	২.১	৯৪.৬	৭৭.০	(-) ১৭.৬	৯৪.১	৮৬.৪	(-) ৭.৭

সুপারিশমালা

ইত:পূর্বে প্রকাশিত প্রবন্ধ এবং এ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধে পরিবেশিত তথ্য ও উপাত্ত এবং বিশ্লেষণের ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত সুপারিশসমূহ উপস্থাপিত হলো ঃ

১। বুনিয়াদি কোর্সের সকল উপ-অবয়ব ও অধিবেশনসমূহ প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাদের কর্মজীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক বিবেচিত হওয়ায় এ উপ-অবয়ব ও অধিবেশনসমূহ ভবিষ্যতের বুনিয়াদি কোর্সেও অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক এবং আন্তর্জাতিক পরিবেশ ও পরিস্থিতি এবং প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে পাঠক্রম সংশোধন করা যেতে পারে। এ সংশোধন কার্যক্রমে বিজ্ঞান সম্মত প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরুপণ পদ্ধতি অনুসৃত হতে পারে।

২। চাহিদা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ পাঠক্রম প্রণয়ন এবং প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞানের সর্বাধিক ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে সরকারের বিশেষায়িত পদায়ন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা বাঞ্ছনীয় হবে। প্রশাসনে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের যোগ্যতা ও আগ্রহের ভিত্তিতে একটি পদায়ন কর্ম পরিকল্পনা ও কর্মজীবন উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যায়। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান চাহিদা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ পাঠক্রম প্রণয়ন করবে।

৩। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা এবং প্রশিক্ষণ চাহিদা সন্তোষজনকভাবেহ্রাস পায়নি। বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের শিক্ষণ কার্যকারিতা (Learning Effectiveness) বৃদ্ধির যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। এ জন্যে বুনিয়াদি কোর্সের পাঠসূচি, প্রশিক্ষণ পদ্ধতি, কোর্স ব্যবস্থাপনা নীতি ও কার্যক্রমসহ যাবতীয় কার্যাবলী পর্যালোচনা ও পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজন হবে।

৪। স্বল্প সময়ে একটি বিষয়ে সামগ্রিক ধারণা (Overview) প্রদানের নীতির পরিবর্তে বিষয়বস্তুর গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা এবং প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে প্রতি কোর্স/অধিবেশনে পর্যাপ্ত সময় বিনিয়োজিত করা উচিৎ। এ জন্যে পাঠ্যসূচি এবং প্রশিক্ষণ পদ্ধতির পূনর্বিন্যাস এবং উন্নয়ন সাধনের প্রয়োজন হবে। বিষয়বস্তুর ধরন, উদ্দেশ্য এবং শিক্ষণ চাহিদার (Learning Needs) সাথে সঙ্গতি রেখে সৃজনশীল এবং লাগসই প্রশিক্ষণ পদ্ধতি প্রবর্তন করা সমীচীন হবে। তদনুযায়ী কোর্সের মেয়াদও বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

উপসংহার

এ প্রবন্ধে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পাঠক্রমের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা, প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ও প্রশিক্ষণ চাহিদা এবং শিক্ষণ কার্যকারিতা নিরুপণ করা রয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণপূর্ব এবং প্রশিক্ষণোত্তর মতামত নেয়া হয়েছে। এ মডেলটি গবেষক, প্রশিক্ষকসহ অন্যান্য পেশাবিদদের প্রশিক্ষণ চাহিদা এবং শিক্ষণ কার্যকারিতা নিরুপণসহ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনার অন্যান্য ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে।

(মূল্যায়নমূলক এই প্রবন্ধটি বিশেষ বুনিয়াদি পাঠক্রমের উপর পরিচালিত।)

(গ) উন্নয়ন অর্থনীতি

উপ-অবয়ব ১ ঃ পরিমাণগত বিশ্লেষণ

উঅ-১	পরিমাপের সংজ্ঞা ও পদ্ধতি
উঅ-২	শুমারী ও নমুনা জরীপ-১
উঅ-৩	শুমারী ও নমুনা জরীপ-২
উঅ-৪	উপাত্ত উপস্থাপনের কৌশল-১
উঅ-৫	উপাত্ত উপস্থাপনের কৌশল ২
উঅ-৬	উপাত্ত বিশ্লেষণ
উঅ-৭	সহ-সংস্রব ও নির্ভরণঃ প্রাথমিক ধারণা
উঅ-৮	সংখ্যাতাত্ত্বিক সূচক বিশ্লেষণ-১
উঅ-৯	সংখ্যাতাত্ত্বিক সূচক বিশ্লেষণ-২
উঅ-১০	অর্থনীতি, উৎপাদন ও জাতীয় আয়
উঅ-১১	জাতীয় আয় পরিমাপ পদ্ধতি

উপ-অবয়ব-২ ঃ অর্থনৈতিক উন্নয়নের পটভূমি ও কৌশল

উঅ-১২	অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারণা ঃ পটভূমি, বিবর্তন ও গতিশীলতা
উঅ-১৩	অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য
উঅ-১৪	উন্নয়নের সূচক
উঅ-১৫	বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাসের রূপরেখা
উঅ-১৬	বাংলাদেশের অর্থনীতির সাম্প্রতিক প্রবণতা
উঅ-১৭	বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নের কৌশল
উঅ-১৮	বাংলাদেশের শিল্প উন্নয়নের কৌশল
উঅ-১৯	বাংলাদেশের পল্লী উন্নয়নের কৌশল
উঅ-২০	প্রযুক্তি নির্বাচন ও হস্তান্তর
উঅ-২১	বাংলাদেশের বেকারত্ব সমস্যা ও উত্তরণের সম্ভাবনা
উঅ-২২	অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারী ও কর্মকর্তাদের ভূমিকা
উঅ-২৩	অর্থনৈতিক উন্নয়নে বেসরকারী সংস্থার ভূমিকা
উঅ-২৪	দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচি

উপ-অবয়ব-৩ ঃ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা

উঅ-২৫	পরিকল্পনা প্রকৃতি
উঅ-২৬	পরিকল্পনা প্রণয়ন পদ্ধতি
উঅ-২৭	বাংলাদেশের পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সমষ্টিগত কাঠামো-১
উঅ-২৮	বাংলাদেশের পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সমষ্টিগত কাঠামো-২
উঅ-২৯	বাংলাদেশের দারিদ্র্য স্তরবিন্যাস ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা
উঅ-৩০	উন্নয়নের জন্য সম্পদ আহরণ-সমষ্টিগত
উঅ-৩১	স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন ও সম্পদ আহরণ
উঅ-৩২	বিনিয়োগযোগ্য সম্পদের ব্যবহার
উঅ-৩৩	বৈদেশিক সাহায্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন
উঅ-৩৪	বাংলাদেশের পরিকল্পনার সামগ্রিক মূল্যায়ন

উপ-অবয়ব-৪ ঃ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা

উঅ-৩৫	প্রকল্পের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ
উঅ-৩৬	প্রকল্প চক্র
উঅ-৩৭	প্রকল্পের অনুমোদন প্রক্রিয়া
উঅ-৩৮	প্রকল্প পরিবীক্ষণ
উঅ-৩৯	প্রকল্প মূল্যায়ন
উঅ-৪০	প্রকল্প ছক (তাত্ত্বিক)
উঅ-৪১-৪৪	প্রকল্প প্রণয়ন অনুশীলনী

লেখকের প্রতি জ্ঞাতব্য

✡ লোক প্রশাসন সাময়িকীতে লোক প্রশাসন, উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন অর্থনীতি, পরিবেশ, সমসাময়িক আন্তর্জাতিক ও বাংলাদেশের ঘটনাবলী, প্রশিক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণাধর্মী, বিশ্লেষণমূলক ও তথ্যসমৃদ্ধ মৌলিক প্রবন্ধ ও পুস্তক সমালোচনা প্রকাশিত হয়।

✡ রিপোর্ট সাইজের কাগজে এক পৃষ্ঠায় টাইপকৃত কিংবা স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লিখিত লেখা/প্রবন্ধ মূলকপিসহ মোট ৩ (তিন) কপি সম্পাদক, লোক প্রশাসন সাময়িকী, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা, এই ঠিকানায় প্রেরণ করতে হবে।

✡ লেখা/প্রবন্ধ ৬,০০০ শব্দ (মুদ্রিত ২০ পৃষ্ঠা) এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা বাঞ্ছনীয়।

✡ পূর্বে অন্য কোন পত্রিকায়/গ্রন্থে প্রকাশিত লেখা মনোনীত হবে না।

✡ লেখা মনোনয়নের এবং পরিমার্জন/অংশবিশেষ বাতিল করার পূর্ণ অধিকার সম্পাদনা পরিষদের রয়েছে। অমনোনীত লেখা ফেরত পাঠানো হয় না।

✡ মুদ্রিত প্রতি পৃষ্ঠার (৩০০শব্দ) জন্য লেখককে ২০০ (দুইশত) টাকা হারে সম্মানী প্রদান করা হয়।

বিপিএটিসির প্রকাশনা বিক্রয় সম্পর্কিত তথ্য
কেন্দ্রস্থ অনুষদ ভবন-২, এর ৩য় তলায় প্রকাশনা শাখার দপ্তরে তালিকাভুক্ত বই, পুস্তক ও জার্নাল পাওয়া যায়।
কেন্দ্র থেকে সরাসরি ক্রয়ের ক্ষেত্রে বই, পুস্তক ও জার্নালের বিক্রয় মূল্যের উপর সাধারণত ৫০% কমিশন দেয়া হয়ে থাকে।

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

প্রকাশিত পুস্তক/পত্রিকা ও মূল্য তালিকা

ক্রমিক নং	শিরোনাম ও লেখক	প্রতি কপির দাম	কমিশনসহ প্রতি কপির দাম
1.	বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা	৪০/০০	টাকা ঃ ২০/০০
2.	বাংলাদেশ পাবলিক এ্যাডমিনিস্ট্রেশন জার্নাল	৪০/০০	টাকা ঃ ২০/০০
3.	লোক প্রশাসন সাময়িকী	১৫/০০	টাকা ঃ ৭/৫০
4.	Post-entry Training in Bangladesh Civil Service: The Challenge & Response	40/00	Tk. 20/00
5.	Career Planning in Bangladesh	120/00	Tk. 60/00
6.	Co-ordination in Public Administration in Bangladesh	100/00	Tk. 50/00
7.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে মহিলা	১২০/০০	টাকা ঃ ৬০/০০
8.	Sustainability of Project For Higher Agricualtural Education	40/00	Tk. 20/00
9.	Approaches to Rural Health Care: A Case Study of Ganoshasthaya Kendra	40/00	Tk. 20/00
10.	Sustainability of Rural Development Projects: A Case Study of Rural Development Project In Bangladesh	40/00	Tk. 20/00
11.	Sustainability of Primary Education Project in Bangladesh	40/00	Tk. 20/00
12.	Handbook for the Magistrates	100/00	Tk. 50/00
13.	A Study of the use of Computer	50/00	Tk. 25/00
14.	সামাজিক গবেষণা পদ্ধতি	125/00	Tk. 62/50